শারদীয় সংখ্যা

নাচঘর

এই সংখ্যার মূল্য দুই আনা] | Regd. No. C. 1304. | [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ | সম্পাদক— | ৩০শে ভাদ্র
৩৬শ সংখ্যা | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১৩৪০

নিউ
থিয়েটার্সের
রাজরাণী-
চিত্রে
মিসেস
দুর্গাবতী
খোটে

নাট্যজগৎ
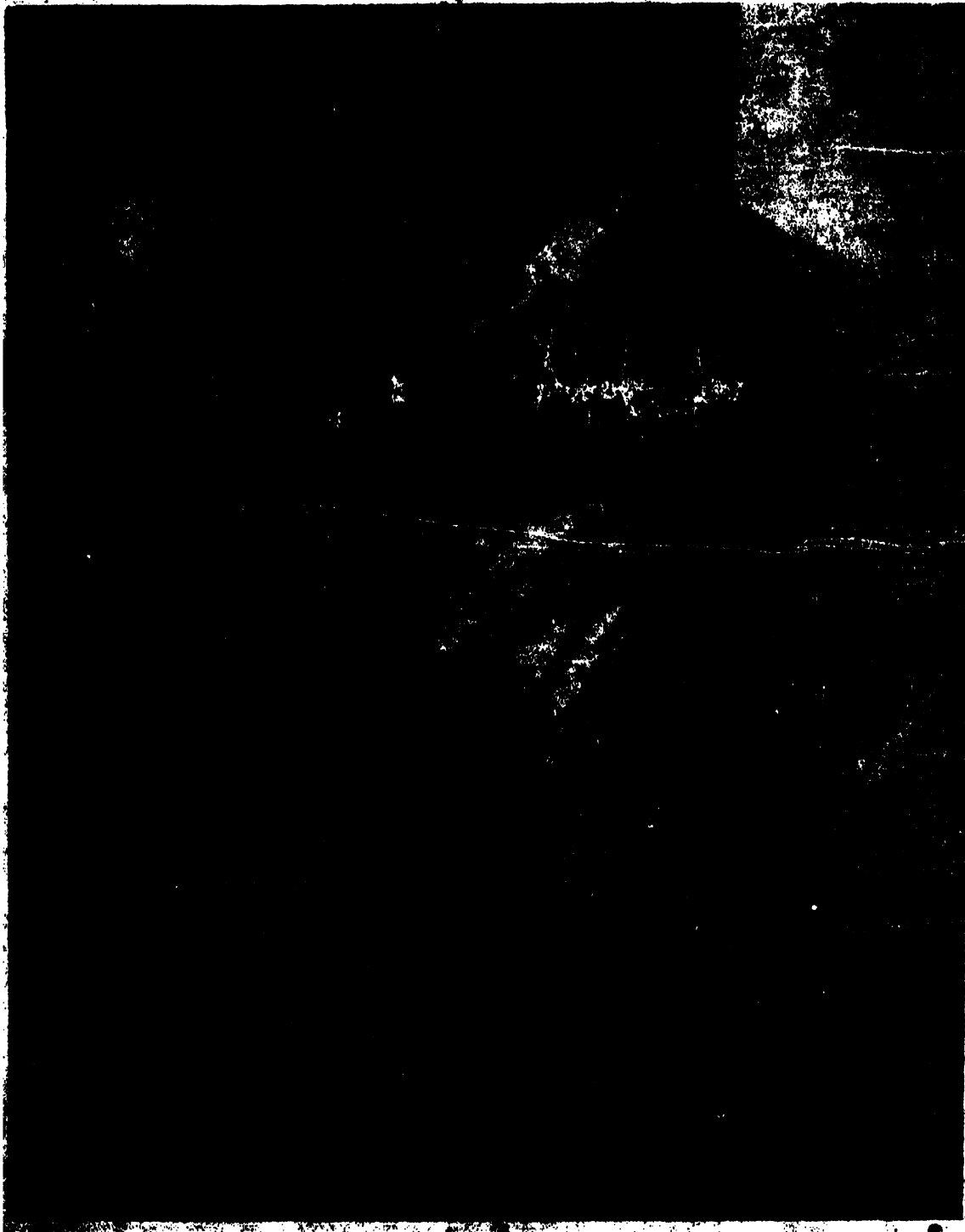
শিউলি-ফুলের শুভ্র বাঁশীর ঝরা সুর শুনিয়ে শরৎ-প্রভাত আবার আমাদের দ্বারে এসে ডাক দিয়েছে! আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে, বিছানায় ব'সে ব'সে অনুভব করছি, গঙ্গানদীর এপার থেকে ওপারের বন-শ্যামল রেখা পর্য্যন্ত কেমন-একটি মাধুর্য্যের বেদনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে,—একসঙ্গে তা মনকে নন্দিতও করছে এবং প্রিয়-বিরহও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে! কেন জানিনা, বাসন্তী সন্ধ্যায় দখিনা বাতাসের ছোঁয়া পেলে এবং শারদ-প্রভাতে অমল আলোর নীলাকমল ফুটলে মনে আমার একসঙ্গে দুলতে থাকে কান্না-হাসির হিন্দোলা। উৎসবের দিনেই নতুন আনন্দের সঙ্গে হারা-আনন্দকে মনে ক'রে বেজে ওঠে আমার স্মৃতির বীণা। দুঃখ-সুখের এই দুই নূপুরের তালে তালেই হয়তো বিশ্বমানবের সমস্ত উৎসব-আয়োজন চিরদিন সার্থক হয়ে আসছে।

*

পূজার সংখ্যার 'নাচঘরে' কোনদিনই সমালোচনার ঠাঁই হয় নি। তাই এবারেও আমরা আর 'নাট্যজগতে'র কৃত্রিম পাদপ্রদীপ জ্বাললুম না। কিন্তু স্থানান্তরে বরেণ্য সাহিত্যসেবক শরৎচন্দ্র যে-কথাগুলি বলেছেন, সেই সম্বন্ধে গুটিকয় কথা যদি বলি, তাহ'লে হয়তো কারুর কাছে অপরাধী হব না।

*

'নাচঘরে'র পড়ুয়াদের মনোরঞ্জনের জন্যে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব ও অমূল্য লেখনীর কাছ থেকে আমরা যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা চেয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে দু-একটি নূতন বাণী শুনতে পাব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সে আশা এবারে আর পূর্ণ হ'ল না। কারণ আমাদের প্রতি পুরাতন স্নেহবশতঃ শরৎচন্দ্র এবারে কতকগুলি ব্যক্তিগত কথা ব'লেই নীরব হয়েছেন। এই ব্যক্তিগত কথাগুলি দশজনের সামনে প্রকাশ করতে আমাদের যে সঙ্কোচ হয়নি, এমন কথাও বলতে পারি না। যেমন, নিয়ে তিনি কথাগুলি বলেছেন, সকলে হয়তো সেমন নিয়ে কথাগুলি পড়বে না। তবু যে লেখাটি ছাপতে বাধ্য হলুম তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের রচনাকে বাতিল করবার সাহস বা যোগ্যতা আমাদের নেই।

*

কিন্তু আজকের এই কোলাহলময় সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্র আচম্বিতে অতীতের সেদিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তার মহিমায় হৃদয় আমাদের সমুদ্রের মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। 'যমুনা'র সেই কাব্যকুঞ্জ—পরেই যেখানে বসেছিল 'মর্ম্মবাণী'র আসর! প্রতিদিন সে কুঞ্জে ব'সে যাঁরা আলাপ করতেন তাঁদের কথা আজ মনে হচ্ছে। স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, গল্প-শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মিষ্ট ভাষার ঐন্দ্রজালিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক বাণীনাথ নন্দী এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি—কত আর নাম করব সাহিত্যিকদের কলগুঞ্জনে সেখানকার প্রতি সন্ধ্যা মধুময় হয়ে উঠত। সাহিত্যের ও রসের আলোচনায় তখন আমাদের শ্রান্তি ছিল না,—কথা-শিল্পী তাঁর নতুন গল্প শোনাচ্ছেন, কবি তাঁর নতুন কবিতা পাঠ করছেন, ঐতিহাসিক ইতিহাসের নতুন কথা বলছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা শোনাচ্ছেন—প্রতি দিন নব নব ভাবের বিকাশে চিত্ত হয়ে উঠত আমাদের বিচিত্র।… … …তেমন সাহিত্যের আসর এখন আর কলকাতায় নেই, এখনকার তরুণ সাহিত্যিকরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান করতে জানেন না। বাংলা সাহিত্যে এখন আর সুমধুর সমাজবন্ধনও নেই, একাগ্র সাধনারও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নেই। সাহিত্য-সেবায় তখন যে স্বার্থশূন্য আনন্দ ছিল, এখনকার লেখকরা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন ব'লেই মনে হয়। হাট-বাজারের গোলমাল এসে এখনকার সাহিত্য-কুঞ্জে কোকিলদের কণ্ঠ যেন ম্রিয়মান ক'রে দিচ্ছে। প্রতিদিনই এটা আমরা অনুভব করি।

*

শরৎচন্দ্রও হয়তো আজ তা অনুভব করেন। তাই এতদিন পরে অতীতের সেই সোনার মতন উজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি আবার তাঁর মনে পড়েছে। আজকের শরৎচন্দ্র সেদিনের চেয়ে অনেক—অনেক বড় হয়ে উঠেছেন, এত বড় হয়ে উঠেছেন যে আমরা আর তাঁর নাগাল পাব না, তবু সেদিনের মাধুর্য্যের কথা কোনদিনই তিনি ভুলতে পারবেন না। তাঁর মনের ছোট্ট একটি কোণে আমাদের জন্যে একটুখানি ঠাঁই যে থাকবেই, এই ভেবেই আমরা আনন্দিত হচ্ছি।

*

কিন্তু সর্ব্বশেষে শরৎচন্দ্র যে-কথাগুলি বলেছেন, আমরা তার অর্থগ্রহণ করতে পারলুম না। সাহিত্য-রসবিচারে আমাদের যে দূরদৃষ্টি ও গভীর অনুভূতি আছে, আমরা এটাও যেমন মনে আনতে পারি না, তেমন না-জানা বিষয় নিরর্থ শব্দ সমষ্টির আড়ম্বরে কোনদিন ধূমাচ্ছন্ন ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছি ব'লেও তো মনে পড়ছে না! অনধিকার চর্চ্চা নিজেরাও কোনদিন করি-নি, অন্য কেউ করলেও সইতে পারি না।

*

পূজার ছুটিতে "নাচঘর" তিন হপ্তার জন্যে বন্ধ রইল। আমাদের পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর তারিখে।

লেখন

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে,
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্য্যে তব, তোমার স্বপনে জাগরণে॥

উড়ো-চিঠি

এয়ার-মেল

(শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১. দাদা-মশায়, ও দাদা-মশায়, ও দাদা-মশায়, শুনচো!

২. কেও, কে তোমরা পর্দা ঠেলে ঢোকো? বাদলাবাবু যে! কি মৎলবে আগমন গরীবখানায় শুনি!

১. প্রভঞ্জনী নৃত্যে কি সাজে সাজি বল—

২. রূপ-সজ্জা তো এখানে খাটবে না, বাতাসের নিজের রূপ নেই!

১. আমি বলছি একেবারে খালি গায়ে নাচা চাই।

২. না ভাই, অতটা সইবে না, ইথিরিয়াল গোছের কাপড় পরাও চলবে না দর্শকরা তাহলে চুণ আর অঞ্জন বখসিস্ দেবে। মোটা কাপড় এঁটে সেঁটে পর—বাতাসে না উড়ে পড়ে, গা না দেখা যায়। যদি রিয়ালিষ্টিক করতে চাও তো ঝাঁলাগাছ নাচতে নাচতে ছিঁড়ে ফেলো। কিন্তু নাচ সত্যি প্রভঞ্জনের নকল নয়—প্রভঞ্জনের গতি দ্রুত বিক্রত তালে প্রকাশ করতে পার তো সাজ-গোজের দরকারই নেই। সাইক্লোন বইয়ে দাও গা ঘুরে বাজনাতে তালে নাচে চুকে যাবে কাৎ। তুমি যে প্রভঞ্জন এটা জানাতে চেওনা, সে-ভুল লোকে খুব কমই করে, তুমি নর্ত্তক এইটেই প্রমাণ কর, চুকে যাবে কাব।

১. প্রভঞ্জন যখন ওঠে আকাশের আলো তখন তিমিরাঞ্জননিভ দেখায়, একটু অঞ্জন মাখবো মুখে?

২. নিজের মুখে কালি মাখতে চাও মাখো, কিন্তু প্রভঞ্জনের রূপ কল্পনা করতে সাহিত্যিকের মোরে যেও না। আমি দেখেছি প্রভঞ্জন ধূলিধূসরিত কাঞ্চনাভ কাল সন্ধ্যেবেলাতে।

১. ধর না কালো প্রভঞ্জনই সাজছি, অঞ্জন বাদ দেওয়া চলে না।

২. বেশ, চোখের কোলে ঈষৎ কাজল টান দিতে পারো। দেখো, দেব-চক্ষু করে বসোনা যেন।

১. একটু চুল কিম্বা জটা কি ঝাঁপলা হাওয়ায় না উড়লে কি ঠিক হবে?

২. ওরে ভাই, মাতুলে, জটার সঙ্গে, তোমার নর্ত্তক সবাইকে ওড়াতে পারোতো জটা পরচুল ধরো। খবরদার, কোনোরকম রিয়ালিজিম্ যাকে বলে তা যেন না থাকে! রূপসজ্জাতে প্রতীক মত পারো চালাও, চামর ধরতে পারো যেমন মেঘ চণ্ডীর গানে সেকালের গায়ক,—বিজলী দেখাতে একটু ফিতে আর রামধনুকের বর্ণ একফালি সাটিন, একটু ক'রে মেখাম্বরী কাপড় এই নিয়ে সাইক্লোন নৃত্যে নেমে পড়। হ'ল কি? ধর এইবার গীত।

> রে অরে অঞ্জন-বরণী ঘোর-প্রভঞ্জনী নৃত্য করে,
> ধরা কাঁপে পদভরে ধরাধর ভেঙ্গে পড়ে,
> ঝরে দিকে দিকে দিকতারা ঝর ঝরে—

ওকি ওকি কতকগুলো অলকুচি ছড়ালে কেন? একি কাণ্ড হচ্ছে! উঃ, চোক কর্ কর্ ক'রে উঠলো!

১. গোটাকতক দিক-তারা ঝরিয়ে দিলেম—

২. বেশ করেছো, যাও এখন, আমার চোখের তারা ঠিক হোক তো আর একদিন এসো।

১. কাল দাদা-মশায় ধনঞ্জয়ের নাচ!

২. বড়তো নাচ করলেম তোমাকে নাচে পাইয়ে—আচ্ছা, তথাস্তু—

"কথাপ্রসঙ্গে"

(শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

'নাচঘর' সাপ্তাহিকের পরিচালকবর্গের তরফ থেকে সম্প্রতি অনুরোধ এসেছে পাঠক হিসেবে আমাকে কিছু লিখে দিতে হবে। আমিও যে এর একজন পাঠক, শুধু এই কথাটা অন্যান্য পাঠকদের জানিয়ে দিলেই যদি হতো ত মুস্কিল ছিলনা, কিন্তু আমার বিপদ হয়েছে এই যে, ললিত-কলার যে বিশেষ অংশটা নিয়ে 'নাচঘরে'র কারবার,—অর্থাৎ, নাচে গানে অভিনয়ে, রঙ্গমঞ্চে নট নটীর শিল্প-নৈপুণ্যে যে দিকটা এর সমুজ্জ্বল সেদিকে আমার প্রবেশাধিকার নেই। এবং নেই বলেই বোধ করি এই স্বল্পায়তন পত্রিকাখানি আমাকে আনন্দ দেয়। বীণাপাণির বীণার এলাকায় সাধারণতঃ কি ঘটে, কি ঘটা উচিত এবং অধুনা কি ঘটবে, তার খবর পাই এবং তত্ত্ব ও তথ্য হিসেবে নাচঘরের আলোচিত বিষয়গুলি আমি শিক্ষা করি, বিশ্বাস করি।

কারণটা বলি। এই কাগজের যিনি সম্পাদক সেই হেমেন্দ্রকুমার যখন তরুণ ও আমি প্রৌঢ়,—সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়েই অপরিচিত—তেমন দিনে আরও দু একটি নবীন সহযোগী নিয়ে প্রতিদিন বসতুম আমরা একটি ছোট ঘরে অধুনালুপ্ত আমাদের যমুনা কাগজখানিকে কেন্দ্র করে নিয়ে। তখন থেকে হেমেন্দ্র আমার বন্ধু। যমুনার সম্পাদক বলে হেমেন্দ্রর নাম ছিলনা; কিন্তু সম্পাদনার যেটি সব চেয়ে কঠিন কাজ, সেই প্রবন্ধের যাচাই বাছাইয়ের ভার ছিল তাহার পরে। গল্প, কবিতা, সমালোচনা সব-কিছুর ভালোমন্দ স্থির করে দিতেন তিনিই। সাহিত্য রস বিচারে সেই অল্প বয়সেই আমরা হেমেন্দ্রর দূরদৃষ্টি ও গভীর অনুভূতির পরিচয় পাই। ললিত কলার কোনদিকে যে কোনদিন কিছু সৃষ্টি করেনি সে খুঁৎ ধরতে পারে, কিন্তু সমালোচনা করতে পারেনা। কেবল দৃষ্টির সমগ্রতার অভাবেই নয়, সমবেদনার অভাবেও। সে তো জানেনা কত দুঃখে একটা জিনিসের সৃষ্টি হয়,—তাই ওর ত্রুটি বার করতেই তার আনন্দ, ওর সার্থকতার দিকে তার দৃষ্টি যায়না।

কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারকে নিজেও করতে হয়েছে সৃষ্টি, তাই তাঁর সমালোচনা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয় হেমেন্দ্রর বিশ্লেষণ উদ্দিষ্ট বস্তুকে পূর্ণতর করে তুলতেই চায়, তাকে বিকৃত-তর ক'রে তুলতে চায়না।

হেমেন্দ্রর রোঁদার ভাস্কর্য্যের আলোচনা আমার মনে আছে। সেই অল্পবয়সেই তিনি যে-জ্ঞান ও রসোপলব্ধির গভীর পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিস্ময়কর। সেখানে হেমেন্দ্র ছিলেন একই সঙ্গে কলাবিদ্ ও কারু-শিল্পের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্র।

কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনায় বিপদ আছে। এ-দেশে সকল দিক থেকে সম্পাদকের টান ধরে, তার সামঞ্জস্য করে ওঠা কঠিন। কিন্তু একেই ঠেকানো চাই। কারণ কোন একটি বিশেষ দলভুক্ত হয়ে পড়'য় কলা-বিদের সত্যদৃষ্টি, নিরপেক্ষ সুবিচার মোহাচ্ছন্ন হয়।

সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়, কিন্তু সম্পাদক হেমেন্দ্রকে এই পুরনো কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সংসারে সব জিনিস সকলে জানেনা, জানা সম্ভবও নয় না-জানা অপরাধও নয়। কিন্তু না-জানা বিষয় নিরর্থ শব্দ-সমষ্টির আড়ম্বরে ধূমাচ্ছন্ন করে তোলায় সম্পাদকের কর্ত্তব্য ত্রুটি ঘটে।

রাগরাগিণীর রূপচিত্র

(শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগে নানা জাতির শিল্পের মধ্যে একটা সংযোগ ও সৌহার্দ্দের সম্পর্ক ছিল; এই সংযোগ ও মিত্রতার সম্বন্ধ বর্ত্তমান যুগে অনেকটা লোপ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এমন বিজ্ঞান নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন শিল্প নাই, এমন কলা নাই; যাহা নাট্যশালার গণ-তান্ত্রিক (democratic) রঙ্গপীঠে সম্মিলিত না হয়। ভরতমুনি নাট্য-শাস্ত্রে স্পষ্টই ব'লে গেছেন :-

> ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা
>
> না সৌ যোগো ন তৎকর্ম্ম যন্নাট্যেঽস্মিন্ন দৃশ্যতে ॥
>
> (নাট্যশাস্ত্র ১ম অধ্যায়, ৮২ শ্লোক)

ভারতবর্ষে যখন এক অখণ্ড সাধনার জীবন্ত ধারা আবহমান ছিল, প্রত্যেক জাতির শিল্প পরস্পরকে তখন শক্তি ও প্রেরণা দ্বারা উন্নত ও প্রসারিত করেছে। রূপশিল্প, সঙ্গীতশিল্প, কাব্যশিল্প, নাট্যশিল্প, এক একান্নবর্ত্তী যৌথ সংসারের অঙ্গ ও অবয়ব হিসাবে, পরস্পর পরস্পরের পুষ্টি-সাধন ক'রে এসেছে। এখন এই শিল্প-গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশীদারগণ পরস্পরের মাঝখানে উচ্চ প্রাচীর তুলে দিয়ে পৃথক হয়েছে, "ভিন্ন" হয়েছে, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হয়েছে। এখন আর সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের, রূপশিল্পের সহিত সাহিত্যের, সঙ্গীতের সহিত রূপশিল্পের সেই পুরাতন মিত্রতার সম্বন্ধ নাই। সেই প্রাচীন যোগসূত্রটী, সেই মিলনের বন্ধন-রজ্জুটি ছিন্ন হয়েছে। এখন আমরা কল্পনাই করতে পারি না, কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প কোন ঐক্যের বন্ধনে, এক সূত্রে এক ছিল? এমন এক সময় ছিল, যখন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের সাহায্য অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ সঙ্গীতের-রূপতত্ত্ব ও প্রয়োগ বুঝতে হ'লে চিত্রের আশ্রয় নেবার আবশ্যকতা ছিল। প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতশিল্প, তাহার সহকারী বন্ধু চিত্রশিল্পের সহিত দুই "যমজ ভাই"-এর মধুর সাম্য ও সাদৃশ্য নিয়ে, ঐক্যের নিবিড় বন্ধনে দুটি বিভিন্ন ভাষার শিল্প এক সাথে মিলে এক সুরেই বেজে উঠেছিল।

সঙ্গীত বিদ্যার আদি যুগেই রাগরাগিণীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিমাবাদ (doctrine of image-worship) অর্থাৎ ধ্যান-সাধনার দ্বারা, মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা মানুষের চিত্তে স্বর্গের শক্তির উদ্বোধন ও আবাহন করবার প্রণালী প্রয়োগ ক'রে সঙ্গীত-রাজ্যের রাগ ও রাগিণীর দুইটি বিভিন্ন ভাবের কল্পনার সূত্রপাত করেন। এই প্রতিমাবাদের প্রয়োগে রাগরাগিণীর দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তির রূপ-কল্পনা করা হ'ল—একটি হ'ল "নাদময় রূপ", আর একটি হ'ল,—"দেবতাময় রূপ"। অর্থাৎ প্রত্যেক রাগের এক একটি অধিদেবতা, স্পিরিট, বা 'ইথুস্' আছে: এই অধিদেবতারা সুরের অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বাস করেন; ধ্যানের দ্বারা আরাধনা ক'রলে এই রাগের দেবতাময় রূপ নাদময় রূপ গ্রহণ ক'রে রাগ-রাগিণীর সুরের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। নাদময় রূপ গায়ক বা বাদকের, কণ্ঠে বা যন্ত্রে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। দেবতাময় রূপ কবিগণের রচনায় এবং চিত্রশিল্পীর পটে ফুটে ওঠে। এই প্রত্যেক রাগের বা রাগিণীর একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি, ভাবরূপ বা রসরূপ আছে। এই ভাবরূপ বা রসরূপটি কি, তা' ঠিক ধ'রতে না পারলে, এর নাদময় রূপ বা স্বরূপটি যন্ত্রে বা কণ্ঠে সঠিক ফুটে উঠবে না। অর্থাৎ কোন্ রস গুণী জাগাতে চান, সেই রসের দেবতা, সেই রসের উপযোগী বিশিষ্ট রাগের দেবতা-রূপকে আরাধনা ক'রতে হবে। তখন গুণী বা সাধকের [illegible] আরাধনার কৌশলে, সেই বিশিষ্ট রসের দেবতা নাদময় রূপ নিয়ে, রাগরাগিণীর মূর্ত্তি ধ'রে, সাধকের কণ্ঠে বা যন্ত্রে অবতীর্ণ হবেন। এই হ'ল ভারতের সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগিণীর মূল তত্ত্ব।

এই প্রত্যেক রাগ রাগিণীর বিশিষ্ট রূপ রসটি কি, সেটি বর্ণনা ক'রে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় নানা ছন্দে রাগ রাগিণীর ধ্যান রচনা করেছেন। সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত নয়; সুতরাং সাধারণ্যে প্রচারের জন্য হিন্দী কবিরা, উত্তর ভারতের সকলে বুঝতে পারে এমন ক'রে হিন্দী ভাষায় রাগমালার ধ্যান রচনা করেছেন। এবং বাংলা দেশেও, যেখানে হিন্দী ভাষা বড় চলেনা, বাংলায় এক প্রাচীন কবি এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাগরাগিনীর ধ্যান বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু মোগল যুগে বাদশারা,—যাঁরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদয় বন্ধু ছিলেন তাঁরা—দেখলেন যে, অনেক নিরক্ষর লোক, যাঁরা খুব সঙ্গীত-পিপাসু এবং যাদের সঙ্গীত-সাধনার প্রতিভা আছে, তাঁদের কাছে পণ্ডিতের শ্লোক, আর ঐ হিন্দী কবিদের দোঁহা সমান রূপেই দুর্ব্বোধ্য; সুতরাং বাদশারা ডাকলেন চিত্রকরদের। এই চিত্রকররা সঙ্গীত-শাস্ত্রকারদের উপদেশমত রাগরাগিণীর "তস্‌বীর" লিখতে লাগলেন। এই "তস্‌বীর"-পত্রাবলীতে, এই রাগমালা চিত্রে, চিত্রশিল্পের নিরক্ষর সার্ব্বজনীন ভাষায়, প্রত্যেক রাগরাগিণীর বিশিষ্ট রস-বস্তুটি কি, আপামর সাধারণের সঙ্গীত-শিক্ষা সুবিধার জন্য রেখাবর্ণের ভাষায় অনুবাদ করা হ'ল এবং এই নিরক্ষর সঙ্গীত-সাধকদের পক্ষে এই রাগমালার চিত্রগুলি সঙ্গীতবিদ্যার ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বা Text Book রূপে ব্যবহৃত হ'তে লাগল। এই রাগমালার তস্‌বীরগুলি একটা খুব দরকারী কাজে লেগেছে। কোন্ রাগিণী কোন্ রসের গানে প্রয়োগ করতে পারা যায়, তারই সহজ উপদেশ এই রাগরাগিণীর চিত্রমালায় চিত্রের লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাগের

রসবোধ ও বিচারে বিজ্ঞান ও আদর্শ,—এই চিত্রাবলী সাধারণের সঙ্গীত-শিক্ষায় যে খুব কাজে লেগেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সঙ্গীতের রসবিচারের দিক দিয়ে এই রাগরাগিণীর চিত্রমালার উপকারিতা আজও বোধ হয় শেষ হয় নি।

একদিকে এই রাগমালার চিত্রকরগণ যেমন সঙ্গীত-শাস্ত্রের উপদেশ ও নির্দ্দেশ পালন করেছে, অপর দিকে প্রাচীন রসশাস্ত্র বা শৃঙ্গারশাস্ত্রের উপদেশ তারা মাথা পেতে নিয়েছে। রসশাস্ত্রের প্রীতি-বিজ্ঞানের প্রতীক, "নায়ক" "নায়িকাদের" আদর্শ অবলম্বন ক'রে, অনেক রাগরাগিণীর প্রতিমা তাঁরা সাধারণের বোধগম্য আকারে রূপ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা অনেক চিত্রেই দেখতে পাব যে, এই প্রাচীন রসশাস্ত্রে কল্পিত আদর্শ-"নায়ক নায়িকাদের" ভূমিকা অবলম্বন ক'রে—প্রত্যেক রাগিণীর বিশিষ্ট রসরূপটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার রূপে অতি সহজে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'কিছু লিখতেই হবে!'

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

নাচঘরের কর্ম্মকর্ত্তার কড়া-হুকুম, এখুনি তাঁকে একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। কেননা তিনি প্রেসে ব'লে এসেছেন, ফর্ম্মার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার কাপি তিনি দশটার মাঝেই যোগাবেন! লিখতে পারিনি, অথবা কি লিখব তাও ভেবে স্থির করতে পারিনি,—এসব কথা তিনি শুনতে নারাজ। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, ভদ্রলোকের এক-কথা। আগে যখন বলেছিলাম পূজোর সংখ্যার জন্য লেখা দোব, তখন তা দিতেই হবে। আর ভাবতে পারিনি ব'লে লিখতেও যে পারব না,' এ যুক্তি তিনি একেবারে অসার ব'লেই উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, যারা ভাবে, তারা গালে হাত দিয়ে ব'সেই থাকে। আর যারা লেখে, তারা কাগজের উপর দিয়ে হাত চালিয়ে নেয় অতি দ্রুত গতিতে। কাজেই হাত গালে রেখে যখন লেখা যায়না, তখন অবশ্য-লিখিতব্য বিষয়ের জন্য গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। জানা কোন যুক্তি দিয়েই এই উক্তি উড়িয়ে দিতে পারলাম না। কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই হোলো।

•

কিন্তু নাচঘরের জন্য লেখা বড় শক্ত কাজ। কেননা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কোন নীতি নিয়েই এ কাগজে লেখা চলবেনা। যদি চলত', তাহ'লে 'হরিজন', 'নারীহরণ' অথবা 'অখণ্ড মানবজাতির অর্থনৈতিক একীকরণ' সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত এবং সুললিত প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারতাম—অবশ্য দু'চার খানা দৈনিক দেখে নিয়ে। এ-রকম প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস এককালে বেশ ছিল, এখনো চেষ্টা করলে হয়ত পারব; কিন্তু নাচঘরের জন্য লেখা বড়ই মুস্কিল! নৃত্য, নাটক, নাট্যশালা, সবাক ও অবাক ছবি আর নীরব ও মুখর ছবিদের এবং তৎসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে লেখা যায়না—অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হয়।

ইহুদী-কা লেড়কী-চিত্রে
রতন বাঈ

•

ওঁরা মনে করেন, আমার লেখা পাঁচ-পাঁচখানা নাটক যখন মহাসমারোহে অভিনীত হয়ে গেল, পাঁচজন পরিচালক এবং পাঁচজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় আছে, তখন অন্তত নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে বলবার অনেক কথাই আমার আছে এবং অভিজ্ঞতাও আমি অর্জ্জন করেছি। অস্বীকার করিনা; অভিজ্ঞতা অনেক অর্জ্জন করেছি। এবং তা করিছি ব'লেই আরো লিখতে ভয় পাচ্ছি।

নাটক সম্বন্ধে জানা এবং শোনা সব ভালো-ভালো কথাগুলি গুছিয়ে যদি একটা প্রবন্ধ লিখি, জানি যারা পড়বেন, তাঁদের মাঝে কেউ কেউ বলবেন, বেশ লিখেছে হে! কিন্তু সমালোচকরা যখন প্রশ্ন তুলবেন, নাটক সম্বন্ধে বুকনি ত বেশ চালালে, কিন্তু তোমার লেখা-নাটকে সে উচ্চ আদর্শ কোথায়, কোথায় সেই কলা-কৌশল, সেই সার্ব্বজনীন ভাব-প্রবাহ? নাটক লিখে যে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি; চালাকী ত চলবেনা! আমি যখন রাজনৈতিক দলের কাগজ চালাতাম, তখন রাজনৈতিক আন্দোলন করতাম না; যখন নাট্য-সমালোচনা লিখতাম, তখন নাটক লিখতাম না—স্রেফ কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে। সে-ভয় আমার আজও যায়নি।

যাঁরা মনে করেন, আমি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি, তাঁদের বলি—যদি নাট্য-সমালোচনা লেখেন, তাহ'লে নাটক লিখবেন না, আর নাটক লিখলে নাট্য-সমালোচনায় হাত দেবেন না।

কথাটা বলে ফেল্লাম। কিন্তু জানি প্রশ্ন উঠবে। ও-দেশী এবং এ-দেশী বহু নাট্যকারের নাম শুনিয়ে আমাকে সমঝে দেবার চেষ্টা চলবে যে, তাঁরা যেমন নাটকও লিখেছেন, তেমনি নাট্য-সমালোচনাও করেছেন। তেমন জনকত নাট্যকারের নাম আমিও শুনেছি। কিন্তু আমি মনে করি, তাঁরা নাটক 'লেখেন'নি—'সৃষ্টি' করেছেন। যে-টুকু শক্তি থাকলে লেখা যায়, সেই-টুকু শক্তি নিয়েই সৃষ্টি করা যায় না। যিনি শুধুই লেখেন, তার চেয়ে লিখে যিনি কিছু সৃষ্টি করেন, তিনি অনেক বেশী শক্তিমান এবং শক্তিমানের পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভবপর।

আশা করি, নাটক সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমি রাজী নই কেন, তা এ থেকে সবাই বুঝতে পেরেছেন।

এবার নাট্যশালার কথাই তোলা যাক্। ও-সম্বন্ধে কোন কিছু লেখা একেবারেই নিরর্থক এই কারণে যে, ও-সব প্রতিষ্ঠানের যাঁরা অধিকারী, তাঁরা লেখকদের মত-বাদকে আমলেই আনেন না, অবশ্য বিজ্ঞাপনে যে-টুকু ব্যবহার করা চলবে, সেইটুকু ছাড়া! প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের হদিস ওঁরা পান টিকিট-ঘরের ব্যারোমিটার থেকে, কাগজের প্রবন্ধ থেকে নয়। খদ্দেরকে খুশী করাই ওঁদের কাজ এবং ধর্ম্মও বটে। কেন না, খদ্দেরের কাছ থেকে ওঁরা টাকা নেন, তাঁদের খুশী করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। খেয়াল চরিতার্থ করবার স্বাধীনতা ওঁদের নেই। বাজারে জাপানী মালের চাহিদা যতদিন থাকবে, ততদিন যেমন খাদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তেমনি নাট্যশালার খদ্দেরদের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে নাট্যশালাকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হবে না।

জানি, এ তেমন জোর-জবাব হোলো না। কেন না দেখা গেছে, মন্বন্তরের সময় মানুষ ভাত না পেয়ে কচু-সিদ্ধও খায়। তাই খায় ব'লে যেমন বলা চলে না যে, মানুষ কচু-সিদ্ধ খেতেই ভালোবাসে, তেমনি সুষ্ঠু প্রযোজনার একান্ত অভাববশতঃ নাট্যশালার খদ্দেররা খেলো জিনিষের পোষকতা করতে বাধ্য হচ্ছেন ব'লে ন্যায়ত এ-কথাও বলা যায় না যে, তাঁরা ওই দেখতেই ভালোবাসেন। এ-যুক্তি কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে যদিও দেওয়া যায় না, তবুও এর উপর নির্ভর ক'রেই নাট্যশালার অধিকারীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে না। কেন, তাই দেখা যাক্। অন্নের অভাবেই দেশে মন্বন্তর হয়। ভালো নাটকের এবং সু প্রয়োজনার প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবেও হয় নাট্যশালায় খেলো জিনিষের প্রাদুর্ভাব। মন্বন্তরের সময় কেবল মানুষের কল্যাণ কামনায় কত দানবীর, কর্ম্মবীর কচু-সিদ্ধ খাবার দুর্গতি থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য টাকা নিয়ে কর্ম্মী নিয়ে এগিয়ে আসেন—তবে মানুষ খেয়ে বাচে। কিন্তু কেবল নাট্যশালার কল্যাণ-কামনায় আজ পর্য্যন্ত দেশের ক'জনা কলানুরাগী এগিয়ে এসেছেন, কেউ ব'লে দিতে পারেন? যাদের দেশের অনুকরণে আমরা নাট্যশালা গ'ড়ে তুল্লাম, তাদের দেশে কিন্তু এ সাহায্য দুর্ল্লভ নয়। ব্যষ্টির সাহায্য ত আছে, গভর্ণমেণ্টের, মিউনিসিপালিটির সাহায্যেও সে-দেশের বহু নাট্যশালা সম্পন্ন। তাই ও-দেশের নাটক জীবন্ত, নাট্যশালা শ্রীসম্পন্ন। আর আমাদের? কল্পনা-প্রবণ কোন একটি লোক হয়ত কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করল—নাটক জম্‌ল ত' দিন তার কোনমতে চ'লে গেল; তারপর হয়ত দু'খানা, তিনখানা নাটক জমল না, তার পুঁজি গেল, উপার্জ্জন বন্ধ হলো, ঋণের পরিমাণ মাসের পর মাস বৃদ্ধি পেতে লাগল, শেষটায় একদিন লালবাতী জেলে দিয়ে বেচারাকে তার ভিটে-মাটি রক্ষার জন্য বিব্রত হয়ে পড়তে হোলো! এমনি যাদের দুরবস্থা তাদের যদি বলি; নিউ-এম্পায়ারের মতো বাড়ী কর, প্রেক্ষাগারকে আরাম-উদ্যানের মত আরাম-দায়ক ক'রে তোলো, আধুনিক যন্ত্র-পাতি আমদানি কর, শকট-মঞ্চ, গোলক-মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত কর, সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রীর আমদানি কর, রূপবান, গুণবান, সাধনায়-সিদ্ধ অভিনেতা দাও, তাহ'লে তার জানে কুলোবে কেন? হয়ত তবুও সে চেষ্টা করবে। আর সেই চেষ্টায় তার দারিদ্র্যই বেশী ক'রে প্রকাশিত হবে, নাট্যশালার দান হয়ে যাবে আরো খেলো! এ শুধু যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা নয়—এই আমার অভিজ্ঞতা!

আজ যদি নাট্যশালা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হয়, তা অধিকারীদের বল্লে চলবে না। বলতে হবে তাঁদের, যাঁরা কাউন্সিলে কর্পোরেশনে ব'সে দেশের রাষ্ট্রিক্, আর্থিক, মানসিক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করছেন! আমি নাট্যশালার অধিকারীদের অক্ষমতা দেখে ব্যথা পাই না, ব্যথা পাই তাঁদেরই ঔদাস্য দেখে, যাঁরা করদাতাদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁদেরই দৈহিক ও মানসিক উন্নতি করচেন ব'লে সকলের শ্রদ্ধা চান। যদি নগরের ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানগুলি, লাইব্রেরীগুলি, শিক্ষায়তনগুলি নাগরিক-প্রদত্ত করের কড়ির ভাগ পেতে পারে, তাহ'লে নাট্যশালাই বা কেন উপেক্ষিত, অস্বাস্থ্যকর, অনুন্নত হয়ে প'ড়ে থাকবে? কেন? ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি ব'লে? পতিতার পঙ্ক-তিলক নাট্যশালার কপালে রয়েছে ব'লে?—এ-সব প্রশ্নের জবাব যতদিন না পাওয়া যাবে, ততদিন নাট্যশালা সম্বন্ধে কোন কিছু লেখা নিরর্থক!

আচ্ছা, এবার দেখা যাক, অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা যায় কিনা। অনেক সময় অনেকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি, আবার অনেকের অভিনয় দেখে বিরক্তিও বোধ করেছি। আমারও যেমন মন-মেজাজ আছে, অভিনেতৃদেরও তাই আছে। সুতরাং আমি যে-দিন খোস-মেজাজে অভিনয় দেখেছি, সে-দিন হয়ত' বিশেষ কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী বেহাল-তবিয়তে অভিনয় করতে পারেন নি। অথবা আমারই মেজাজ ভালো না থাকায় কোন দিন হয়ত খুব ভালো অভিনয়ও আমার মন ভোলাতে পারেনি। সুতরাং সাধারণ ভাবে অভিনয় নিয়ে আলোচনা করাও সুবিধের ব'লে মনে হচ্ছেনা।

অভিনয় কি কেবল অভিনেতৃদেরই ওপর নির্ভর করে? করেনা। ভাল বই চাই, অভিনেতৃদের অভিনয় করবার সুযোগ পাওয়া চাই, রসকে জমিয়ে তোলবার সাজ-সরঞ্জাম, দৃশ্য-পট, আলো-ছায়ার খেলা, সুর, সঙ্গীত, অর্থাৎ কল্পলোক সৃষ্টির অনুকূল সব অবস্থা থাকা চাই, অভিনয় যাঁরা করছেন, তাঁদের প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগ ও সাহচর্য্য চাই, আর চাই দর্শকদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি।

যতদিন দেখব, অভিনয়কালে অভিনেতৃরা এ-সব পান না,—প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিচালিত নাট্যশালার অভিনেতৃরা তা পেতে পারেন না—ততদিন অভিনয়ের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হ'লে অবিচারই করা হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, নাটক এবং নাট্যশালা সম্বন্ধে কোন কথাই আমি যুৎসই লিখতে পারছিনে।

ভদ্রলোকের এক-কথা। সুতরাং শেষ অবধি চেষ্টা ক'রতেই হবে। এইবার ছায়া-চিত্রের রাজ্য। অবাক্ চিত্র কলকাতাতেও আর দেখতে পাওয়া যায়না—শো-হাউস মুখর হবেন ব'লে দ্বাররুদ্ধ করেছেন। আর সবাই সবাক্। বিদেশী ছবি সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে লাভ নেই, কেননা আমার নিন্দা-স্তুতি ছবির মালিকদের কাণে পৌছুবে না—তাঁরা পাশও দেবেন না, গালও দেবেন না। তবে মানতে হবে, ছবি তাঁরা ভালোই দেখান।

বাংলা সবাক্-ছবি সম্বন্ধে আমার নির্ব্বাক থাকাই ভালো; কেননা আমি না দেখিছি "চণ্ডীদাস", না দেখিছি "সীতা", "সাবিত্রী", "শ্রীগৌরাঙ্গ" প্রমুখ বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদগুলি!

মলাট প'ড়ে সমালোচনা চলে, তাও আমি জানি; আর পরের মুখে শুনে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচার করা যায়, তাও আমি মানি। আমার বিশ্বাস, তার জন্য নাচঘর কাগজ নয় এবং নয় আমার এই জলো লেখা!

বাকী রইল এক নৃত্য। নৃত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে পারি, যদি এক গাদা বই পাই। বই নেই এবং পড়বারও নেই সময়। আচ্ছা, উদয়শঙ্করের নাচ সম্বন্ধে যদি লিখি! একবার ত লিখেওছিলাম নবশক্তির সম্পাদকীয় স্তম্ভে। না কাজ নেই। সে-লেখায় নাচ সম্বন্ধে কিছুই ছিল না, ছিল কেবল স্বাদেশিকতা, নাচঘরে তা চলবে না।

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে

কলিকাতার উৎসব-আনন্দ

['গিরিশচন্দ্র'-প্রণেতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সংগৃহীত]

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যেক পল্লীতে বারো মাস আনন্দ-উৎসব চলিত। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ভবনে বারো মাসে তের পার্ব্বণ তো চলিতই, তাহার উপর প্রায়ই একটা না একটা উৎসব লাগিয়াই থাকিত। অনেকেই দশজনকে লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। ছাতু ও নাটুবাবু এবং সাতু সিংহের প্রায় দুই শত আনন্দ-সহচর ছিল। অন্নচিন্তায় পড়িয়া তাঁহাদের হাবুডুবু খাইতে হইত না। আনন্দ-সহচরদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। এখন আর কলিকাতায় সে উৎসব নাই, সে আনন্দ নাই, সে ক্রীড়া-কৌতুকের নামগন্ধও নাই। আমরা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের কতকগুলি আনন্দ-উৎসবের উল্লেখ করিতেছি :—

ইংরাজ লইয়া আনন্দ

(ঠাকুর-বাড়ীতে)

বর্ত্তমান সময়ে যেমন যে-সে ব্যক্তি সাহেব-বিবি নিমন্ত্রণ করিয়া 'পার্টি' দিয়া থাকেন, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সাধারণ লোকে সেরূপ সাহেব-বিবি লইয়া মজলিস করিতে পারিতেন না। তখনকার সাহেবী মজলিস দুই একজন অতি প্রধান লোকের প্রাসাদেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ঠাকুর-বংশে প্রিন্স দ্বারকানাথের মজলিস-ভোজে স্বয়ং বড়লাট ও বড়লাট-পত্নীকে উপস্থিত থাকিতে হইত। 'লর্ড' অক্‌লাণ্ড এবং তাঁহার ভগিনীরা দ্বারকানাথের নিত্য অতিথি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বেলগেছের বাগানে ঝিলের উপর যখন নৌ-ক্রীড়া হইত, তখন অক্‌লাণ্ড ও মিস্ ইডেন দ্বারকানাথের সহিত একাসনে বসিয়া তাহা দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন। কখনও কখনও লর্ড অক্‌লাণ্ড নিজে হাল ধরিতেন; দ্বারকানাথ আর মিস্ ইডেন নৌকায় বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেন।

তখন দ্বারকানাথের ভোজে যত বড় বড় সাহেব-বিবিরই নিমন্ত্রণ হইত। যাঁহার নিমন্ত্রণ হইত না, তিনি কলিকাতার বিলাতি সমাজে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইতেন। এইজন্যই কোন কোন সাহেবকে সই-সুপারিসের জোরে নিমন্ত্রণ লইতে হইত। কাহাকেও দ্বারকানাথের বন্ধুজনের কাছে উমেদারী করিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। শুনিয়াছি,—এক প্রধান বিদ্যালয়ের সাহেব-অধ্যক্ষ, দ্বারকানাথের এক মিত্র-মিত্রের সুপারিসে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

এই মিত্রও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাহেব-অধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন না। মিত্র দ্বারকানাথকে এ কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন। একদা এক মহাভোজে দ্বারকানাথ ঐ সাহেব-অধ্যক্ষকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। যেখানে বড়লাট ও তাঁহার প্রধান অমাত্যদিগেরই নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, বড় আদালতের বড় জজেরই যেখানে আদর হইয়া থাকে, বঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরকেও যেখানে নরম হইয়া থাকিতে হয়, শিক্ষাবিভাগের প্রধান-কর্ত্তাও যেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন,যখন প্রিন্স দ্বারকানাথের সেই ভোজে উক্ত সাহেব-অধ্যক্ষ নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন—আনন্দে তিনি নাচিয়া উঠিলেন।

যথাকালে ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিরই সমাগম! ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বিশাল বৈঠক-ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিত্র প্রস্তুত ছিলেন, আবাহন করিয়া তাঁহাকে দ্বারকানাথের কাছে উপস্থিত করিলেন। দ্বারকানাথও তাঁহাকে রাজোচিত আদরে আদৃত করিয়া, যত বড় বড় সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দিলেন,—"মিত্র আমার পরম মিত্র।" ব্যস্—মিত্রের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি অধ্যক্ষের দক্ষিণ-হস্ত হইলেন, এবং ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল।

(শোভাবাজার রাজ-বাড়ীতে)

শোভাবাজারের রাজবাটীতে ৺পূজার সময়ে তখন যেরূপ ধুমধাম ও উৎসব-আনন্দ হইত এবং 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে গগনমণ্ডল মুখরিত হইত, এখন তাহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। পূজার সময়ে শোভাবাজারের সাহেবী-ভোজ সহরের একটী বার্ষিক মহা ব্যাপার বলিয়া পরিচিত ছিল। অনেক সাহেব-বিবি ঐ উৎসবে নিমন্ত্রণ-লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের সময়ে যে প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অনেক কালই মহাসমারোহে চলিয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যে বাড়ীতে উৎসবের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, পরে কত বড়লাটকেই সে বাড়ীতে উৎসব করিতে হইয়াছিল। বহুবার বঙ্গের লাটকেও শোভাবাজারের শোভা বর্দ্ধন করিতে দেখা গিয়াছে। উৎসব এখনও হয়,—তবে তখনকার আনন্দে আর এখনকার আনন্দে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

(বহুবাজার—দত্ত-বাড়ীতে)

বহুবাজারের—ওয়েলিংটন স্কোয়ারের—দত্ত-ভবনেও কখনও কখনও বিলাতী মজলিসের আয়োজন হইত। অক্রূর দত্তের রাসের শেষে একটা প্রধান অঙ্গই হইয়াছিল—সাহেব-বিবির নিমন্ত্রণ। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত-ও এ অঙ্গ অনেকদিন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। দত্তবাড়ীর রাসের ধুম সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

(পাইকপাড়া—রাজবাড়ীতে)

পাইকপাড়া রাজবাটীতেও বড় বড় সাহেব-বিবির আদর-অভ্যর্থনা হইত। রাজা প্রতাপনারায়ণ এবং ঈশ্বরচন্দ্র আনন্দ-উৎসবে অকুণ্ঠিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের বংশ শোভাবাজারে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশ পাইকপাড়ায়—দুই স্থানই দুই বংশের জন্য রাজধানী হইয়াছিল। শোভা-বাজার এখনও একাই এক সহর, পাইকপাড়াও বড় কম নহে।

ইহার অনেক পরে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি রাজা, মহারাজাদিগের ভবনে বড় লাট ও ছোটলাটদিগের বহুবার শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ-প্রবণতা, উৎসবদক্ষতা এবং ব্যয়-সামর্থ্যের ত্রুটি না হইলেও রাজা না হইয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর যেরূপ রাজাধিক উৎসবে রাজাধিক ব্যয়ভার বহন করিতেন,—সেরূপ অন্যের পক্ষে সহজ ছিল না।

দেশীয় আমোদ

দেশীয় আমোদ-প্রমোদ, উৎসব-আনন্দে তখনকার কলিকাতা অদ্বিতীয় ছিল। নাচ, গান, যাত্রা, পাঁচালীর তখন বারোমাসই আদর ছিল। তখন—প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বেও—কলিকাতায় প্রত্যহ রাত্রে সিমলা, রামবাগান, চড়কডাঙ্গা, নিমতলা—এইরূপ গোটাকতক পল্লী ঘুরিতে পারিলে—কোন স্থানে না কোন স্থানে যাত্রা শুনিতে পাওয়া যাইত। যাত্রায় তখনকার লোকের এতই অনুরাগ ছিল—যাত্রাওয়ালাদেরও এতই উৎসাহ ছিল।

বৈঠকী গানের তো কথাই নাই। এক এক পাড়ায় দশ বারোটা বাটীতে প্রত্যহ বৈঠকী গান চলিত। ভাল ভাল কালোয়াতেরা তখন কলিকাতার বড়লোকদিগের কাছে নিত্যপূজার অধিকারী ছিলেন। তখনকার বারাঙ্গনা-ভবনেও সঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল। তখনকার ধনীরা সামাজিকতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। রক্ষিতা অবিদ্যার গৃহে সঙ্গীতের আয়োজন না করিলে তাঁহাদের একদিনও চলিত না।

মাদক সেবা

এখানকার মত তখন মদের ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি হয় নাই। এখন যেরূপ বেশ্যালয়গুলা মদ্যপানেরই আড্ডা বলিয়া আদৃত, তখন সেরূপ ছিল না। তখন নেশার মধ্যে চরসেরই অধিক চলন ছিল। গাঁজার

আদর অন্তঃপুরেই দেখিতে পাওয়া যাইত। গুলির তখনও আদর ছিল না, এখনও নাই। চীন তখনও এদেশে চণ্ডু চালাইয়া দিতে পারেন নাই। গঞ্জিকা একটু প্রবীন সমাজে স্থান পাইতেন। যুবক-সমাজে চরসেরই আদর ছিল। ছোকরা-মহলে সিদ্ধিই ছিলেন বুদ্ধিদাত্রী আর সিদ্ধির মিত্র মাজন-খাট্টাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন।

বাগান-বাড়ী

বাগান-বিহারের তখনও রেওয়াজ ছিল; কিন্তু এখন যেমন যত বাবু, তত বাগান,—তখন সেরূপ ছিল না। তখন কলিকাতার দুই পাঁচটী সম্ভ্রান্ত কুলেরই বাগান-বাড়ী ছিল। শনিবার, রবিবার তখনও বাগান-পার্টি হইত। কিন্তু বাগানে তখন মদ্য প্রায়ই চলিত না। এখন মদের যে পদ, তখন চরসকেই সেই পদে বসিতে হইত। শুনিয়াছি, কোনও এক বাগান-ভোজে একদিনে বত্রিশ টাকার চরস পুড়িয়াছিল।

বারোইয়ারী পূজা

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় বারো-ইয়ারী পূজা হইত। সিমলা ও বাগবাজারের বারোইয়ারীর লড়াই এখনও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তখনকার এক এক বারোইয়ারীর খরচে এখনকার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে। তখনকার পূজায় রাজসিক ও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য ছিল। তখনকার অন্য সকল পূজার ন্যায় বারোইয়ারী পূজায়ও দান-ধ্যানেরই বাড়াবাড়ি ছিল। নাচ তামাসা, সাজ-সজ্জা যে ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু কাঙ্গালী-ভোজন, কাঙ্গালী-বিদায়, অধ্যাপক-বিদায় প্রভৃতি সাত্ত্বিক দানেই তখনকার অধিক অর্থ ন্যস্ত হইত।

হাফ্ আখ্‌ড়াই

স্বনামধন্য নিধুবাবু তাঁহার মাতুল সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ কুলুইচন্দ্র সেনের নিকট আখ্‌ড়াই গানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বাগবাজারনিবাসী সুবিখ্যাত মোহন চাঁদ বসু নিধুবাবুর নিকট আখ্‌ড়াই গান শিক্ষা করিয়া, পরে আখ্‌ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখ্‌ড়াই গানের সৃষ্টি করেন। তৎকালে হাফ্ আখ্‌ড়াই ছিল—গানের রাজা। সৌখীন ধনী ও ভদ্র গৃহস্থগণ প্রবল উৎসাহে, বিশেষ বিশেষ ধনাঢ্য-ভবনে আসরে বসিয়া এই গান গাহিতেন। বাগবাজার, শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা ও যোড়াসাঁকোর দল হাফ্ আখ্‌ড়াই গানের জন্য বিখ্যাত ছিল। নিধুবাবু, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি স্বয়ং হাফ্ আখ্‌ড়াই দলে উপস্থিত থাকিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে—সদ্য-সদ্য গান বাঁধিয়া দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার মনোমোহন বসু এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষও ইহার পরে হাফ্ আখ্‌ড়াই দলের গীত রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ফুল ও হাফ্ আখ্‌ড়াই ব্যতীত সখের পাঁচালী, সখের কবি প্রভৃতির সে সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল। রূপচাঁদ পক্ষীর গান এখনও অনেকের কণ্ঠে শোনা যায়।

থিয়েটার

ষ্টেজ বাঁধিয়া এখনও থিয়েটারের রেওয়াজ হয় নাই। চৌরঙ্গীতে ইংরাজদের থিয়েটার দেখিয়া শ্যামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাটীতে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যাত্রাকারে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন ইংরাজি থিয়েটার বা আধুনিক নাট্যশালার ন্যায় অঙ্কিত দৃশ্যপটাদি ব্যবহৃত না হইলেও এই অভিনয়ে বিশেষ নূতনত্ব ছিল। নাট্যোল্লিখিত দৃশ্যগুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানাস্থানে সাজান হইয়াছিল। একস্থানে—বীরসিংহ রায়ের রাজসভা; একস্থানে—সুন্দরের বসিবার জন্য বকুলতলা; একস্থানে—মালিনীর গৃহ; বাটীর শেষভাগে মশান,—এইরূপ ভাবে বিভিন্ন দৃশ্য সজ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণকেও অন্য দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিতে হইত। এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছিল এবং সহরে একটা আনন্দ-কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল।

THE DEVIL IS DRIVING

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ উইল্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত "উত্তর রামচরিত" নাটক—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়োর বাগানে অভিনীত হয়। উইল্‌সন্ সাহেবের শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ২৯শে মার্চ্চ বড়লাট-ভবনে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরাজীতে "মার্চ্চেণ্ট অফ্ ভিনিস্" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণের নাম:—

ডিউক—রাজেন্দ্রনাথ সেন
শাইলক—উমাচরণ মিত্র
এণ্টোনীয়ো—গোপালকৃষ্ণ দত্ত
পোর্শিয়া—অভয়চরণ বসু
গ্রাসিয়ানো—রাজেন্দ্রনাথ দত্ত
বাসানীয়ো—রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু
সালারীণো—গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
নেরীশা—রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
নেলিগ্রে—গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

নরোত্তম দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত, অবতার গাঙ্গুলি প্রভৃতিও এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন।

বড়লাট অকল্যাণ্ড, তাঁহার ভগিনী মিস্ ইডেন, বড় পাদরী লর্ড বিশপ, অমাত্য শেক্সপীয়র প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোকই শেক্সপীয়রের অভিনয় দেখিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন।

ইংরাজি নাটকের অভিনয় হিন্দু কলেজে (পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে) মাঝে মাঝে হইত। কাপ্তেন রিচার্ডসনের বড় উৎসাহ ছিল। সংস্কৃত কলেজেও কদাচ কখনও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

ইংরাজীতে শেক্সপীয়রের নাটকাভিনয় তখন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য সম্প্রদায় মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকগুলির রসাস্বাদন

করিয়া শিক্ষিতগণেরও তেমন তৃপ্তি হইত না, আর জনসাধারণ তো ইংরাজি ভাষায় অভিনীত হওয়ায় নাটকীয় রসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত হইত। অভিনয়োপযোগী নাটকও তখন বঙ্গভাষায় ছিল না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক পাথুরিয়াঘাটা, চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে অভিনীত হয়। এই প্রথম বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় দেখিয়া শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেরই আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। সেই হইতেই বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হয়।

মেড়ার লড়াই ইত্যাদি

ঘুড়ীর লড়াই, ঘোড়ার লড়াই, মেড়ার লড়াই প্রভৃতি লইয়া তৎকালে বিলক্ষণ আমোদ চলিত। ঘোড়দৌড়ে তখনকার বাঙ্গালীরা যোগ দিতেন না। কিন্তু ঘোড়ার লড়াই তখনও ছিল। সওয়ারেরা ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়ায় বাজী মারিতেন। নৌকার লড়াইয়ে—বাচখেলায়—তখনকার লোকের বড়ই অনুরাগ ছিল। মেড়ার লড়াই এখন দুই একজন হিন্দুস্থানীর কাছে আদৃত হইয়া থাকে। তখন মেড়া পোষা, মেড়াকে লড়াই শেখান,—অনেকেরই নিত্য আমোদে পরিণত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রামে মেড়ার লড়াই উপলক্ষে শেষে শ্রাদ্ধ গড়াইত, আদালতে পর্য্যন্ত অভিনয় হইত।

বুলবুলীর লড়াই

তখনকার কলিকাতার একটা নিজস্ব আমোদ ছিল—বুলবুল-ফাইট বা বুলবুলীর লড়াই। ছাতুবাবুদের বুলবুল-খানাই ছিল অদ্বিতীয়। এখন যেখানে বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া বিডন স্কোয়ার পোষ্টাফিস হইয়াছে, ঠিক উহারই দক্ষিণে এক বিরাট আটচালা ছিল। আটচালার চারিদিকে লম্বা লম্বা দড়ি খুঁটীর গায়ে লাগান ছিল, চারিদিকেই ফেট্টি-বাঁধা বুলবুল বিরাজ করিত। প্রত্যহ ঘৃত, দুগ্ধ, ছাতু, ফড়িং প্রভৃতি পক্ষিভোজ্যে উদর পূর্ণ করিয়া বুলবুল মহাশয়েরা আনন্দে কালযাপন করিতেন। আর নির্দ্দিষ্ট দিনে কেহ কেহ সমাগত বুলবুল-যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রভুর হর্ষ বা বিষাদ বাড়াইয়া তুলিতেন। ছাতুবাবুদের বুলবুলখানায় প্রায় দুই হাজার বুলবুল থাকিত। শেষাবস্থায় বুলবুলখানা ছাতুবাবুদের মাঠ হইতে উঠিয়া গিয়া ৺দয়ালচাঁদ মিত্রের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়াছিল। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"—দয়ালবাবুও ছাতুবাবুর মত আনন্দ-উৎসব করিতে ভালবাসিতেন।

উপসংহার

তখনকার কলিকাতায় আমোদ-আহ্লাদ, উৎসব-আনন্দ ছিল নানারূপ। অনেক উৎসবের লোপ হইয়াছে, অনেক এখনও আছে, কিন্তু প্রায়ই মিটমিটে হইয়া। এখন আবার অনেক নূতন উৎসবের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সবিস্তর আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মোটের উপর, তখনকার উৎসবে যেরূপ সহৃদয়তা এবং সরলতা ছিল, এখনকার উৎসবে সদা সর্ব্বদা সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন যেরূপ একজনের উৎসবে সহস্র জন প্রাণ ভরিয়া, মন মাতাইয়া যোগ দিতেন, এখন সেরূপ যোগ দেন না। তখনকার অতি-বড় ধনীরাও যেরূপ অল্পধন বা নির্ধনদিগের সহিত মাখামাখি করিতেন, এখনকার ক্ষুদ্র ধনীরাও সেরূপ করেন না।*

* নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রে ১৩০৮ সাল, ২১শে ভাদ্র তারিখে 'নাগরিক আনন্দ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধটী উপাদেয় বোধে এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। 'নাচঘর'-পাঠকবর্গকে ৺পূজার উপহার স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধটী আবশ্যক বোধে সামান্য পরিবর্ত্তন এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করিয়া উপহার প্রদত্ত হইল।

ব্রিটিশ্ চিত্রের তথাকথিত 'উৎকর্ষ'

(শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ)

ব্রিটিশ্ চিত্র-নির্ম্মাতাদের আজ তাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব সৌভাগ্যের জন্ত আমেরিকাকে, বিশেষ ক'রে ওয়ার্ণার্ ব্রাদার্স্-কে অকপট ধন্তবাদ জানাবার সময় এসেছে। একটুখানি হিসেব ক'রে দেখ্লেই বোঝা যায়—ওয়ার্ণার্-এর "The Singing Fool", যা হচ্ছে হলিউডের সত্যিকারের প্রথম সবাক্ চিত্র, তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে ব্রিটিশ চিত্রের উপস্থিত সৌভাগ্য-সোপানের প্রথম স্তর রচিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ্ ছবির এই ভাগ্যবস্তাকে কে আজ অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা রাখে? বছর ছয়েক আগে আমেরিকা যেদিন পর্দ্দার পিঠে ছায়ামূর্ত্তির অধরে দিল বাণী, কণ্ঠে দিল সঙ্গীত, সেদিন সেই অ-পূর্ব্ব কৃতিত্বের গৌরবে, শ্লাঘায় তাদের বুকের ছাতি ফুলে অনেকখানি-ই উঁচু হয়েছিল। তারা ভেবেছিল—ভেবেছিল কেন, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল—যে, অশরীরী পট-মূর্ত্তিকে বাঙ্ময় ক'রে সাধারণের বহুদিনের স্বপ্ন-কামনাকে এত-দিনে তারাই বাস্তব ক'রে তুল্‌ল, যন্ত্র-রাজের মুকুটে তারা পরাল দিব্যোজ্জ্বল মরকত-মণি! অতএব, চিত্রজগতে তারাই হ'য়ে রইল চিরকালের মত একচ্ছত্র অধিপতি—কি কলা-রসের দিক্ থেকে, কি ব্যবসা-গত সাফল্যের দিক থেকে। তাদের এই নবীনতম আবি-ষ্কারের যে অপ্রত্যাশিত গৌরব, তাকেই মূলধনরূপে ভাঙিয়ে চিরকাল তারা চ'লে যেতে পার্‌বে।

সেদিন আমেরিকার এই স্পষ্ট, স্পর্দ্ধিত উক্তি সারা পৃথিবী হয়তো বা সসম্ভ্রমেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইংলণ্ড করেনি। আমেরিকার গগনচুম্বী স্পর্দ্ধা দেখে ইংলণ্ড মুখ টিপে শুধু হেসেছিল, আর হেসে-ছিল। ছ'বছর অতীতের ব্যবধানে ব'সেও দূর-ভবিষ্যতের কালো যবনিকা ঠেলে প্রকৃত সত্য-টুকু তারা হয়তো সেদিন নখ-দর্পণে দেখ্তে পেয়েছিল।

তার পরের ব্যাপারটুকু যেমনি meteoric, তেমনি দুঃখকর, এবং চিত্রা-মোদিদের কাছে তেমনিই সুপরিজ্ঞাত। আমেরিকা দিন-দিন বিশ্বচলচ্চিত্র-জগতের ওপরে তার সেই দুশ্ছেদ্য অধিকার-বন্ধন থেকে চ্যুত হ'য়ে পড়্ছে। World Market তারা দিনের পর দিন ধ'রে হারিয়ে ফেল্ছে এবং আমেরিকার এই হারাণো-গৌরবের 'পুরোনো জুতোতে পা ঢোকাবার' চেষ্টা করছে একটু একটু ক'রে ব্রিটেন্। সাফল্যের এই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব নেশায় ব্রিটেন্-এর চোখে ঘোর লেগে এল ব'লে!

Masquerader-চিত্রে

রোন্যাল্ড্ কোল্‌ম্যান্ ও এলিসা ল্যাণ্ডি

*

গোড়াতেই এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা আবশ্যক ব'লে মনে করি আমার নিজের তরফ থেকে। আমি নিজেকে গোড়া থেকে অতি-যত্নে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখে আস্‌ছি তাদের দল থেকে, দিনের পর দিন ধ'রে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে যাদের গলা ভেঙে গেল যে, আমেরিকান্ ছবি প্রতি নিয়ত উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড তাদের কেবল-ই নেমে আস্‌ছে। আমি নিজে খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি যে, তার মূক-চিত্রের তুলনায় তার কথক-চিত্রের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বিন্দুমাত্র নীচু হ'য়ে পড়া দূরে থাকুক্, ক্রমশঃই সে উঁচু হ'তে উঁচুতে যাচ্ছে এবং এমনি উল্কার গতিতে যে, আরো কিছুদিন বাদে ফাইন্ আর্টস্ হিসেবে আমেরিকার সবাক্ চিত্রের কাছে তার নির্ব্বাক্ চিত্র পাত্তা-ই পাবে না। আবশ্যক হ'লে বারান্তরে তা' প্রমাণ করতেও আমি পিছ্-পাও নই একটুও।

কিন্তু তাতে ক'রেই এ' বোঝায় না যে, চারুশিল্প-গত রসাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও দিন দিন তার উপ্‌চে পড়্‌বে। বরং ব্যাপার ঠিক উল্টো। হলিউড যদি সত্যিই কোনদিন ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, সেটা হবে আমা-দেরই পক্ষে অপার দুর্ভাগ্যের কথা। এবং তা' আবার ক'রে সপ্রমাণ করবে যে, সত্যিকারের রসশিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা চিরকালই ক'রে থাকে 'মাইনরিটি'।

•

তবে এ'কথা সত্যি যে, আমেরিকান্ ছবি ওয়ার্ল্ড মার্কেট হারাচ্ছে; এবং at the expense of America, ব্রিটিশ চিত্র উঠ্‌ছে। রসজ্ঞরা প্রশ্ন তুল্‌তে পারেন যে, কোথায় উঠ্‌ছে? লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করব—সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পার্‌বনা। কিন্তু এটুকু বেশ জোর গলাতেই ব'ল্‌তে পারি যে, অর্থগত সাফল্যের দিক থেকে ব্রিটিশ্ চিত্রের ক্রমোন্নতিকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এবং এই প্রবন্ধে আমি বিশেষ ক'রে দেখাতে চেষ্টা কর্‌ব যে, ব্রিটেন্-এর এই যে অর্থগত সাফল্য, তার মূলে তার ছবির রস সৌন্দর্য্য নেই, রয়েছে অন্য জিনিষ।

*

ব্রিটিশ চিত্রের অর্থগত উন্নতির সব-গোড়ার কারণ—ব্রিটানিয়ার সন্তানদের স্বদেশপ্রেম—খাঁটি ইংরেজের-বাচ্ছার সোনার মত খাঁটি, অমিশ্রিত, মহান্ স্বদেশপ্রেম। এ প্রেম তার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়। দেশের মাটির ওপরে যে সত্যিকারের টান্ ইংরাজ কবিকে একদিন প্রেরণা যুগিয়েছিল বল্‌তে—"Home, home, Sweet home"; স্বদেশের যে

শৌর্য্যে, স্বজাতির যে বীর্য্যে মদমত্ত হ'য়ে ইংরাজ-পতাকা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল—"Rule Britannia", এ-ও তার সেই স্বদেশপ্রেম। যে-ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ইংরাজ-নন্দন চার আনার সুলভ বিদেশী পণ্যকে তুচ্ছ ক'রে দশ গুণ মূল্য দিয়ে দেশী জিনিষ কেনে, ঠিক সেই এক-ই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা গাঁটের কড়ি খরচা ক'রে শ্রেষ্ঠ আমেরিকান্ ছবিকে উপেক্ষার চ'ক্ষে দেখে, ব্রিটিশ্ চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তারা জানে, ভাল হোক, মন্দ হোক, এই তাদের আপন জিনিষ, একেই তাই সহানুভূতি কর্‌তে হবে প্রাণপণ ক'রে।

এর প্রমাণ চাইলে হাতের কাছেই পাওয়া যাবে, বেশী দূর যেতে হবেনা। কল্‌কাতার অবিসংবাদীরূপে শ্রেষ্ঠ, বিলাসীর সর্ব্বোত্তম রম্য নিকেতন "New Empire"-এর কথা ধরুন। এঁরা সম্প্রতি শতকরা একশো খানাই ব্রিটিশ চিত্র দেখাচ্ছেন একের পর এক ক'রে। যতদূর মনে হয় এবং যতদূর জানা যায়, আমেরিকান্ ছবি এঁরা আর পারত-পক্ষে দেখাবেন না। এবং এঁদের মনোভাব যখন এমনি, তখন তা' থেকে ধারণা ক'রে নেওয়া আদৌ অযৌক্তিক নয় যে, এতে ক'রে তাঁদের লোক্‌সান হচ্ছেনা কিছুতেই, বরং লাভই হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ' সংবাদও রাখি, প্রায় প্রতি 'শো'-তেই ইংরেজ-নন্দনদের ভীড়ে হাউস্ প্রায় ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। এমন ধারা হ'লে ব্রিটিশ-চিত্রের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সাধ্য আছে আর্থিক উন্নতির পথে না এগিয়ে গিয়ে?

তাদের স্বদেশে অর্থাৎ বিলাতে ছবি-নির্ম্মাণ এবং প্রদর্শনের বিধি ব্যবস্থা সমূহ এর চাইতেও ঢের বেশী সুস্পষ্ট। এক্‌জিবিটার-রা শতকরা কতগুলি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতম • বৈদেশিক চিত্র দেখাতে পারবেন, সে সম্বন্ধে বিলিতি সরকারের কড়া বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। কিন্তু ঊর্দ্ধতম কত অর্দ্ধ ব্রিটিশ চিত্র দেখাতে পারবেন, সে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নেই। অর্থাৎ ঘুরিয়ে নাকে হাত দিলে অর্থ এই দাঁড়ায়—'ওগো, তোমরা যত পার দেশী ছবি-ই দেখাও।' চিত্র-নির্ম্মাণকারক কোম্পানী সমূহ অন্যান্য বহুবিধ সুস্পষ্ট সরকারী সাহায্য তো পায়ই, তা' ছাড়া মোটা অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য ক'রতেও বিলিতি সরকার মোটেই কুণ্ঠিত থাকেন না। অথচ, ভারতের শিশু-চিত্রশিল্পের অদৃষ্টের কথা একবার পাশাপাশি রেখে ভেবে দেখুন—কতখানি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য সে পায় ভারত-সরকারের কাছ থেকে। কারণ চাইতে গেলে সেই বাঁধা গৎ—যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের অভাব। এতেও ব্রিটিশ চিত্র উঠ্‌বেনা?

*

এবং ইংরাজ-পরিচালিত যতগুলি চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত পত্রিকা আছে, তারাও সব ব্রিটিশ্ ছবির উন্নতির জন্য বড় কম দায়ী নয়। সবাক্ চিত্রযুগের গোড়ার যেদিন থেকে ব্রিটিশ্ ষ্টুডিও উঠে প'ড়ে লেগে গেছে ছবির ব্যবসায়, ঠিক সেইদিন থেকেই এই ব্রিটিশ্ কাগজগুলোও তাদের আপ্রাণ চেষ্টা করছে—এদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে। কাগজওয়ালাদের একমাত্র আয়ুধ হচ্ছে—প্রচার-কার্য্য। এবং চলচ্চিত্রের ন্যায় জনসাধারণ-মুখাপেক্ষী ব্যবসায়ের পক্ষে প্রচার-কার্য্য যে কতখানি আবশ্যক, তা' বল্‌তে গিয়ে মুখ ব্যথা করা এ' যুগে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

এই বিলিতি কাগজগুলো স্বদেশ-শিল্পের উন্নতিকল্পে এমনি চ্যাঁচানো-ই চ্যাঁচায় যে, আমাদের কাণের পোকা বেরিয়ে আস্‌বার উপক্রম হয়। এবং মাঝে মাঝে সত্যিই সন্দেহ হয়—উঃ, ব্রিটিশ্ ছবি অসুরের মত পা ফেলে ফেলে কী ঝড়ের গতিতেই না ছুটে চলেছে উন্নতির পথে! ব্রিটিশ-চিত্র সত্যিকারের কাজ করে যেখানে শত্‌করা দু'ভাগ, কাগজগুলো চ্যাঁচায় সেখানে শত্‌করা দু-শো ভাগ। একখানা "Rome Express" তুলে এরা অদ্যাবধি যে-প্রকার তারস্বরে (এবং সমস্বরেও) চীৎকার করছে, তাতে ক'রে এখন বিলিতি সিনেমার কাগজ খুল্‌তেই ভয় হয়। অথচ নিউ এম্পায়ার-এর কল্যাণে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে এসেছি—যে-সব ছবি এরা অসম্ভব-রকমের অথবা মারাত্মক-রকমের ভাল ব'লে চ্যাঁচায়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কী প্রকারের বাজে এবং ওঁচা মাল!

*

বাস্তবিক পক্ষে ব্রিটিশ-চিত্র এখনো অবধি খুব মারাত্মক রকমের কিছু উন্নতি করেনি। অবশ্য কিছু উন্নতি যে করেনি, তা' নয়। বরং অনেক বিভাগে তারা আশাতীত রকমই উন্নতি করেছে। আমি স্বীকার করি, আলোক-চিত্র বিভাগে তারা বহুগুণে উন্নত। স্বীকার করি, তাদের 'লোকেশান্'-নির্ব্বাচন, তাদের 'সেটিংস্' অনেকখানি উন্নত। আরো স্বীকার করি, ইংরাজের মজ্জাগত যে Refined, polished sense of humour, তারও খানিকটা আভাস তাদের ছবি থেকে পাওয়া যায়। তাদের রেকর্ডিং-ও আজকাল প্রায়-নির্দ্দোষ হ'য়ে উঠেছে। এবং আরো স্বীকার করি—যে-সব বহুবিজ্ঞাপিত ব্রিটিশ-চিত্র দেখে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বাড়ী ফিরে আসি, তাদের ভেতরেও এমন বহু নবীন বা প্রবীণ নট ও নটীর দেখা পাই, যাদের রূপদান সাফল্যমণ্ডিত না হ'লেও তাদের অনেকেরই যে 'জিনিষ' আছে, তা' ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ফুটে ওঠে।

এত সব জিনিষ যখন এর ভেতরে আছে, তখন সত্যিকারে আর্টের প্রাঙ্গনে ব্রিটিশ্ ছবির স্থান নেই কেন?—এ' প্রশ্ন এখানে ওঠা উচিত।

স্থান নেই, তার কারণ আছে। সব-কিছু চলচ্চিত্রোচিত গুণও যদি তার থাকে, তবু সেই গুণ সে আয়ত্ত করতে পারেনি, যে-গুণ হচ্ছে চলচ্চিত্রের প্রাণ, তার স্পিরিট্। সে গুণটি কি—তাকে ভাষায় সঠিক রূপে বোঝানো যায় না। তবে মোটের উপর বলা যায়, সেটি হচ্ছে "that 'just something' which makes the difference." এবং এই just something'-এর অভাবেই ব্রিটিশ চিত্র এখনো বিদগ্ধ সভায় স্থান পাবার যোগ্য হয়নি।

আর একটুক্ সোজা ক'রে বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয়, ব্রিটিশ্ চিত্রের অভাব সেই 'able handling'-এর, সেই অদ্ভূত প্রয়োগনৈপুণ্যের, যার চারু স্পর্শে দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী-সমাবেশে একখানি চিত্র প্রথম শ্রেণীর গৌরব-আসনে স্থান পেতে পারে। এবং আরো একটি জিনিষের অভাব আছে ব্রিটিশ্ চিত্রের কর্ম্মকর্ত্তাদের। সেটি হচ্ছে—তাদের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অভাব। বিলেতের মাটি থেকে সোনা আবিষ্কার করার গৌরব কে করতে পারে?—সে হচ্ছে আমেরিকা। সত্যি, বিলেতের মাটি অনেক সোনার মত দামী প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তাদের ভেতরকার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিকে যার স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে, সে বিলেত নয়, আমেরিকা। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক নমস্য শিল্পী চার্লি চ্যাপ্‌লিন্ জাতিতে ইংরাজ। কিন্তু স্বদেশে থাক্‌তে অনাহারে, অর্থাভাবে তিনি প্রায় মরতেই বসেছিলেন। আমেরিকাই তাঁকে আজ তাঁর স্বস্থানে বসিয়েছে। রোনাল্ড্ কোলম্যানকে আবিষ্কার করেছিল কে? এলিসা ল্যাণ্ডিকে আবিষ্কার করেছিল কে? এমনিতর অগণিত ইংরাজ শিল্পীর নাম করা যায়, হলিউডে আজ যাদের আসন সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু দেশে থাকতে হয়তো মাটির দামেও কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

Secrets-চিত্রে

মেরী পিক্‌ফোর্ড ও লেস্‌লি হাওয়ার্ড

সত্যি ক'রে ব্রিটিশ্ ছবির এখনো বড় বিলম্ব আছে আমেরিকান্ ছবির নাগাল ধরতে; এমন কি তা কোন দিন সম্ভব হবে কিনা, তাও জোর ক'রে বলতে পারি না। যতই তারা তারস্বরে চীৎকার করুক, বিলেতের কাগজওয়ালারা এবং চিত্রনির্ম্মাতারা সে-সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝেন। কেননা, 'আমি বড়ো, আমি বড়ো' ক'রে চেঁচিয়েই সত্যি কেউ কখনো বড় হ'তে পারেনা। এবং নিজের 'হামবড়ামি' নিজে নিজেই প্রচার ক'রে কেউ কখনো সত্যি সত্যি খুসী হয়না এবং এই অতৃপ্তির বাণী কোনো না কোন সময়ে তার ওষ্ঠ থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়বেই। সত্যি কথা বলতে গেলে, ব্রিটেন এখনো এত নীচে যে, এখনো সে আমেরিকাকে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারে নি। ছবির নামকরণে, (যেমন "Shanghai Express"এর মতো "Rome Express") চিত্রনাট্যের লিখনে, প্রয়োগকার্য্যের ধারায় এবং আরো বহু প্রকারেই এখনো অবধি আমেরিকাকে সে অন্ধের মত অনুসরণ ক'রে চলে। চলচ্চিত্রের প্রতি বিভাগেই এখনো অবধি সে আমেরিকাকেই আদর্শ ক'রে সামনে রেখে চলেছে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণা, আলোচনা, সৃষ্টিতত্ব—সব কিছু এখনো সে আমেরিকার তুলাদণ্ডে রেখেই করে। নকল জিনিষ কি কখনো সত্যিকারের আর্ট হয়?

সত্যিকারের যাঁরা ব্রিটিশ চিত্রের মঙ্গলকামী, তাঁরা এ' সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তার প্রকৃত মঙ্গল করা হবে তাকে যথেচ্ছা ও মিথ্যা প্রশ্রয় দিয়ে নয়, স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাবে তার সত্য ও পক্ষপাতহীন সমালোচনায়। নীচে আমি এমনি অনেক চিত্রপ্রিয়ের স্পষ্টোক্তি অবিকল উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। মনে রাখবেন এঁরা সবাই জাতিতে ইংরেজ।

*

জোসেফ এ্ রিচার্ড্‌স্ বলছেন:—"...সম্প্রতি আমি একখানা কাগজ প'ড়তে পড়তে রাগে সেখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। তার ভেতরে ছিল অসংযত ব্রিটিশ্ চিত্রের প্রচারকার্য্য। এ' ধরণের হাস্যকর প্রচারকার্য্য যে জনসাধারণকে কিরূপ অপমানিত ক'রে, তা' এরা বোঝেনা। এমনি ধরণের সব অর্থহীন নির্ব্বোধ উক্তি তারা কাগজে ছাপাবে:—

(১) ব্রিটিশ্ চিত্র নিঃসংশয়ে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (২) ব্রিটিশ্ আর্টিষ্ট্‌দের সঙ্গে অন্য কোন দেশীয় আর্টিষ্টের তুলনাই হয়না। (৩) আমেরিকান্ 'এ্যাকসেন্ট্' বমনোদ্রেক করে। (৪) বিদেশী পারিপার্শ্বিকের ভেতরে গৃহীত আমেরিকান ছবিগুলোও অতি-মাত্রায় 'americanised'। (৫) চার্লির চাইতে জ্যাক হালবার্ট নাকি বড় শিল্পী!—কবে এরা বুঝবে যে, ব্রিটিশ ছবির পক্ষে সর্ব্বোত্তম প্রচার-কার্য্য হচ্ছে সত্য সমালোচনা?"

"Picturegoer"-এর সম্পাদক বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন যে, "The constant reiteration of the story that British films lead the world & that Hollywood is already crumbling may be intensely flattering to our film Kings, but it leaves the fans cold. When the British film boom does come nobody will believe it. The only publicity that will do British industry any good will be a better standard of British films that patriotic writers can deal with on their own merits. Responsible critics will render better service by telling the truth than by rousing the resentment of the customers by proclaiming such obvious nonsense as that Hollywood is reeling before the might of us—or that Hulbert is greater than Chaplin."

*

T. H. Briant বল্‌চেন :—"আমেরিকান্ চিত্রের সেই মায়াময় মরীচিকাটি কি, ব্রিটিশ ছবির নাগাল্ থেকে যা কেবলই পালিয়ে বেড়ায়? আমেরিকার যে-কোন একখানি 'ভালো' ছবি বিলাতের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ছবিকে সহজেই পরাজিত ক'র্ত্তে পারে, এর কারণ কি? একি সেই 'that mysterious something', যা এক দিকে আছে এবং আর এক দিকে নেই?"

আর একজন বল্‌চেন :—"ব্রিটিশ-চিত্র-ব্যবসায় কবে জাগ্‌বে? উন্নতি সে করেছে সত্যি, কিন্তু আমেরিকান্ ছবির তুলনায় তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ এখনো ঢের নীচু। তার একটা প্রমাণ এই, হলিউড্ যে-সব 'তারকা'কে বাতিল ক'রে দেয়, আমরা তাদের সাহায্যই গ্রহণ করি। ব্রিটিশ ষ্টুডিও-তে বহু 'প্রতিভা'র সাক্ষাৎ মেলে। সে-প্রতিভাকে লালিত ও বৰ্দ্ধিত কর্ব্বার শক্তি আমাদের নেই।"

গায়্ ক্যাড্‌লি বলেন :—"ব্রিটিশ্ ছবির টেক্‌নিক্যাল বিভাগের উন্নতি দিয়ে তার মৌলিকত্বের অভাবকে ঢাকা যায় না। ব্রিটিশ্ ছবির অধিকাংশই ষ্টেজ্ প্রোডাকশনের হুবহু নকল। কৃত্রিম পটভূমিকা ও অবিশ্রান্ত ডায়ালোগ,—এই তাদের সম্বল! ব্রিটিশ্ ডিরেক্টাররা ভুলে যান যে, ষ্টেজ-এর চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক কোন জিনিষকে তাঁরা চালনা কর্‌ছেন।

পাঠকেরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন—আমার প্রবন্ধে আমি যে-সব কথা বলেছি, যে-সব যুক্তি দেখিয়েছি, উপরের প্রায় প্রতিটি উদ্ধৃত উক্তিই তাকে সমর্থন করে। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে থেকেও এঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য না হওয়ার কারণ—এঁদের প্রত্যেকেরই মত আমিও একজন 'disinterested' চিত্রামোদী। সত্যিই ব্রিটিশ্ ছবি যেদিন আমেরিকার সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলবার শক্তি অর্জ্জন করবে, সেদিন তাকে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে হবে না। মুগ্ধ বিশ্বজগৎ আপনিই তার রস-সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের কাছে মাথা নত করবে। মূর্খ প্রচার-কার্য্যে তাকে উপহাসাস্পদ করা হবে মাত্র! আমেরিকার অন্ধ পদাঙ্কসরণ থেকে বিরত হ'য়ে যেদিন সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে ফেলে ছবি তুল্‌তে শিখ্‌বে, সেইদিন থেকে আমরা তাকে আর্টের নিক্তিতে ফেলে বিচার ক'র্ত্তে সম্মত হব।

গান

(স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

বাঁশীর সুরে ডাক দিয়েছি
বাঁশীর সুরে ঐ—
প্রাণ যে টানে আর কেমনে
ঘরের মাঝে রই?
ও কার বাঁশী, ও কার বাঁশী?
কোন্ সুদূরের কোন্ উদাসী,
বাজায় সুরে কান্না-হাসি?—
আপন-হারা হই!

নাটকের রূপ

(শ্রীমণিলাল ব্রহ্ম)

নাট্য-রূপ বর্ণনায় নাটক ও উপন্যাসে কি পার্থক্য, তাহা দেখিতে হইবে প্রথমেই; কারণ, যদিও নাটকের সৃষ্টি উপন্যাসের বহু পূর্ব্বে, তাহা হইলেও এ দুটীর জন্ম একই মূল হইতে এবং আমরা যখন উপন্যাসকে নাট্যাকারে পরিণত করি, তখন তাহাদের অসামঞ্জস্যের কথা ভুলিয়া গিয়া মূলগত ঐক্যের দিকে নজর দি, ফলে নাটক পূর্ণ রূপ পাইতে পারে না—উপন্যাসের রূপ তাহাতে লাগিয়া থাকিয়া রসপিপাসুদের রসভঙ্গ করে। এখন, এই সাধারণ মূলটি কি? সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থলে মানবাত্মার ভিতর যে সহানুভূতি, ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, চিরন্তন ধারায় প্রেমের বন্যা আনিয়াছে, সেই অনুভূতি হইতেই বিশ্বসাহিত্যের জন্ম। ইহাই নানারূপে রং ধরাইয়া নাট্য, কাব্য ও উপন্যাসের আকারে রসের প্রস্রবন খুলিয়া দিয়াছে, মুগ্ধ জগৎ সুধার ধারায় ধন্য। নাটকের উৎপত্তি যদিও এই একই অনুভূতি হইতে, তাহা হইলেও ইহার সহিত উপন্যাসের প্রভেদ অনেক; ইহাকে সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত করাই চলে না। ইহাকে Stage ও technique-এর শাসন মানিয়া চলিতে হইবে—ইহা সাহিত্যের মত স্বাধীন নয়—পরাধীনতার কৃষ্ণতিলক নাটকের রাজটীকার সমান, জয়ের চিহ্ন। তাই ইহাকে Compound Art বলা হয় ইহার আর এক নাম Stage play। উপন্যাস কাহারও শাসন মানে না, নিজের গতিতে আপনি চলিয়া যায়; তাই, Marion Crawford ইহার নাম দিয়াছেন Pocket Theatre। ইহার ভিতর কেবল plot ও actor নাই, দৃশ্য, পোষাক প্রভৃতি stage-এর সমস্ত উপকরণই সুন্দরভাবে সজ্জিত আছে। যে-কোন রসজ্ঞ কালিকলমে ইহা সৃষ্টি করিতে পারেন, বাহিরের নিয়ম না মানিয়াই। এই জন্যই ঔপন্যাসিক নাট্যকারের চেয়ে স্বাধীন, তাই তাঁহার ছবি হয় বেশী নিখুঁত, নাটকত্ব এবং কাব্য উভয় দিক দিয়াই।

বাহিরের আইনের উপর এই নির্ভরতা নাটকের পরাধীনতার নিদর্শন। সৃষ্টির প্রথম হইতে পরিণতির শেষ পর্য্যন্ত এই পরাধীনতার প্রভাব বর্ত্তমান। উপন্যাস নিজেই সম্পূর্ণ—ইহার ভিতর আমরা পাই বিভিন্ন চরিত্রের পূর্ণ চিত্র, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর। ঔপন্যাসিক Subjectivityর সহায়তায় মনের মত প্রাণ খুলিয়া লিখিতে সক্ষম, এ বিষয়ে তিনি স্বাধীন। কিন্তু নাট্যকারের এ স্বাধীনতা নাই—তিনি Objectivityর উপাসক; নিজে চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিবেন না; এগুলি আপনা হইতে বড় হইবে, এমন কি দৃশ্যের কাব্যভরা বর্ণনাও তাঁহার চলিবে না তিনি কেবল সবার পিছনে থাকিয়া সমস্ত নাটকটির গতি নিয়ন্ত্রিত করিবেন। সুতরাং নাটকে পূর্ণতা পাইতে হইলে আমাদের কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। নাটকপাঠে রসোপলব্ধি হয় তখনই, যখন আমরা কল্পনায় চরিত্রগুলিকে নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়া পূর্ণ করিয়া দেখি, যেন আমরা সত্য সত্যই অভিনয় দেখিতেছি। "We have to supply for ourselves the external conditions from which it derives much of its life, and the whole machinery of actual performance."—Hudson. এই কল্পনার সাহায্য আমরা সাধারণতঃ লই না; তাই নাটককে আমরা সাহিত্য হিসাবেই পড়ি, অভিনয়ের দিক একেবারে বাদ দি; আমরা ভুলিয়া

নাই, নাটককে যথার্থ সাহিত্য বলা চলে না। নাটকের সৃষ্টি অভিনয়ের জন্যই, ইহার সহিত অভিনয়ের সম্পর্ক খুব নিকট; অভিনয়কে না মানিলে নাটকের পূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। Shakespeare পড়িতেছি—পাতার পর পাতায় কাব্যরস-ধারার সন্ধানে ফিরিতেছি; কিন্তু এ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না, যদি মনের বনে বাস্তবতার ছবি না ফুটিয়া উঠে। প্রসিদ্ধ American নট Edwin Booth "Othello"কে কিভাবে রূপ দিয়াছেন, যদি দেখি, তাহা হইলে সাধারণতঃ যে-ভাবে আমরা নাটক পড়ি, তাহাতে কতটা সৌন্দর্য্য আমরা হারাই, তাহা সহজে দেখিতে পারি। Ibsen-এর নাটকে চেহারা, হাবভাব, দৃশ্যাবলী এমন কি গলার স্বর কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে বিশদ উল্লেখ আছে। আধুনিক নাটকও এইরূপ type-এ তৈয়ারী করার চেষ্টা চলিতেছে—ইহাতে পাঠকদের কল্পনাশক্তির সাহায্য লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

এবার আমরা উপন্যাস ছাড়িয়া কেবল নাটকের দিকেই নজর দিব। নাটক লেখা যায় অনেক, কিন্তু অভিনয় করা যায় কম। প্রতি নিখুঁত নাটকের ভিতর চাই অভিনয়োপযোগী কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলির অভাব হইলে নাটক পাঠাগারে সাহিত্য হিসাবে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু মঞ্চের উপর সম্মান পায় না। যাহার সৃষ্টি মূলতঃ অভিনয়ের জন্যই, তাহা যদি অভিনয় না করা গেল, তবে তাহার মূল্য কোথায়? 19 th. Centuryর Melodramaয় না আছে কাব্য, না আছে লিপিচাতুর্য্য, এমন কি সুন্দর চরিত্রাঙ্কনও নাই, কিন্তু ইহারও ক্ষমতা ছিল, "...to produce an impression on an assembled multitude to rivet their attention and to excite their interest and sympathy—"Ibid। আবার Marloweর Tamburlaineকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্য বলা চলে, কিন্তু "থিয়েটারী ঢং" তাহাতে মোটেই নাই—এটি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের জীবন-বৃত্তান্ত মাত্র। এজন্য নাটক হিসাবে এর স্থান নীচে। নাটক অভিনয়োপযোগী হইলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, একই নাটক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। Shakespeare-এর "Othello" প্রথমে যেরূপ অভিনীত হইত, এখন সেরূপ হয় না। নাট্যকবি যদি আজও বাঁচিয়া থাকিতেন, তিনি অভিনয় দেখিয়া "Othello"কে চিনিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ? এই নাটকটি বার বার নূতন রূপে যুগের পর যুগ দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, পুরাতনের মলিনতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি নিয়তই সে নূতনত্বের শোভায় মণ্ডিত হইতেছে। আবার অনেক নাটক আছে যাহারা ক্ষণস্থায়ী—জন্মিবার কয়েক বৎসরের পরেই ইহাদের নিশ্চিত মৃত্যু, তবে যতদিন স্থিতি ততদিন গৌরবময়। নাটকের এই রূপবৈচিত্র্যে প্রকৃত রূপটির সন্ধান পাওয়া কঠিন।

GEORGE SIDNEY and CHARLIE MURRAY in "The COHENS AND KELLYS IN TROUBLE" UNIVERSAL PRODUCTION

পুরাতনকে নূতন জয় করিবে,—ইহা শাশ্বত ধর্ম। যাহা কিছু মলিন, যাহা কিছু শতাব্দীর ধ্বংসের লীলায় জীর্ণ, তাহাই নবরূপে জগৎকে মুগ্ধ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। তাই আদিম যুগ হইতে মানব-সভ্যতা কত ভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া বর্ত্তমানে আসিয়াছে। নাটকের এই নূতনত্ব সজীবতার নিদর্শন। তবে যে সব নাটক ক্ষণস্থায়ী, তাহাদের ক্ষণস্থায়িত্বের কারণ পরে দেখাইতেছি। এখন আমাদের বিবেচ্য, নাটক অভিনেতার না সাহিত্যিকের জন্য? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিনয়োপযোগী গুণ না থাকিলে নাটক সাহিত্যে যত বড়ই স্থান অধিকার করুক না কেন, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে না। তাহা হইলে কি কেবল অভিনয়ই সব, সাহিত্যের কোন স্থান নাই? দুইটী ভিন্ন মতের আলোচনা এখানে করি। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার Moliere বলেন, "Speaking generally I would place considerable reliance on the applause of the pit, because amongst those who go there, many are capable of judging the piece according to rule, whilst others judge it as they ought, allowing themselves to be guided by circumstances, having neither a blind prejudice nor an affected complaisance nor a ridiculous refinement." এখানে অভিনয়-সাফল্যই নাটকের perfection-এর প্রমাণ—সাহিত্যের দিক দিয়া কিছুই যেন দেখিবার নাই। আবার Alaxandre Dumas, Scribeকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "...he sought merely to write for the theatre ; he had no wish to instruct, to moralise, or to correct people ; he wanted simply to give them amusement."—এখানে অভিনয় যেন কিছুই নয়, সাহিত্যই হইতেছে সব কিছু। কিন্তু এ-দুটো মতই সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অভিনয়ের জন্যই যখন নাটক, তখন অভিনয়ের স্থান প্রথম। "প্রফুল্ল", "চন্দ্রগুপ্ত" প্রথমতঃ এইজন্যই নাটক হিসাবে শ্রেষ্ঠ; তাই এরা যত মন্দভাবেই অভিনীত হোক না কেন, এদের চরিত্রাঙ্কন, ঘটনার পরিণতি,—এ-সমস্তই আমাদের তৃপ্তি দিবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন নাটক পূর্ব্বে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, অথচ এখন তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? নাটক যখন সাহিত্যের দিকে না তাকাইয়া কেবল অভিনয় লইয়াই ব্যস্ত, তখন ঐ ব্যস্ততায় সে তাহার আয়ুর হার কমাইয়া ফেলে;—সাহিত্যে সে যতই রিক্ত, দীর্ঘজীবনে সে ততই বঞ্চিত। তাই কেবল অভিনয়েরই দিকে নজর দিলে চলিবে না, সাহিত্যেরও যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা মানিতে হইবে—ইহা নাটককে দীর্ঘায়ু করে। যে নাটক সাহিত্যসম্পদ হিসাবে বড়, সে চিরকালের—তাহার মরণ নাই। "প্রফুল্ল", "চন্দ্রগুপ্ত" সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান—তাই তাদের জীবন অনন্তকাল। দক্ষ নাট্যকার প্রথমে plot ঠিক করিয়া এমনভাবে দৃশ্যগুলি সাজান যে, দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়, তারপর তিনি চরিত্রগুলি আপন মনে সুন্দর করিয়া লিখিয়া যান, যেন তিনি সত্যই মঞ্চের উপর প্রতি ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন, ঠিক একজন ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় অভিনেতার মত—যাহারা কোনও নাটক না পড়িয়া নিজেরাই আপন emotion-মত part বলিতেন। তবে লেখার সময় নাট্যকারকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়, যেন তিনি না ধরা পড়েন। নাটকে তাঁহার সত্তা নাই, তিনি বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্নরূপে

বিরাজিত।—এইরূপে লিখিলে নাটকে অভিনয়োপযোগী গুণ তো থাকিল-ই, আবার রচনার সৌন্দর্য্যে নাটকের অমরত্ব লাভ হইল। "...a dramatic poetry must always be regarded from a double point of view —how far it is poetical and how far it is theatrical"— Schlegel.

রঙ্গালয় ও দর্শক

(শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী)

একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অগণিত লোককে নির্দ্দোষ আনন্দ সরবরাহ ক'রবার ভার নিয়ে এই সহরের সাধারণ রঙ্গালয় কয়টী নিজেদের স্কন্ধে এমন একটী গুরু দায়িত্ব চাপিয়েছেন—যা যথাযথ বহণ ক'রবার মত শক্তি তাঁদের সকলের সমানভাবে সকল সময়ে থাকে না। এবং যখন যে-রঙ্গালয় এই দায়িত্ব বহনে যতখানি অপারগ হন, অর্থাগমের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তও হন তাঁরা তখন ঠিক সেই অনুপাতেই। তখন কাজে কাজেই যুগপৎ দুই দিক দিয়ে তাঁরা কাহিল হ'য়ে পড়েন—রসগ্রাহী দর্শক-সাধারণের অপ্রীতিসূচক সমালোচনার আঘাতে এবং টিকিটঘরের দৈন্যের দরুণ লক্ষ পাওনাদারের ভ্রূকুটী শাসনে! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দর্শক-সমাজের কাছে নিজেদের দায়িত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে রঙ্গালয়-পরিচালকেরা সময়ে সময়ে অতি অদ্ভুত অজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাঁদের সম্মুখে এমন সব উপকরণ পরিবেশন ক'রে, যা তাঁদের রুচিকে আদৌ পরিতৃপ্ত করে না।

অভিনয়ের দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করাই যখন পরিচালকদের উদ্দেশ্য এবং সে অর্থ প্রত্যাশা করেন যখন তাঁরা দর্শকদের কাছেই, তখন এটা আশা করা খুবই স্বাভাবিক যে, দর্শকদের সর্ব্বথা পরিতোষ যাতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ সে-দিকে অবহিত হবেন। সুনির্ব্বাচিত নাটকের সুষ্ঠু অভিনয়, সময়ানুবর্ত্তিতা, রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বাঙ্গীন শ্লীলতা রক্ষা এবং প্রেক্ষাগৃহে আসনাদির সুব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধায়কদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার—এইগুলিই দর্শকদের প্রার্থনীয় রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।

নাটকের নির্ব্বাচন একটা দুরূহ ব্যাপার এবং অনেক সময়েই অনেক বিশেষজ্ঞ (?) কর্ত্তা-ব্যক্তির মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, কোন্ নাটক লোককে তৃপ্তি দেবে এবং কোন্ নাটক দেবে না—তা আগে হ'তে বলা অসম্ভব। কিন্তু এর উত্তরে ব'লতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্ নাটক তৃপ্তি দেবে, এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হ'লেও কোন্ নাটক তৃপ্তি দেবে না, তা আগে থেকে নিশ্চয়ই বলা যায়। অনেক সুলিখিত নাটকও কোন কারণে হয়ত দর্শকের তৃপ্তি বিধানে কখনও কখনও অক্ষম হ'তে পারে, কিন্তু কু-লিখিত নাটক যে-কোন ক্ষেত্রেই যে রস-পিপাসুকে তৃপ্তি দেবে না—এটা কর্ত্তৃপক্ষের না বোঝা অন্যায়। কাজেই সুলিখিত নাটকের অসাফল্যের দরুণ অর্থহানি-জনিত মনস্তাপের সঙ্গে লোকের বিদ্রূপবাণ কর্ত্তৃপক্ষকে ততখানি সইতে হয় না, যতটা হয় কু-নাটকের অসাফল্যের ক্ষেত্রে। এইজন্যই নাটকত্বহীন মহানাটককে অমিত্রাক্ষরের জোরালো আবৃত্তির দ্বারাই জমিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা ক'রে সুধাবতার নটেরাও হাস্যাস্পদ হ'য়ে ওঠেন এবং ব্যভিচারিণীর কাহিনীকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত ক'রলে দর্শক সে-কল্পিত গৌরবের সম্মুখে নতশির হ'তে রাজী হয় না।

সব দেশেরই লোকের আহার-বিহারের একটা স্বতন্ত্র রীতি ও ধরণ আছে, এ কথাটা যদি রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনে না রাখেন, তবে তাঁদের ব্যবসা-বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। অবশ্য সব দেশেই আবার উদারপন্থী দু'চারজন থাকে—যারা শাস্ত্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক সব রকম অনুশাসনকেই অকুতোভয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও যেমন মুষ্টিমেয়, তাদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর ক'রে ব্যবসা পরিচালনা ক'র্ত্তে গেলে তার ফলও হয় তেমনি শোচনীয়।

সুনির্ব্বাচিত নাটকও অনেক সময়ে দর্শকের তৃপ্তি-সম্পাদনে অক্ষম হয়—অভিনয়ের দোষে। এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে একখানি নাটককে অভিনয় ক'রতে হ'লে যে জিনিষটা সব চেয়ে বেশী দরকার—সেই জিনিষটারই অভাব আমাদের অনেক রঙ্গালয়ে অতি নিদারুণ।—সেটা হ'চ্ছে রিহার্সেল বা মহলা!

নূতন নাটকের মহলা সুরু হবার আগেই প্রথম অভিনয়ের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে যায়, এমন ঘটনা বিরল নয়—একথা বাইরের লোকের কাছে বিস্ময়জনক ব'লে বোধ হ'তে পারে হয়ত। কিন্তু "রথের দিন বই খুলতে হবে—অতএব তোমরা সকলে প্রস্তুত হইতে থাকহ!"—এরূপ আদেশ মালিকের নিকট রথের এক সপ্তাহ আগে পেলে কোন নট-নটী সেটাকে তত

বেশী বিস্ময়জনক বা আপত্তিকর ব'লে মনে করেন না। ফলে রথের দিন বই খোলা হয়। নট-নটীদের একবর্ণও মুখস্থ হয় না, চীৎকার ক'রে ক'রে প্রম্প্‌টারদের গলা ভেঙে যায়, দৃশ্যপটের ভিজে রংয়ের আড়াল থেকে পুরোনো-দিনের অলুপ্ত ছবি উঁকি দেয়, কচিৎ বা চলন্ত মঞ্চ অর্দ্ধপথেই ক্লান্ত হ'য়ে থেমে গিয়ে দুটী বিভিন্ন দৃশ্যের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক প্রদর্শন ক'রে প্রেক্ষাগৃহের আনন্দবর্দ্ধন করে! অনেক কিছুই হাস্যকর ব্যাপার ঘটে হয়ত, কিন্তু স্বত্বাধিকারীর আদেশ পালিত হয়—বই খোলা হয়,—রথের দিনেই!

দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন এমন আর কিছুতেই করে না—যেমন করে সময়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য। পাঁচটার সময়ে বিজ্ঞাপিত অভিনয় সুরু হয় ছ'টায়; সাড়ে সাতটায় যদি অভিনয় আরম্ভ হবার কথা, দর্শকেরা থিয়েটারে এসে পৌঁছোয় হয়ত পৌনে আটটায়। আর একদিনে দু'খানি নাটকের অভিনয় যেদিন হবে—সেদিন ত কথাই নাই। একখানি নাটক শেষ হবার পর আর একখানি আরম্ভ হ'ল হয়ত পূর্ণ দেড় ঘণ্টা পরে। এই দেড় ঘণ্টাকাল দর্শকদের যে কি ভাবে কাটে,তা সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করেন না কর্তৃপক্ষ!—প্রথম পনের মিনিট কাটে তাঁদের পান সিগারেট চা খেতে, দ্বিতীয় পনের মিনিট কাটে আসনে ব'সে ধৈর্য্যধারণের বৃথা চেষ্টায়, তৃতীয় পনের মিনিট কাটে বাইরের বারান্দায় অস্থির পাদচারণায় বা দুই চারিজন একত্র হ'য়ে রঙ্গালয়-পরিচালকদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশে! চতুর্থ পনের মিনিটে প্রেক্ষাগৃহে হাততালি ও নানাপ্রকার অ-মানুষিক আওয়াজের পর পঞ্চম পনের মিনিটে অর্দ্ধেক দর্শক ছোটেন টিকিটঘরে ও বাকী অর্দ্ধেক ছুটবার চেষ্টা করেন ম্যানেজারের ঘরে কৈফিয়ৎ তলব করবার জন্যে! টিকিটঘর হয়ত তখন বন্ধ হ'য়ে গেছে এবং ম্যানেজার তখন গ্রীনরুমের সুরক্ষিত ব্যূহের মধ্যে ব'সে দাড়ি-রচনায় ব্যস্ত; সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ দর্শকেরা ষষ্ঠ পনের মিনিট কাল নিজ নিজ আসনে কূর্ম্মভাব অবলম্বন ক'রে নিদ্রার চেষ্টা করেন! অবশেষে এক সময়ে সত্য সত্যই যবনিকা ওঠে এবং নটগণের বক্তৃতা ও নটীগণের নৃত্য সদম্ভে ঘোষণা করে যে, দর্শকেরা নিদ্রালু হ'লেও যে-অভিনয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে, সে-অভিনয় হবেই এবং হচ্ছে!

INTERNATIONAL HOUSE

রঙ্গালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দর্শকদের মন থেকে লোপ পায় অনেক সময়ে নটনটীগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপত্তি সাধারণতঃ হয় অভিনেতা কর্ত্তৃক সুরার অতিরিক্ত সেবায় এবং মত্ত অভিনেতাকে অভিনয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রবার মত মনের জোর কর্তৃপক্ষের না থাকায়।

আর এক প্রকার অনিয়ম অভিনেতাদের দ্বারা অনেক সময়েই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে—যাকে উচ্ছৃঙ্খলতা না ব'লে বিশৃঙ্খলতা ব'ললেই ঠিক হয়! প্রায়ই দেখা যায়, যে ভূমিকায় যাঁর নামবার কথা তাতে তিনি নামেন নি, নেমেছে আর একজন, যার সে ভূমিকা তেমন দুরস্ত নেই! এ রকম বিশৃঙ্খলা কোন খ্যাতনামা অভিনেতার ক্ষেত্রে হ'লেই অবশ্য দর্শকেরা আপত্তি করেন; ছোটখাট অভিনেতাদের মধ্যে রামের জায়গায় শ্যাম এলে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিন্তু কি বড়, কি ছোট—অভিনেতার তরফ থেকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকা উচিত, যাতে এ রকম গাফিলি না হয়। তাতে ক'রে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অনিবার্য্য কারণে কোন অভিনেতার কোন বিজ্ঞাপিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব হ'লে সময় থাকতে দর্শকদের তা জা'নতে দেওয়া উচিত।

দর্শকদের যথাযোগ্য আসন যথাসম্ভব সু-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক অবস্থায় রক্ষা করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আসন ভাঙা হ'লে বা ছারপোকা-বহুল হ'লে বা আসনে ব'সে পাখার হাওয়া পাওয়া সম্ভব না হ'লে দর্শকের মনে বিরক্তি জাগা অনিবার্য্য। তার উপর সে সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ থাকলে অভিযোগ ক'রেও যদি তত্ত্বাবধায়কদের কাছে প্রতিবিধান বা অন্ততঃ সহানুভূতি না পাওয়া যায়,তবে দর্শক ত নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে অভিশাপ দেবেন-ই যে, কেন ম'রতে তিনি সে-থিয়েটারে এসেছিলেন! তত্ত্বাবধায়কেরা যদি টিকিট পরীক্ষা ক'রেই কর্ত্তব্য শেষ করেন এবং "আট আনার সিটে ছারপোকা হ'য়েই থাকে মশায়!" ব'লে দর্শককে আপ্যায়িত করেন, তবে বলতে হবে যে, রঙ্গালয়ের দুরবস্থার বহু কারণের মধ্যে তাঁর অসৌজন্যও একতম কারণ! এবং এই ধরণের বহু কারণ এক জায়গায় জড়ো হ'য়েই আমাদের রঙ্গালয়ে 'অভিমন্যু-বধে'র পালা সুরু ক'রে দিয়েছে।
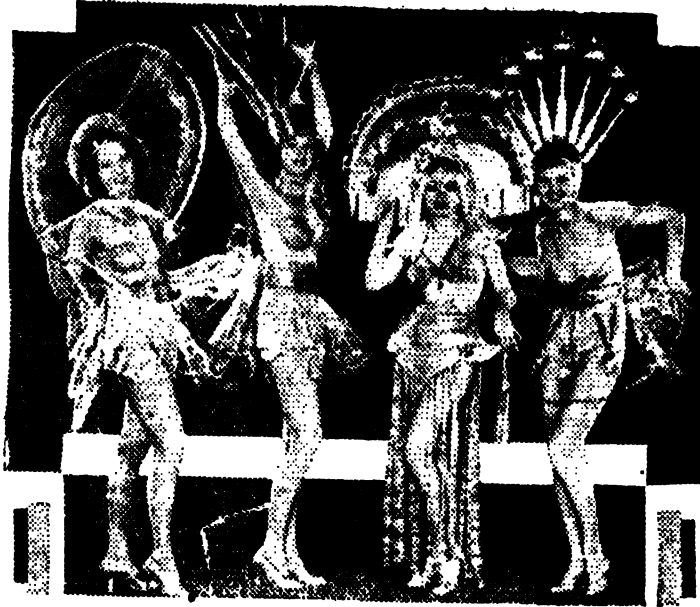
প্রাচীন ভারতে অভিনয়

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ এম্, এ)

প্রাচীন ভারতবর্ষে নাট্যকলার আদর্শ কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতসমাজের অজ্ঞাত না থাকিলেও সাধারণে তাহার বিশেষ একটা খোঁজ রাখেন না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিষয়ে বলিবার এত কথা আছে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে বলিলেও তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। সেইজন্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের নাট্যসাহিত্যের মাত্র গোড়ার কথা লইয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন। এই সব গোলমেলে মতবাদের ভিতর প্রথমে প্রবেশ না করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তির যে উপাখ্যানটি দেওয়া হইয়াছে, তাহারই কথা বলা যাউক্।

সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের যে সন্ধিকাল, তাহা অতীত হইবার পর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসমাজে অধর্ম্মের সঞ্চার হইতে থাকে। এই অধর্ম্মের প্রভাবে মানব দুঃখভোগ করিতেছে দেখিয়া দেবগণ সহানুভূতির বশে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার দিনে শূদ্রজাতিগুলির বেদপাঠে কোন অধিকার ছিল না। অথচ বেদজ্ঞান না থাকিলে ধর্ম্মশিক্ষালাভও হইতে পারে না। কারণ, বেদই হইতেছে ধর্ম্মজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। এরূপ অবস্থায় শূদ্রজাতিগুলি যাহাতে বেদপাঠ না করিয়াও বেদোক্ত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা পিতামহকে ধরিয়া পড়িলেন—"হে পিতামহ! আপনি এমন একটি শাস্ত্রের সৃষ্টি করুন, যাহা পড়িবার অধিকার সকল জাতিরই থাকে"। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া নাট্যবেদ রচনা করিলেন। এই নাট্যবেদকে সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে। চারিটি বেদেরই সারাংশ ইহার মধ্যে আছে। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্যাংশ (কথোপকথন—dialogue), সামবেদ হইতে গান, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়, আর অথর্ব্ববেদ হইতে রস লইয়া ব্রহ্মা এই পঞ্চম নাট্যবেদের সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

নাট্যবেদ রচনার পর ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের কথামত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টি ত আমি করিলাম। এখন তুমি ইহা আমার নিকট শিখিয়া দেবগণকে শিক্ষা দাও। পরে দেবগণের সাহায্যে ক্রমশঃ ইহা নরলোকে প্রচার কর"।

ইন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন—"পিতামহ! দেবতারা চিরদিনই সুখভোগে অভ্যস্ত। অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ অভিনয় শিক্ষা করা তাঁহাদের সাধ্য নহে। কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয়, বেদজ্ঞ ঋষিগণই নাট্যবেদশিক্ষার উপযুক্ত পাত্র"।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে প্রথম নাট্যবেদ শিক্ষা দিলেন। যথাবিধি নাট্যশিক্ষার পর ভরতমুনি একটি অভিনয়ের দল খুলিলেন। ভরতের নিজের একশত পুত্র ছিলেন; উঁহারাই হইলেন নট বা অভিনেতা। আর ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি অপ্সরারা হইলেন ঐ দলের অভিনেত্রী। সশিষ্য স্বাতি নামক ঋষি, নারদ ও গন্ধর্ব্বগণের উপর বাদ্যের ভার পড়িল। এইরূপে ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতের আদি অভিনয়-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল।

ইহার পর ভরত একদিন পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সদলবলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"দেব! অভিনয়ের আয়োজন সমস্তই করিয়াছি। এখন আপনি কেবল উহার স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিন"। ব্রহ্মা বলিলেন, "বেশ ত, দেবগণ 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, আপনি সেই উপলক্ষে নাট্যাভিনয় করিয়া দর্শকদিগকে আনন্দদান করুন"।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দেবগণ অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে ইন্দ্রই ছিলেন প্রধান নেতা। ইন্দ্র কর্ত্তৃক অসুরবিজয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেবগণ মিলিত হইয়া স্বর্গে 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন।

ধ্বজমহোৎসব প্রবৃত্ত হইলে পর জগতের যত দেব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অধিবাসী সেই অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর ভরতের নাট্যসম্প্রদায় অভিনয় আরম্ভ করিলেন। সে অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল, দেবতাদিগের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ। অভিনয়ের সংবাদ পাইয়া নূতন কিছু একটা দেখিবার আশায় অসুরেরাও সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, অভিনয়ে কেবল অসুরদিগের পরাজয়ই দেখান হইতেছে, তখন তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বিঘ্নগণের সহিত পরামর্শ করিল, "এরূপ ধরণের অভিনয় আমরা পছন্দ করি না; কারণ ইহাতে শুধু আমাদের অপমানও পরাজয়ের ব্যাপারই দেখান হইতেছে। অতএব, আইস, যাহাতে আমাদের গ্লানিকর এই অভিনয় আর বেশীদূর না গড়াইতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করি"। এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া অসুর ও বিঘ্নগণ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া গেল। অদৃশ্য থাকিয়াই তাহারা রঙ্গমঞ্চের উপরস্থিত নটনটীদিগের বাক্য ও শারীরিক ক্রিয়া সকলই স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। হঠাৎ অভিনেতৃবর্গকে এইরূপে সম্মোহিত ও

বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভাবিলেন—“এ কি! অভিনয়ে হঠাৎ এরূপ বিঘ্ন হইল কেন”? প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য তিনি যোগবল আশ্রয় করিলেন। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন যে, অসুর ও বিঘ্নগণ অদৃশ্য থাকিয়া রঙ্গপীঠ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে; আর নটনটীগণ সকলেই তাহাদের মায়ায় জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ইন্দ্র সহসা তাঁহার বিজয়ধ্বজটি তুলিয়া লইলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ধ্বজের আঘাতে ইন্দ্র অসুর ও বিঘ্নদিগের শরীর একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন। অসুরেরা ধ্বজপ্রহারে জর্জরিত দেহ হইয়াছিল বলিয়া সেই সময় হইতে ইন্দ্রধ্বজের নূতন নাম হইল ‘জর্জর’। আর দেবতারা সেইদিন হইতে নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে একটি করিয়া জর্জর স্থাপন করিতে হইবে; তাহা হইলে আর রঙ্গবিঘ্ন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপে প্রাচীন ভারতে ‘জর্জর’ বা ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন (রঙ্গালয়ের রক্ষক হিসাবে) অভিনয়ের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।

বিঘ্ন ও অসুরগণ এইরূপে পরাজিত হইবার পর দেবলোকের প্রথম অভিনয় আবার বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিঘ্ন ও অসুরগণও সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে অদৃশ্যভাবে আসিয়া নটনটীদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। সেবার অভিনয় সমাপ্ত হইবার পর ভরতের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া একটি সুদৃঢ় নাট্যাগার নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে একটি সুলক্ষণযুক্ত দুর্ভেদ্য প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ারী হইল। তখন ব্রহ্মা এক একজন দেবতার উপর নাট্যগৃহের এক এক অংশ রক্ষার ভার দিলেন। নাট্যমণ্ডপ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন চন্দ্র। রঙ্গবেদিকার রক্ষক হইলেন অগ্নি। নায়কের রক্ষার ভার লইলেন ইন্দ্র স্বয়ং। আর নায়িকার রক্ষার ভার পড়িল সরস্বতীর উপর। এইরূপে এক একজন দেবতা নাট্যগৃহের এক একটি অংশ রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সাজিলেন। তাহার পর আর দেবলোকে কখনও রঙ্গবিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

Samarang-চিত্রের একটি দৃশ্য

যে জর্জর বা ইন্দ্রধ্বজের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। জর্জরটি ছিল প্রথমে ইন্দ্রের ধ্বজদণ্ড। পরে উহা হইয়া দাঁড়াইল, রঙ্গালয়ের রক্ষক। উহার মাথার উপর ইন্দ্রের বজ্র বসান থাকিত। জর্জরের পাঁচটি পর্ব্ব। প্রথম পর্ব্বের অধিষ্ঠাতা দেব ছিলেন স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা। তাহার নিম্ন পর্ব্বে শঙ্কর। তৃতীয় পর্ব্বে বিষ্ণু। চতুর্থে স্কন্দ। আর পঞ্চম বা সর্ব্বনিম্ন পর্ব্বে অধিষ্ঠান করিতেন—শেষ, বাসুকি ও তক্ষক—এই তিন মহানাগ। প্রথম পর্ব্বটি শ্বেত বস্ত্রে, দ্বিতীয়টি নীল বস্ত্রে, তৃতীয়টি পীত বস্ত্রে, চতুর্থটি রক্ত বস্ত্রে ও পঞ্চম পর্ব্বটি বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রে মোড়া থাকিত। গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও নৈবেদ্য দিয়া জর্জরের পূজা, স্তব, হোম করিতে হইত। পরে প্রদীপ্ত উল্কার সাহায্যে জর্জরের আরতি করিবার প্রথা ছিল। ঐ সময় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকিতেন। শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্য বাজিত। পূজা, হোম, আরতি প্রভৃতি নাট্যাচার্য্য করিতেন। তাহার পর প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হইত।

জর্জর দণ্ড সাধারণতঃ কোন ছোট গাছ বা বংশদণ্ড কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বেণুদণ্ড নির্ম্মিত জর্জরই প্রশস্ত। জর্জর দৈর্ঘ্যে ১০৮ আঙ্গুল হইত। উহাতে পাঁচটি পাব ও চারিটি গাঁট থাকিত। গাঁটগুলি যাহাতে বেশী সরু-মোটা না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। জর্জর দণ্ডটি সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। বাঁকা, পোকা বা ঘুণধরা, ডাল-পালাওয়ালা বা মাপে ছোট বাঁশ বা চারাগাছ হইতে জর্জর তৈয়ারী করার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শিল্পী জর্জর নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত হইতে হইত। রুগ্ন, কুরূপ বা বিকলাঙ্গ শিল্পীকে দিয়া জর্জর নির্ম্মাণের নিষেধ আছে। বিশেষ পুণ্যদিনে, শুভমুহূর্ত্তে, পবিত্র স্থানে উৎপন্ন বংশদণ্ড হইতে সুলক্ষণ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত জর্জর স্থাপন করিলে নাট্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ইহার বিপরীতে অশুভ ফলই ফলিয়া থাকে—ইহাই ভরতমুনির অভিপ্রায়। এই জর্জরের পূজাবিধি এ দেশের অভিনয় হইতে বহুদিনই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মনে হয়, বাংলার নব রঙ্গমঞ্চে এই জর্জর পূজার পুনরায় প্রবর্ত্তন করিলে শুধু একটা নূতনত্বই হইবে না, অনেক শুভ ফলও ফলিতে পারে।

দেবলোকে যে রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে ভরতের নাট্য-সম্প্রদায় বহু নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কোন অভিনয়ে কোনরূপ গোলমাল উপস্থিত হয় নাই। ব্রহ্মা অসুরদিগকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন—“দেখ, তোমরা অনর্থক ক্রোধ করিতেছ কেন? কেবল তোমাদের সম্মানহানির উদ্দেশ্যেই নাট্যবেদের সৃষ্টি হয় নাই। ত্রিভুবনে যেখানে যেরূপ ঘটনা ঘটে, তাহার যথাযথ অনুকরণের নামই নাট্য। অতএব, তোমরা দেবতাদিগের সহিত বিবাদ আপোষে মিটাইয়া ফেল।”

দেবলোকে দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় দেবাসুর সকলেই একত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। বিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে রঙ্গদেবতা ও জর্জরপূজার পর পিতামহ রচিত “অমৃতমন্থন” নামক ‘সমবকার’ অভিনীত হইয়াছিল। সে অভিনয় এতই স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, দেব ও অসুরগণ পূর্ব্বের বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একত্রে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দেবাধিদেব মহাদেবকে প্রীত করিবার জন্য ব্রহ্মা ও দেবগণ মিলিয়া হিমাচলে “অমৃতমন্থন” সমবকারের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের আয়োজন করেন। ঐ সঙ্গে “ত্রিপুরদাহ” নামে একখানি ‘ডিম’ও অভিনীত

হইয়াছিল *। এই 'ত্রিপুরদাহ'ও পিতামহের রচনা। মহাদেব অভিনয়-দর্শনে পরম প্রীত হইয়া বলেন—"পিতামহ! তোমার সৃষ্ট নাট্যাভিনয় দর্শনে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যে নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও এই অভিনয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি"। এই বলিয়া তিনি তণ্ডু (অর্থাৎ নন্দীকে) ডাকিয়া নৃত্য দেখাইতে বলিলেন। তণ্ডুর নিকট ভরত নৃত্যশিক্ষা করিয়া নাট্যাভিনয়ের অঙ্গরূপে নৃত্য যোগ করিয়া দিলেন। তণ্ডু প্রথম এই নৃত্যের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া নটরাজের আবিষ্কৃত নৃত্যের নাম হইল 'তাণ্ডব' নৃত্য। পরে ইহাতে গৌরী দেবীর আবিষ্কৃত "লাস্য" নৃত্যও সংযোজিত হইয়াছিল। এইরূপে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংযোগে দেবলোকের অভিনয় ক্রমশঃ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

* সমবকার ও ডিম দৃশ্যকাব্য বিশেষ। ইহাদের লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রের ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১০ই সেপ্টেম্বর বেতার-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

সঙ্গীত ও নাটক

(শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র)

আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, সত্যকারের যা নাটক, তাতে গান থাকা মহাপাপ। এবং শুনেছি, গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত এই ধারণাবশে গান বাদ দিয়ে নাটক লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গান বাদ দেওয়া দূরে থাক, কমালেই দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে দেখে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে ও-আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সে জন্য তাঁর মনে যথেষ্ট দুঃখই ছিল।...ভরসার কথা এই যে, সে ধারণা এখন আমাদের কমছে।

ঠিক জানিনা, শুনেছি ওটা বিলিতি হাওয়া। বিলিতি মত যাই হোক—আমাদের দেশ যাত্রার দেশ, এখানে নাটকের সঙ্গে গান ও সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে নাটক থেকে গান বাদ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বাঙলাদেশ গানের দেশ। কবির ভাষায়—

"কি যাদু বাঙলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা—"

এখানে নাট্যরসের প্রথম আস্বাদ পেয়েছে লোকে পালাগানে—যাত্রায়, যার সার্থকতা অর্দ্ধেকেরও বেশী নির্ভর করে তার গানের উপর। আজকাল থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির কল্যাণে পেশাদারী যাত্রা থেকে জুড়ির গান উঠতে আরম্ভ করেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টাকার আমদানীও কমতে সুরু করেছে, এটাও সত্য কথা। তাঁরা বলেন যে, জুড়ির গান নাকি দর্শক-সাধারণ ভালবাসে না। একথা আমরা বিশ্বাস করিনা; তাঁরা ভাল লাগাতে পারলেই দর্শকদের ভাল লাগে। যে জুড়ির সুরবোধ নেই, যে জুড়ির গলা মেলে না, যে গানের সুর কাণে মিষ্টি লাগে না, সে গান শুনতে কার ভাল লাগবে? যে সব সৌখীন দল ভাল ক'রে জুড়ির গান তৈরী করেন, তাঁদের গান এখনও লোকে শোনে এবং শুনে সাধুবাদ দেয়। কোরাস্ গানের appeal অনেক সময় solo গানের চেয়ে বেশী হয়, একথা এখনও যাঁরা ঠাকুর-বাড়ীর পালাগান কিংবা গাজোৎসব শুনতে যান, তাঁরা ভাল ক'রেই জানেন।

নাটকের জনপ্রিয়তা গানের ওপর কতটা নির্ভর করে, তা ছোট্ট একটা উদাহরণ থেকে খানিকটা বোঝা যাবে। যে নাটক জনপ্রিয় হয়, তার গানগুলোই প্রথমে হাটে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। 'সীতা'র সময় বেশ মনে আছে, 'অন্ধকারের অন্তরেতে' আর 'মঙ্গল মঞ্জরী' পথে বাজারে শুনতে শুনতে কাণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চণ্ডীদাসের 'ফিরে চল ফিরে চল, আপন ঘরে' শুনলে এখন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে—তপতীর 'জটার বাঁধন পড়ল খুলে' গানটীর কথা মনে পড়তেই চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতার রাজপথে গত বৎসরে দেখা একটি দৃশ্য—একটী সাত বৎসরের উলঙ্গ শিশু হাতে একটী বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ঐ গান গাইতে গাইতে চলেছে। সাজাহান চন্দ্রগুপ্তের গান আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

জনার গীতিবহুলতার জন্য অনেকে গিরিশচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়েছিলেন! আজও যাত্রার দলের বই ব'লে ওর অপবাদ আছে। সেই ধিক্কারে গিরিশচন্দ্র মায়াবসান ও কালাপাহাড় লিখলেন; কিন্তু জনা আজও অমর হয়ে আছে—মায়াবসান বা কালাপাহাড়ের নাম এখন কোন থিয়েটারওয়ালাও করেন না। জনা যখন খোলা হয়, জনার গানগুলি, বিশেষ ক'রে কোরাস্ গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। জনা হয়ত খাঁটী নাটকের পর্য্যায়ে আসবে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকখানা নাটক সে পর্য্যায়ে আসে, তা'তে প্রচুর গান আছে এবং সেজন্য তাদের নাটকত্বের মর্য্যাদার হানি হয়নি বিন্দুমাত্র।

গান অনেক সময়ে নাটকের অর্থ বুঝিয়ে দেয়, তা[illegible]কে [illegible] ক'রে তোলে, দর্শকদের মনকে নাটকের বা নাটকের অং[illegible]শের ভাবগ্রহণে সাহায্য করে। 'গৃহ প্রবেশ' নাটকের অর্থ বুঝ[illegible] পারেন না যাঁরা, তাঁরা গানগুলি প'ড়ে গেলে বা শুনলে অনেকখানি আ[illegible]কিত হবেন। অনেক সময়ে এমন হয় যে, উপরোউপরি দুটা বা তিনটা করুণ দৃশ্য পর পর এসে পড়ার দরুণ দর্শকদের নাড়ু এত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, তখন ভাল ঘটনা বা অভিনয় মনে কোনও ছাপ দিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ষোড়শীর কথা বলা যেতে পারে,—ষোড়শীর মধ্যে যে গাজনের দৃশ্যটী আছে, সেই দৃশ্যের গান দু'খানি না থাকলে পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলি কিছুতেই দর্শকদের চিত্তে অতখানি ছাপ দিতে পারত না। বিদায়-দৃশ্যে মন্দিরের মধ্যে ভিক্ষুকের গানখানি জীবানন্দের অভিনয়কে কতখানি গাঢ় ক'রে তোলে, তা যারা ষোড়শী দেখেছেন, তাঁরা ভাল রকমই জানেন। 'গৃহ প্রবেশে' 'মরণের সাগর পারে' গানটী নাটকের ট্রাজেডিকে গাঢ়তর ক'রে তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে করুণ রস উপলব্ধি করতে দর্শককে সাহায্য করে—এক সঙ্গে দুটো বড় কাজ সম্পন্ন হয়।

অনেক সময়ে নাটকের বাইরে গানের ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন এম্পায়ারে বিসর্জন অভিনয় করেছিলেন, তখন এই ব্যবস্থা করেছিলেন। পাত্রপাত্রীর মুখে গান না দিয়ে প্রতি দৃশ্যের প্রথমে সেই দৃশ্যের পূর্ব্বাভাস দিয়েছিলেন গানে। সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়েছিল 'রক্তকমলে'। দু'জায়গাতেই আমরা দেখেছি, অভিনয়কে অখণ্ড ক'রে তুলতে এ ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করেছে।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের বাংলা কথক-ছবি
"চাঁদ সদাগর" চিত্রে
সুনন্দার ভূমিকায় শ্রীমতী সুহাসিনী

কিন্তু যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ক'রে গান দিলেই হয় না। যে নাট্যকার গান লিখতে জানেন না, তিনি দিলেন খানিকটা গদ্যকে গান ব'লে চালিয়ে; আর যিনি (নিজে হয়ত ভাল গাইয়ে কিন্তু) রঙ্গমঞ্চে কি সুর জমবে বা নাটকের ঘটনা-বিশেষের সঙ্গে কি সুর খাপ খাবে, কিছুই জানেন না, তিনি যা মনে এল একটা সুর দিয়ে দিলেন; এতে নাটককে হত্যা করাই হয়। গানের বাণী বা সুর সুন্দর এবং স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া দরকার। সেকালে যাত্রার দলের অধিকারীরা বা কর্ত্তারা, যিনি ভাল গান বাঁধতে জানেন, তাঁকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে

নিতেন এবং ভাল সুরশিল্পীকে দিয়ে জমাট সুর দেওয়াবার চেষ্টা করতেন ; তার ফল অধিকাংশ স্থলেই ভাল হ'ত। একালেও কবি হেমেন্দ্রকুমার বা নজরুলের সাহায্য গ্রহণ ক'রে 'গৈরিক পতাকা' বা 'কারাগারে' নাট-নিকেতন যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। (এস্থলে একটা কথা মনে করবার মত,—এই উপলক্ষ্যেই নাট্যজগতের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম পরিচয়)। এজন্য যদি রীতিমত পয়সা খরচ করতে হয়, তাতেও কার্পণ্য করা উচিত নয় ; কারণ নাটকের সার্থকতা এর উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

আমাদের বিশ্বাস, রঙ্গমঞ্চে গানের সঙ্গে বা নাচের সঙ্গে ভেতর থেকে যদি ভাল কোরাস্ গানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে ব্যাপারটা খুব জমাট হয়ে ওঠে। ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ে এরকম ব্যবস্থা আমরা দেখেছি—এবং দেখেছি যে, সত্যিই তার effect খুব ভাল হয়।

Back-Ground Music-এর সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক খুব বেশী। এ জিনিষটা খুব কঠিন। খারাপ গান নাটককে যতখানি ব্যর্থ করে, খারাপ Back-Ground Music তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যর্থ করে। কিন্তু জিনিষটা সুকৌশলে প্রয়োগ করতে পারলে নাটক কতখানি সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে, তা যাঁরা বিলিতী 'টকি' ছবি দেখেন, কিংবা আমাদের দেশে সীতার পঞ্চম দৃশ্যে মধুর বাঁশী বা তপতীতে মৃদু করুণ বেহালা শুনেছেন বা চণ্ডীদাস ছবি দেখেছেন, তাঁরা ভাল রকমই জানেন। শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে অর্জ্জুন ভীষ্মবধে যতটা সাহায্য করেছিলেন, এও রঙ্গমঞ্চের পেছনে থেকে নাটক জমাতে প্রায় ততখানি সাহায্য করে।

সবশেষে কথা—তুই অঙ্কের মধ্যে যে বিরাম দেওয়া হয়, সে সময় সঙ্গীতের একটা বিশেষ প্রয়োজন। নাট্যকার ও নট-নটী প্রাণপণ চেষ্টায় যে রূপ সৃষ্টি করেন, বিরাম-সময়ে 'পান বিড়ি সিগারেট' বা 'সীতা বই পাঁচ সিকে'—এই চীৎকারের মধ্যে তা রূঢ় ভাবে ভেঙে যায়। কাজেই সৃষ্ট ভাবের একটা রেশ্ রাখবার জন্য সঙ্গীতের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাই ব'লে আমি উৎকট তথাকথিত কন্সার্টের কথা বলছি না কিংবা লাউড-স্পীকারে রেকর্ড বাজাতেও বলি না। মৃদু, আনন্দদায়ক এবং পারিপার্শ্বিক সৃষ্টিক্ষম একটা সঙ্গীতের প্রয়োজন। ভেতর থেকে বেহালা, বাঁশী বা ঐ রকম কিছু বাজাবার ব্যবস্থা করলে কি হয় ?

বোধ হয়, এতক্ষণে বোঝাতে পেরেছি যে, নাট্যাভিনয়কে জমাট ক'রে তুলতে সঙ্গীতের কাজ অনেকখানি। সুতরাং এদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হ'বে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের ; নইলে নাট্য-ব্যবসায়ীদের কল্যাণ নেই।

ছায়াছবির মর্ম্মকথা

(রঞ্জন রুদ্র)

প্রযোজনার আদিপর্ব

এ-কথা সকলেই বোধ করি জানেন যে, একটি ফিল্ম বহুসংখ্যক খণ্ড-খণ্ড সেলুলয়েডের একত্রীভূত সমষ্টি। এই খণ্ড সেলুলয়েডগুলির দৈর্ঘ্য সমান নয়। কোনটি হয়ত ২০০ ফুট, কোনটি বা হয়ত ৫০০ ফুটে শেষ হয়েছে। এদের প্রত্যেকটি এক-একটি shot বা খণ্ডদৃশ্য,—যারা বিভিন্ন সময়ে ক্যামেরায় গৃহীত হয়েছে। এই Shotগুলিকে পরে তাদের নিজ-নিজ দৃশ্যের মধ্যে সন্নিবেশিত ক'রে সম্পূর্ণ একখানি ছবি প্রস্তুত হয়। যাদের এখনো ধারণা আছে যে, একখানি ছবি তোলার সময় তার আখ্যানভাগের আরম্ভ থেকে ক্যামেরার কাজ এবং অভিনেতৃদের কাজ গল্পের গতি অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলে, তাঁরা ষ্টুডিওর ভিতরের খবর কিছুই জানেন না। ষ্টুডিওর মধ্যে একখানি ছবির শেষ দৃশ্যটিই হয়ত সর্ব্বপ্রথমে তোলা হ'ল, তারপর তোলা হ'ল মাঝের দৃশ্য এবং তারপর হয়ত আরম্ভের!

কিন্তু ছবিখানি পরদার উপর দেখার সময় এ-কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। চিত্রনাট্যের এই কৃতিত্ব-পূর্ণ নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্যে আগে থেকেই নিখুঁত আয়োজনের প্রয়োজন। প্রযোজক বা পরিচালক ছবির কাজ আরম্ভ হবার বহু আগেই সমস্ত জিনিষটি ভেবে রাখেন। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হন না,—তাঁর চিন্তাগুলিকে তিনি কাগজের ওপর বিশদভাবে লিখে রাখেন,—এই লেখার মধ্যে তুচ্ছতম খুঁটিনাটি-টি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না—আকস্মিক বিপদ-দৃশ্যে অভিনেত্রীর ভুরু দুটী কতখানি পর্য্যন্ত প্রসারিত হবে, তা থেকে আরম্ভ ক'রে, নাটক-বর্ণিত দুরাত্মার পায়ের জুতোর শব্দ কি রকম হবে, তা পর্য্যন্ত!

এই বিশদ-বিবরণ-সমৃদ্ধ নক্সাখানিকে বলা হয় **Script**! এই স্ক্রিপ্ট্ বা পাণ্ডুলিপি বা বিবরণী—এইটিই হ'ল পরিচালকের কাজের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। এখানি তাঁর কাছে মানচিত্র, টাইম-টেবল এবং বাইবেলের মতোই মূল্যবান্। এই স্ক্রিপ্ট্খানি তাঁর দিনরাত্রির ধ্যান!

স্ক্রিপ্টের লেখা ফুল্স্ক্যাপ্ কাগজের ওপর দুটি স্তম্ভ (Column) ক'রে সাজানো হয়। ক্যামেরা কি কাজ করবে, তার নির্দ্দেশ থাকে বাঁ-দিকের কলমে; মাইক্রোফোনের সম্বন্ধে থাকে ডানদিকে। দৃশ্যের প্রতির কথা লেখা থাকে বাঁ দিকে; ডানদিকে থাকে কথোপকথন, শব্দ এবং সঙ্গীতের নির্দ্দেশ!

উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এবং দৃশ্যের পরিবর্ত্তন বোঝাবার জন্যে পরিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়। চিত্রনাট্যে এই পরিচ্ছেদের নাম **Sequences**! নাটকের যেমন দৃশ্য, চিত্রনাট্যের তেমনি sequences; নাটকে দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের জন্যে আলো নিভিয়ে পরদা ব্যবহার করা হয়; চিত্রনাট্যে ক্যামেরাম্যান যে-জিনিষের ব্যবহার করেন, তার নাম Fading অথবা Fade out!—একটি ঘটনার পর মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্যে পরদা অন্ধকার হ'য়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠে পরবর্ত্তী দৃশ্যের সূচনা করে,—কয়েক মুহূর্ত্তের সেই অন্ধকারটিকেই বলা হয় Fading বা Fade-out!

স্ক্রিপ্টের পাতায় sequenceগুলি সাজিয়ে নেবার পর, সেগুলি পুনরায় Shots বা খণ্ড-দৃশ্যে ভাগ করা হয়। এই টুকরো টুকরো Shot-গুলিকে জুড়ে দিলে একটি সম্পূর্ণ sequence তৈরী হবে।

এই shotগুলির আকার নানাপ্রকারের। ছবির পরদায় অনেক প্রকারের দৃশ্যই প্রতি-ফলিত হয়—উড়োজাহাজের ওপর থেকে গৃহীত এক শহরের সম্পূর্ণ ছবি থেকে আরম্ভ ক'রে, একজন নারীর আঙুলে যে আংটী আছে তাঁর মনোগ্রাম পর্য্যন্ত!

Shotগুলির আকার মুখ্যত এই ভাবে ভাগ করা হয়:—Long Shot; Semi-long shot; Medium shot; Close shot; Semi close-up; Close-up! একটি দৃশ্যের ছবি কি রকম আকারের হবে, তা এই শ্রেণী-নির্ণয়ের দ্বারা ক্যামেরা-ম্যান্ কতকটা বুঝে নেয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছে—এই দৃশ্যটি যদি দেখাতে হয়, তাহ'লে প্রথমে আপনাকে দেখাতে হবে, লম্বা রাস্তা এবং তারই ওপরে একটি ক্ষিপ্রগামী মানুষের মূর্ত্তি—অর্থাৎ আপনাকে উক্ত রাস্তার একটি Long shot গ্রহণ করতে হবে। তারপর যদি আপনি দেখাতে চান যে, লোকটির মুখের ভাব অতিশয় ভীতিব্যঞ্জক, তাহ'লে ক্যামেরাটিকে কাছে এনে লোকটির মুখের ছবি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ Close-up-এর ব্যবহার করতে হবে।

Summer Lightning-চিত্রে
র‍্যাল্ফ্ লিন্ ও উইনিফ্রেড্ শটার্

রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা ছায়াছবির একটা বড়ো সুবিধে এই যে, মঞ্চের উপর সমস্ত দৃশ্যগুলিই দর্শকদের সব সময়ে Long shotএ দেখানো হয়—কোনদিন তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, ঘটতে পারেও না; কিন্তু ছবির পরদায়

"Halmook's Gigantic Line of Gigantic Pictures for 1933-34.
Back the ... of Your Box-Office!
Congratulations! ... for the Good Times bound to Come!
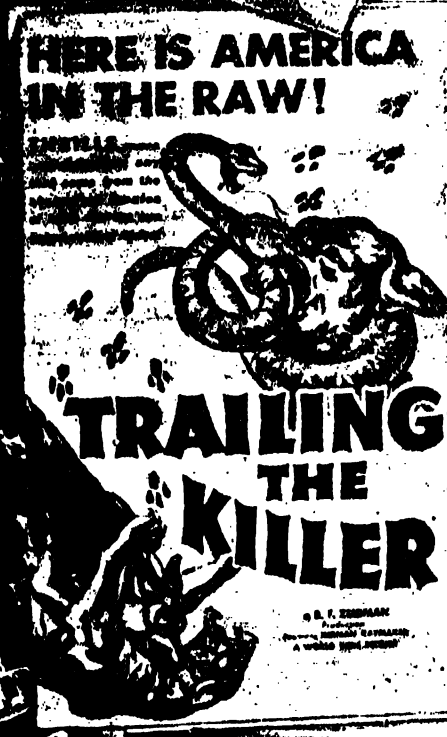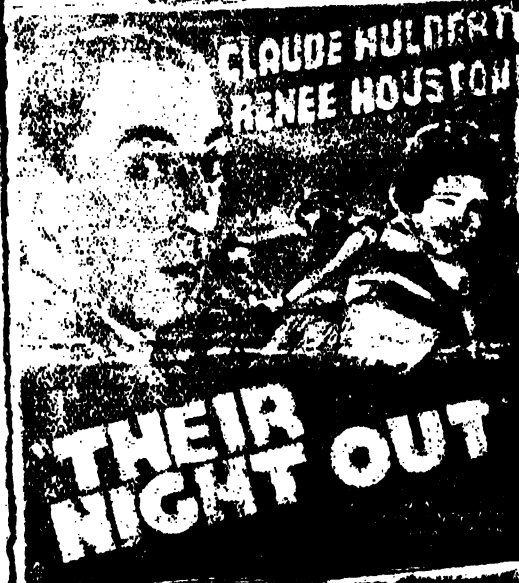
দর্শকবৃন্দ ক্যামেরার সঙ্গে থেকে প্রতি দৃশ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ করবার সুযোগ পায়। সেই কারণেই রঙ্গমঞ্চের নাটক অপেক্ষা চিত্রনাট্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি এবং তীব্রতর Climax-এর অবতারণা করা সম্ভবপর হয় এবং সেই কারণেই মঞ্চাভিনয় এবং চিত্রাভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী!

স্ক্রিপ্ট্ তৈরী করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়—যথেষ্ট পরিশ্রম এবং বুদ্ধি-সাপেক্ষ কাজ। স্ক্রিপ্ট্খানি সেলুলয়েডে রূপান্তরিত হবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে তার যাবতীয় কাজ শেষ হওয়া চাই এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন লাভ করা চাই। আখ্যানভাগের গঠনে, কথোপকথনের সরসতায়, দৃশ্য-সংস্থাপনের ব্যবস্থায় যদি যথোচিত মনোযোগ না অর্পণ ক'রেই স্ক্রিপ্ট্ তৈরী করা হয়, তাহ'লে তার দ্বারা ভালো ফল ফলবে না। চিত্র-নাট্যের উক্ত উপাদানগুলির বিষয়ে স্ক্রিপ্টের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এবং সতর্ক—কৌশলের সঙ্গে সন্নিবেশিত এবং বিশদ নির্দ্দেশ থাকা চাই—স্ক্রিপ্টের মধ্যে যদি কোন প্রয়োজনীয় কথা বাদ পড়ে, তাহ'লে খুব সম্ভব মূল ছবির মধ্যেও সে-কটি থেকে যাবে, সুতরাং স্ক্রিপ্ট্ রচনার সময় পরিচালকের দৃষ্টিশক্তি এবং সাবধানতার মূল্য যে কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়। "The finished script is really the finished picture: all the rest is carpentry"! এই স্ক্রিপ্ট্ দেখেই আপনি সেই কোম্পানীর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন; তাদের রুচি, তাদের দৃষ্টি-প্রসারতা, তাদের গল্পলেখকের ক্ষমতা এবং তাদের প্রযোজকদিগের মস্তিষ্ক—এ-সবের পরিচয় ঐ স্ক্রিপ্ট্ থেকেই পাওয়া যাবে—ঐ স্ক্রিপ্ট্খানিই হ'ল সেই প্রতিষ্ঠানের হল্‌মার্কা!

মীরাবাঈ-চিত্রে
দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতী

স্ক্রিপ্ট্ তৈরী হবার পর সেখানি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিল্পীদের হাতে-হাতে ঘোরে। প্রথমে Production Manager সেখানিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন!— তার মধ্যে কতগুলি Shot আছে? কতদিন সময় লাগবে? সেই দিক থেকে হিসেব ক'রলে কত খরচ পড়বে? ইত্যাদি

তারপর Art Director সেখানি গ্রহণ করেন।—সব-শুদ্ধ কতগুলি Set-এর প্রয়োজন? তাদের পিছনে খরচ পড়বে কত? Casting Director দেখেন কতজন অভিনেতৃর প্রয়োজন। সকলেই কি হাতের মধ্যে আছে, না বাইরে থেকেও সংগ্রহ ক'রতে হবে? অভিনেতৃদের পিছনে কত টাকা লাগবে? কতগুলি ক্যামেরা চাই? কতখানি সেলুলয়েড্ দরকার? কি কি আসবাব-পত্র প্রয়োজন? আসবাব-পত্র বলতে একটি ছোট পিয়ানো ক্রয় করা থেকে আরম্ভ ক'রে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে তাদের সমস্ত রণতরীগুলি ধার করা পর্য্যন্ত বোঝাতে পারে!

সহকারী পরিচালকের কাজ হচ্ছে প্রযোজনা সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং কর্ম্মীদের যথাযথ-ভাবে কাজে নিয়োজিত করা। স্ক্রিপ্টের মধ্যে যতগুলি Shot-এর উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে কি কি জিনিষ লাগবে, একটির পর একটি ক'রে তিনি তার তালিকা প্রস্তুত করেন। কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ষ্টুডিওয় আসতে হবে বা হবে না—সে খবরও তিনি রাখেন। কার জন্যে কি পরিচ্ছদ লাগবে এবং কোন্ কোন্ Set-এ কোন্ কোন্ অভিনেতৃ কাজ করবেন, সে-হিসেবও রাখেন সহকারী পরিচালক। প্রধান পরিচালককে বহু পরিমাণেই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হ'তে হয়।

নাটিকা-বটিকা

আঁধারে আলো

(শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়)

অভিমানিনী ভামিনী অঙ্কলক্ষ্মী পালঙ্কশায়ী স্বামীর পাশে এসে বোসতেই তিনি সোৎসাহে বোলে উঠলেন;—

"এসো.... এসো আমার..."

ঝনৎকার সহকারে অভিমানিনী উত্তর দিলেন;—

"তোমার আর 'ইয়ে' দেখাতে হবে না—

বলে তোমার যেমন ই-ই-ই-ইয়ে
মোচোনমানের মুরগীপোষা!—

স্বামী—ছড়া মিলুক আর নাই মিলুক, তোমায়-আমায় কেমন মিল হোয়েছে, বলো দেখি?

স্ত্রী—যাওঃ! ঢের দেখেছি, আর দেখতে হবে না! তুমি আমায় একটুও 'ইয়ে' করোনা!

স্বামী—একটুও না? বলো কি! আমি তোমায় কতো!...কতো!...

স্ত্রী—ভারিতো, ছিটে ফোঁটাও যদি দেখতে পেতাম।

স্বামী - দেখবে তবে?

(বেড্ সুইসের বোতাম টিপতেই আলো নিভে গেল সব অন্ধকার মুহূর্ত পরেই আবার আলো।)

স্ত্রী—(কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) উঃ! কী আলো!

স্বামী—কেন গো? আলোয় আবার কী হোলো?

স্ত্রী—এতে যে কিছুছু দেখা যায় না—(সোহাগের সুর)!!

এক গোছা গান

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

(১)

নিঝুম রাতে একলা ঘরে থাকি যখন আমায় নিয়ে।
জাগিয়ে রেখো বন্ধু, আমায় তোমার সুরের পরশ দিয়ে॥
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বারে,
ঘুমায় ব্যথা অন্ধকারে,
আমার ব্যথা জাগিয়ে রেখো তোমার নিঠুর সুর শুনিয়ে।

শ্রাবণ-মেঘে কাঁপবে সেতার মল্লারে তার দুর্বিসহ।
ঝরবে আকাশ ভরবে বাতাস সইতে নারি' সেই বিরহ॥
চোখের জলে সুরের বাণী
ভিজিয়ে দিবে প্রাণ দু'খানি,
সুর-বিরহী মিলবে দু'জন সুর-পাথারের দূর ডিঙিয়ে॥

(২)

যতই ভালবাস তারে পরাণ কভু বশ মানে না।
এক নিমেষে করবে বরণ যতই মরণ হোক্ অচেনা॥
সে হিম-হাতের পরশ পেলে
সবাই সে যাবে ফেলে
যতই থাকো নয়ন মেলে' চোখের জলে সে ভুলবে না॥

মেয়ের মত' কোলে-বুকে যতই বাড়ুক্ সোহাগভরে।
সময় হ'লে যাবে চলে' আপন বলে' পরের ঘরে॥
জীবনভরা স্নেহের ডোরে
বাঁধ' তারে যেমন করে'
যতই বাড়ুক তোমার ঘরে, সে যে তোমার পরের দেনা॥

(৩)

নয়ন যদি নয়ন টানে, অধর কি উদাসী থাকে।
চোখের সাথে ঠোঁটের আড়ি—এ অপবাদ কইব কাকে'॥
কাল যে ছিল খেলার সাথী
আজকে মাঝে আঁধার রাতি,
দুজনারে দেখ্‌বে দু'জন অপরাধী দূরের ফাঁকে॥

তোদের কথা তোরাই জানিস, মন মানেনা কথার মানা।
প্রাণের সাথে প্রাণের বাঁধন, ব্যথা যাদের তাদের জানা॥
সরল মনে ক'রে বাঁকা
তোদের ছবি পটে-আঁকা,
বিধান বিধির বারণ ব'লে বাঁধ্‌বি মনে কথার পাকে।

(৪)

তোমার বুকে যে ফুল ফোটে সাজাই বুকের ফুলদানীতে।
তাইতে আমি রাজার রাজা মনের বনের রাজধানীতে॥
চাইনে পরে শাস্তি দিতে
জগৎযোড়া যশ কিনিতে
কাউরি মুখের চাইনে খবর চাইনে কারো মন জানিতে॥
দু'জন নিয়ে রাজ্য করি
একেশ্বর আর একেশ্বরী
পরস্পরের প্রেমের প্রজা রাজাতে আর রাজরাণীতে॥

(৫)

মিছে আমায় ডাকৃছ পথে হে বিরাগী হে বৈরাগী।
মনের বনের মালী আমি ফুল নিয়ে যে প্রহর জাগি॥
ফুটুল কোথায় বকুল-বেলা
গন্ধ বিলায় কোন্ চামেলা
কোন্ কোণাতে চাইছে চাঁপা প্রিয়জনের পরশ মাগি॥

সূর্য্যমুখী যেমন আমার তেমনি করুণ শেফালিকা।
লজ্জাবতীর লজ্জা ভেঙে পদ্মে মিলাই মন্-মালিকা॥
গন্ধরাজের গন্ধ সাথে
মিলাই অশোক হাতে হাতে
চেয়ে দেখি কোন্ কামিনী নিশি কাটায় কাহার লাগি'॥

(৬)

হের'—শ্রাবণ-দিন হ'ল অবসান।
শোন'—তিমিরে ঘনায় ঝিল্লির গান॥
চল কুঞ্জবনে মৃদুচরণে
বর' দেহ ঢাকি মেঘবরণে
বিদ্যুতালোকে মেলি' নয়ান॥

আজি নিধুবনে তোমা লাগি রাই।
পথপানে চাহি উতলা কানাই॥
হিন্দোলা বাঁধি তমাল-ডালে
দুলাবে তোমায় মুরলী-তালে
এই বাদল রাতে মাতে পরাণ॥

মিকি মাউসের কথা

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

আবার শারদী এসেছে তার মোহন মূর্ত্তি নিয়ে। বাংলার ঘরে ঘরে বইছে আজ উৎসবের হিল্লোল। নীলাকাশের পথে দেখ্‌ছি মেঘের বিচিত্র অভিযান, বাংলার গাছ-পালা পশু-পক্ষীর বুকে জেগে উঠেছে আজ শরতের যৌবন, মাটি থেকে পাচ্ছি মাটির সোঁদা গন্ধ। শরতের মঞ্জুল আলো আজ বাঙালীর নির্জ্জীব দেহকে নতুন উৎসাহে, নতুন দীপ্তিতে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বাঙালীর আজ আনন্দের দিন—সারা বছরের কর্ম্মশ্রান্ত দেহকে দুঃখের জ্বালা থেকে, শোকের দাহ থেকে মুক্ত ক'রে সে আজ মেতে উঠেছে শারদোৎসবে।

তাই আজ কোন গুরু বিষয়ের অবতারণা ক'রব না। হাল্কা বাঁধনের মধ্যে যে ধরা দেয়, যার লীলা-চঞ্চল গতির মধ্যে দিয়ে রসের আভাস ফুটে ওঠে, তার গুণপনার কথা নিয়েই প্রবন্ধের পত্তন ক'রেছি।

'মিকি মাউস' হচ্ছে বর্ত্তমানের সবচেয়ে বড় আনন্দদাতা (এখানে ছবির সম্বন্ধেই ব'লছি।) আপনারাও তার কার্য্যকলাপ দেখে যদি প্রাণ ভ'রে না হেসে থাকেন, তবে আপনাদের রসিক ব'লতে আমরা নারাজ। কারণ 'মিকি'র রসসৃষ্টির মূলে এমন সূক্ষ্ম রহস্য আছে, যাকে কোনক্রমে অস্বীকার করা চলে না।

Mickey Mouse and his creator Walt Disney

"Mickey Mouse is all things to all men. He is a gust of thoughtless fun to the casual, the lowbrow, the thoughtless. He is the voice and personification of the weltschmerz to the sophisticate and a blood brother to the philosopher. Mickey is more of a man than a mouse and in all humility, not irony, we must admit that it takes a mouse to be Everyman."

আসল প্রবন্ধের অবতারণা করা যাক্।... ... ১৯২০ সালের কথা। United States-এর মধ্যবর্ত্তী এক সহরে অজানা এক যুবক-শিল্পী শিল্পকলার এক বিপণিতে পেশাদারী শিল্পীর কাজ করতেন। কাজ ক'রতে হ'ত তাঁকে রাত্রিতেই। নিশুতি রাত্রে তিনি প্রায়ই শুনতে পেতেন, কারা যেন কাগজ-ফেলার ঝুড়ি হাঁটকাচ্ছে ও ঘরে ছুটোপাটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

আসলে ব্যাপারটা হ'চ্ছে মজাদার।—সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হবার পর (এক পূর্ব্বোক্ত শিল্পীর পেন্সিলের খস্‌খসে আওয়াজ ছাড়া) কতকগুলি ইঁদুর বেরুতো খাবারের সন্ধানে। ঐ ঝুড়ির ভিতর টুক্‌রো খাবারের খোঁজ তারা পেতো; কারণ মহিলা কর্ম্মীরা ঐ ঝুড়ির মধ্যেই তাঁদের খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেল্‌তেন। এবং খাবার সংগ্রহের জন্যে যে-টুকুন্ শব্দের সৃষ্টি হ'ত, তাই যেত শিল্পীটির কাণে।

শিল্পীটি এই সব ইঁদুরের অদ্ভুত, বিচিত্র অথচ হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী দেখে খুব আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়লেন। একটি খাঁচায় বন্দী ক'রে তিনি দশটি ইঁদুরের সঙ্গে সখ্য পাতালেন। তাদের খাওয়াতেন, তাদের সঙ্গে তিনি খেলা ক'রতেন। সকলের মধ্যে একটি ইঁদুর কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌লো তাঁর অত্যন্ত বশীভূত। তিনি যেতেন এঁকে, সে থাক্‌তো তাঁর টেবিলের উপর চুপ্‌টি ক'রে ব'সে।

আট বছর পরে জীবন-সংগ্রামে এই শিল্পীটি জয়ী হ'লেন। এই অজ্ঞাত শিল্পীটিই হ'চ্ছেন 'মিকি মাউসে'র জন্মদাতা Walt Disney। নীরব ছবির উপর যখন প্রথম শব্দ-যোজনা করা সুরু হ'ল, তখন থেকে 'মিকি'ও লোকের মন জয় ক'রতে সুরু ক'রলে।

এই ক্ষুদ্র চপল ইঁদুর আজ জগদ্বিখ্যাত। ১৯৩১ সালে সর্ব্বসমেত আট লাখ্ চিঠি পেয়ে 'মিকি' সমস্ত নট-নটীর 'fan mail record'কে পরাজিত করেছে। 'মিকি-মাউসে'র ছবি তৈরি করার ষ্টুডিওই হ'চ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সশব্দ কার্টুন্ ছবি তোলার কারখানা। সঙ্গীতের সুর তোলার জন্যে দু'টি প্রকাণ্ড 'music scoring set' আছে। সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে সাজানো প্রক্ষেপন গৃহ, রেকর্ডিং মঞ্চ, একশো জন কার্টুন শিল্পী ও বাড়্‌তি হাস্যরসাত্মক ছবি আঁক্‌বার শিল্পীদের জন্যে আবাসগৃহ প্রভৃতি এই ষ্টুডিওকে বড় ক'রে তুলেছে।

হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, প্রায় দু'শো লোক 'মিকি'র ছবির জন্যে খাটে। তার এত খাতির, তার জন্যে এত মেহনত; তবুও 'মিকি' নিজে কিছুই মাইনে পায় না। হলিউডের মধ্যে একমাত্র অবৈতনিক চিত্র-শিল্পী হ'চ্ছে 'মিকি মাউস্'। মাইনে না পেয়েও সে Walt Disneyকে এনে দেয় অগাধ টাকা!

'মিকি'র ছবি তৈরি করার হাঙ্গামা বিশেষ কিছু কঠিন রকমের নয়। নট-নটীদের বদলে এতে দরকার হয় আঁকিয়ে শিল্পীদের—এবং তাঁদের অঙ্কন-কৌশলের। Disneyর ষ্টুডিওয় প্রথমে ছবি আরম্ভ হবার আগে একটা "gag" মিটিং বসে। এই মিটিংয়ে মূল গল্পটি নিয়ে আলোচনা চলে, তার একটা মোটামুটি খস্‌ড়া তৈরি হয়। চিত্রনাট্য-রচয়িতারা স্ক্রিপ্ট্ বানিয়ে

ফেলেন এই থেকে : 'adapter'রা তাকে ভেঙে চুরে sequences ও shots-এ পরিণত ক'রে দেন। দৃশ্য-পরিস্থাপকরা পশ্চাদপট্ আঁক্তে সুরু করেন। তারপর চলে তিন দল তাঁকিয়ে শিল্পীর কাজ।—

প্রথম দল হচ্ছেন "animators"—একটা খুব লম্বা টেবিলের সাম্নে পাশাপাশি চেয়ারে ব'সে উজ্জ্বল আলোর সাম্নে তাঁরা কাজ করেন। তাঁদের কাজ হচ্ছে কোন 'action'এর প্রথম ও শেষ এঁকে দেওয়া। তারপর সেই আঁকা-ছবি চ'লে যায় দ্বিতীয় দলের মধ্যে; তাঁরা হচ্ছেন "in-betweeners"।—তাঁরা শুধু ছবির মধ্যে এমন সব সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় কাটেন, যাতে ছবি দেখেই মনে হয় যে, তার একটা গতি আছে। তৃতীয় দল হচ্ছেন "inkers"। তাঁরা এই সব ছবির উপর চারকোণা স্বচ্ছ সেলুলয়েড্ রেখে কালি দিয়ে সেইগুলো কপি ক'রে যান। তারপর ক্যামেরার মধ্যে অঙ্কিত পশ্চাদপট্ রেখে হাতল ঘুরিয়ে "super-imposed" ক'রে নিলেই একটা সম্পূর্ণ ছবি হয়ে দাঁড়ায়।

সাড়ে ছ'শো বা সাড়ে সাতশো ফিটের একখানা ছবির জন্যে ছ'হাজার থেকে সাত-হাজার অর্দ্ধি আঁকা-ছবির প্রয়োজন হয়।

বছরে সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ খানা 'কার্টুন' ছবি Walt Disneyর ষ্টুডিওয় তৈরী হয়। তার মধ্যে আঠারো খানা হয় 'মিকি মাউস্' 'কার্টুন', আর 'Silly Symphonies" তোলা হয় তের খানা।

চার্লির মত 'মিকি'ও কথা কয় না, তবু তার আদর কমে না। 'মিকি' এমন জগতেই বাস করে, যেখানে স্থান-কাল-পাত্র বা দৈহিক শক্তির মূল্য নেই। সে অনায়াসেই একটা ষাঁড়ের মুখের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, ষাঁড়টির দাঁতগুলো উপ্‌ড়ে তুলে নিয়ে করতালি বাজাতে পারে। ব্যাঙের দলের নেতা হ'য়ে সে যেতে পারে রাজা-রাজ্‌ড়ার দরবারে। বেহালার সুর টানও তার হাত দিয়ে বেরোয়। "His ingenuity is limitless; he never fails."

রবীন্দ্রনাথের রূপছত্র

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ

অসীম সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বন্ধহীন বিরাটের অপরিমেয়তার আভাস পাই। নূতনতরো কল্পলোকের অনির্ব্বচনীয়তার সন্ধান মেলে, কবিগুরু যখন তাঁর অলোকসামান্য রূপছত্রের আসর বসান। জীবনে যে-কয়েকবার তাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য পেয়েছি, সেই কয়েকবারের স্মৃতি মনের গভীরে অপরিমোচনীয় রেখাপাত করেছে—তাদের স্মৃতি অনিত্যকালের বাধা অতিক্রম ক'রে শাশ্বতকালের সৌন্দর্য্য-সুর-লোকের পানে আমাদের চিত্তকে উর্দ্ধায়িত ক'রে রাখলো। তুচ্ছতায় সমাকীর্ণ জীবনকে যিনি বারে বারে এমন ক'রে নাড়া দিয়ে তাকে চকিত উন্মুখ ক'রে তুলেছেন, জীবনের সেই মহামন্ত্রগুরু রবীন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম করি।

চণ্ডালিকার রুদ্র ডমরুর শব্দে আমার হৃদয় গুরু গুরু মন্দ্রিত হ'য়েছে। কবিগুরুর বাণীর দৃপ্ত তেজে মনে হয়েছে, যেন সত্যিই সে-রাত্রি—"সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত বজ্র-সচকিত ত্রস্ত শর্ব্বরী।" ... ..."ভয়ে কেঁপেছে আমার মন, আনন্দে দুলেছে আমার প্রাণ।"

তাসের দেশে পেয়েছি অপরূপের সন্ধান। দেবদুর্ল্লভ রূপলোকের রুদ্ধ দ্বারের ওপারে দেখেছি সেই দেশ—"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ। প্রবাল দিয়ে ঘেরা। শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।" বিচিত্র তার রাজা। অদ্ভুত তার প্রজা। অপরূপ তার মায়াকন্যার দল। সেই অলোকসামান্য রূপলোক যাঁদের চরণছন্দে প্রাণমন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়েছে—কবি-দৌহিত্রী নিঃসংশয়ে তাঁদের মধ্যে জয়মাল্যের অধিকারিণী! দেখেছি, তাঁর প্রতি চরণক্ষেপে ফুটে উঠেছে নন্দনলোকের লীলাপদ্ম। শুনেছি, তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মাতামহের অদ্বিতীয় আবৃত্তিভঙ্গীর স্বর-নিক্বণ!

যা বর্ণনা করতে চাই, তার পক্ষে সংকীর্ণ এই পত্রিকার স্থান। ভাষা সংকীর্ণতরো! মাঝে মাঝে এমনিতরো রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠিত অভিনয়, নিশীথরাত্রে নাম-না-জানা পাখীর করুণ সুরের মতো, আমাদের চিত্তকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। মনের মালিনা ঘুচে গিয়ে ক্ষণেকের জন্যে উপলব্ধি করি সেই পরম-সুন্দরকে—দৃষ্টি প্রসারিত হয় জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরে আমরা বাঁচি!

সম্ভাষণ

(বন্ধু শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় করকমলেষু)

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

স্মরণ করিয়া আবার আমারে শরতের শুভদিনে
নূতন করিয়া বাঁধিলে, বন্ধু, অপরিশোধ্য ঋণে,
তোমার কথাই বার বার করি আজি যে হৃদয়ে জাগে
অভিনন্দনে দিই তাই মালা, সীমাহীন অনুরাগে।

*

করিয়াছ তুমি শ্রী-র আরাধনা, নির্ভয় লেখনীতে
অসুন্দরের রচেছ নিন্দা, শাসিয়াছ কুৎসিতে,
সত্য বলিতে হওনি কাতর, কাহারো মুখ না চাহি
অযোগ্যে করি গুরু কশাঘাত, বলায়েছ 'ত্রাহি! ত্রাহি!'

*

ললিত কলারে সব দিক দিয়া সূক্ষ্ম বিশদ করি
মোহন মূরতি দিয়েছ তাহার, চোখের সমুখে ধরি।
ভাবের যাদুতে পরিপূর তব রুচির ভাষার মোহ,
শত্রুরে দিল মৈত্রীর কোল, দলিয়া সকল দ্রোহ।

*

হে কলা-রসিক সুহৃদ্ আমার, কবি, গীতকার, গুণী,
লিপিতে তোমার শিল্পীরা পাক্ রস-সুধা-সুরধুনী,
আলিঙ্গনের বিনিময়ে, প্রিয়! লহ মোর হাত হ'তে
মরমের, নীল প্রেমের-পদ্ম—স্নিগ্ধ, আলোক-স্রোতে।

থিয়েটার অচল কেন ?

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

মুখর চিত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা কথা চলিত হ'ল—"থিয়েটার আর চল্‌বে না। টকী থিয়েটারকে মেরে দিলে। এই দেখুন না মশায়—চণ্ডীদাস" ইত্যাদি—একবার মনে হয়েছিল কথাটা বোধ হয় সত্যি। টকী বেশ চল্‌ছে—নতুন নতুন টকী হাউস সহরের সর্ব্বত্র গজিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে সব কটী থিয়েটারেই নাটকের পর নাটক ফেল্‌ হ'তে লাগ্‌ল। অভিনয়ের প্যাচে দুই একখানা নাটক যদিই বা ৮।১০ রাত্রি চলে—তারপর আর চলে না। এমন সময় গত বছর দেখা গেল—ষ্টার থিয়েটারে "পোষ্যপুত্র" খুব জ'মে গেছে। সকলে ব'ল্লে—দানিবাবু। অপরেশবাবু এমন ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, যা একমাত্র দানিবাবুরই যোগ্য। দানিবাবুও প্রাণ খুলে অভিনয় করেছেন।"—কথাটা সত্যিও; অবশ্য দানিবাবু ছাড়া অন্য অভিনেতারাও ভাল অভিনয় করেছিলেন। তারপর দানিবাবুর অসুখ হ'ল, 'পোষ্যপুত্রের' হ'ল অকালমৃত্যু। কোন থিয়েটারে কোন নাটক আর জমে না। যে কয়জন নামজাদা অভিনেতা আছেন, তাঁরা একত্র হ'য়ে অভিনয় করেন—প্রথম প্রথম কিছু সুবিধা হয়েছিল—এখন আর সুবিধা হয়না—কেননা নাটক পুরাতন, অভিনেতারাও সেই সমস্ত ভূমিকায় পুরাতন। নূতনের আকর্ষণ পুরাতনে কোথায়? তবু সপ্তাহের পর সপ্তাহ combination play চ'ল্‌ছে।

থিয়েটার চ'ল্‌বার এবং চালাবার সর্ব্বপ্রথম উপাদান কি?—অনেক তর্ক বিতর্ক ক'রে দেখা গেছে—সকলের আগে দরকার হয় নাটক। তারপর তার উপযুক্ত অভিনেতা। সব কয়জন ভাল অভিনেতা এক হ'য়েও কিছু ক'রতে পারেন না—নাটকখানি যদি ভাল না হয়। ভাল নাটক কাকে বল্‌বো? আমাদের দেশের খবরের কাগজে বাংলা নাটকের বিচার হয় ইংরাজী নাটকের টেক্‌নিক্‌ দিয়ে। সেইজন্য প্রায় সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত সমালোচকের মত—"বাংলায় নাটক নেই। উপন্যাস আছে, কাব্য আছে, ভ্রমণকাহিনী, আছে, নেই শুধু নাটক"। কথাটা চ'লে আস্‌ছে গৈরিশ যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত। অনেক বড় সাহিত্যিকও অসঙ্কোচে এই মত প্রচার ক'রেছেন। তাঁরা এ-কথা জান্‌তেন না, অভিনয়ের নাটক ঠিক পাঠ্য নাটক নয়—শুধু পাঠ ক'রে যে-নাটকের কোন রস তাঁরা আবিষ্কার করতে পারবেন না, সেই নাটকেরই অভিনয় দেখলে আবার তাঁরাই হেসে কেঁদে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌বেন। অভিনেতার মতে সেই নাটকই শ্রেষ্ঠ নাটক, যা অভিনয় করা যায়। এমন নাটক আছে, যা শুধু পাঠ্য, কিন্তু ঠিক অভিনয়-উপযোগী নাট্য নয়। গিরিশবাবু, অমৃতবাবু নাটক লিখ্‌তেন থিয়েটারের জন্য—তাঁরা থিয়েটারের কর্ণধার; যেমন চালাতেন থিয়েটার তেমনি চল্‌তো। বাইরের সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ থিয়েটারে জনপ্রিয় হ'য়েছিলেন। তখনকার দিনে থিয়েটারের চালকেরা এটা বুঝেছিলেন—নিজস্ব নাট্যকার একটা চাই, নইলে থিয়েটার চালানো দুষ্কর। নূতন নাটক আবশ্যক। এই পুরাতন নিয়মে আর্ট থিয়েটারও চ'লেছিল। সেখানকার প্রধান নাট্যকার একজন।

তারপর এলেন নূতন যুগের অভিনেতা। তাঁদেরও ধারণা—"বাংলায় নাটক হয় না।" অথচ থিয়েটার চালাতে হবে—নাটক চাই। তখন আরম্ভ হ'ল বাইরের লোকের নাটক অভিনয় করা। অভিনেতার নাট্যকারের উপর শ্রদ্ধা নাই। তিনি মনে করেন—আমি চালাচ্ছি, তাই নাট্যকারের নাটক চলে। ফলে রঙ্গালয়ে নাট্যকারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল অভিনেতার পর। অথচ নাট্যকারের স্থান সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। কথা উঠ্‌তে পারে—"এমনো হ'তে পারে,—অতি নিকৃষ্ট নাটক, শুধু অভিনয়ের গুণেই ভাল হয়েছে—"। আমি বল্‌বো, অভিনেতার কাছে যে নাটক অভিনয় করতে পারা যায়, সেই নাটকই উৎকৃষ্ট। অভিনয়ে ভাল হবার জন্য দরকার হয় নাটকে চরিত্রসৃষ্টি। যে নাটকে চরিত্রসৃষ্টি আছে, সে নাটক খারাপ নয়। এই হিসাবে আমার মতে "তপতী"র চেয়ে "আবুহোসেন" ভাল নাটক, সমালোচকগণ এ-সম্বন্ধে যাই বলুন। থিয়েটারের মালিক বলেন, "আত্মদর্শন ভাল পয়সা দিয়েছে, অতএব আত্মদর্শন আমার কাছে ভাল নাটক

আমি কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলি—আত্মদর্শনের ভাল অভিনয় হ'য়েছিল (ব'লেই আত্মদর্শন পয়সা দিয়েছে), অতএব 'আত্মদর্শন' ভাল নাটক। Public বা জনসাধারণ কখনো ভুল বিচার করেনা—তারা যাকে বাঁচিয়ে রাখে, সে নাটক সত্য। জনসাধারণের বিচার সত্য বিচার ব'লেই ফৌজদারি মোকদ্দমায় জজের সঙ্গে জুরীকে বিচারের জন্য ডাকা হয়। অবশ্য শ্রেষ্ঠ সত্য সেই, যে-ক্ষেত্রে জজ ও জুরী একেবারে একমত।

নাট্যকারের উপর বিশ্বাস নেই, অথচ বাধ্য হয়ে তার নাটক অভিনয় ক'রতে হয়। অভিনেতার সুবিধার জন্য ফরমাস মতো নাটক কাটাকুটি চ'লতে লাগ্‌ল। প্রত্যেক অভিনেতা নির্ম্মমভাবে নাট্যকারকে সমালোচনা কর্ত্তে লাগ্‌লেন! ফলে নাট্যকারেরও আত্ম-অবিশ্বাস জন্মাতে লাগ্‌ল তিনি মনে করেন—"বোধ করি নাট্যকার ছাড়া আর সবাই ভাল-রকম নাটক বোঝেন।" এরূপ অবস্থায় ভাল নাটক রচনা সম্ভব হয় না। নাটক যদি উত্‌রে যায়, অভিনেতারা অগ্রসর হয়ে তার সাফল্যের বিজয়মাল্য অসঙ্কোচে আপনার গলায় পরেন।—নাটক না জ'মলে বা জনপ্রিয় না হ'লে সমস্ত দোষটা গিয়ে পড়ে নাট্যকারের উপর। অভিনেতারা আবার গর্ব্বভরে ব'ল্‌তে থাকেন, "ও-নাটকের কি অভিনয় হয়!" আমি বলি—কি আবশ্যক ছিল সে নাটক অভিনয় করবার, যার অভিনয় হয় না?

থিয়েটার চালানোর জন্য সর্ব্বাগ্রে দরকার,—অভিনেতা ও প্রযোজকের নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি থাকা। সে-শ্রদ্ধা যদি তাঁর বা তাঁর গ্রন্থের উপর না থাকে, তাহ'লে তাঁর নাটক যেন তাঁরা অভিনয় না করেন! তার চেয়ে ভাল উপন্যাসকে তাঁরা নিজেরা নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করুন, কিংবা পুরাতন নাটকের অভিনয় করুন, সেও ভাল। কেননা এ-কথা সত্য, নাটকের ভিতর যদি পদার্থ না থাকে, অভিনেতা চেষ্টা ক'রে কিছুই কর্ত্তে পারেন না। ভাল নাটকে যদি মাঝারি অভিনেতা অভিনয় করেন—তাঁদের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়, অথচ খারাপ নাটকে অভিনয় ক'রে ভাল অভিনেতাও তাঁর পূর্ব্ব যশ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারেন না। অভিনেয় ভূমিকাটী যদি জীবন্ত চরিত্র হয়, তবেই অভিনেতা তার রূপ দিতে পারেন; যার জীবন নেই, সেই অসৎ পদার্থকে জীবন্ত করে কার সাধ্য?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, থিয়েটার চালাতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে যেটা আবশ্যক, সেটা শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ-সম্মেলন নয়, নাটক নির্ব্বাচন। এই কাজটা আমাদের থিয়েটারে অতি সহজ কাজ ব'লে বিবেচিত হয়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ যারা টাকা খরচ করেন, তাঁরা নিজেরা অভিনেতা না হ'লেও এই কাজটি ক'রে থাকেন। একখানি নাটক তাঁরা নির্ব্বাচন ক'রলেন; যদি কোন অভিনেতা তাঁদের নির্ব্বাচনের ভুল দেখিয়ে নাটকের ত্রুটী, বিচ্যুতি জানিয়ে
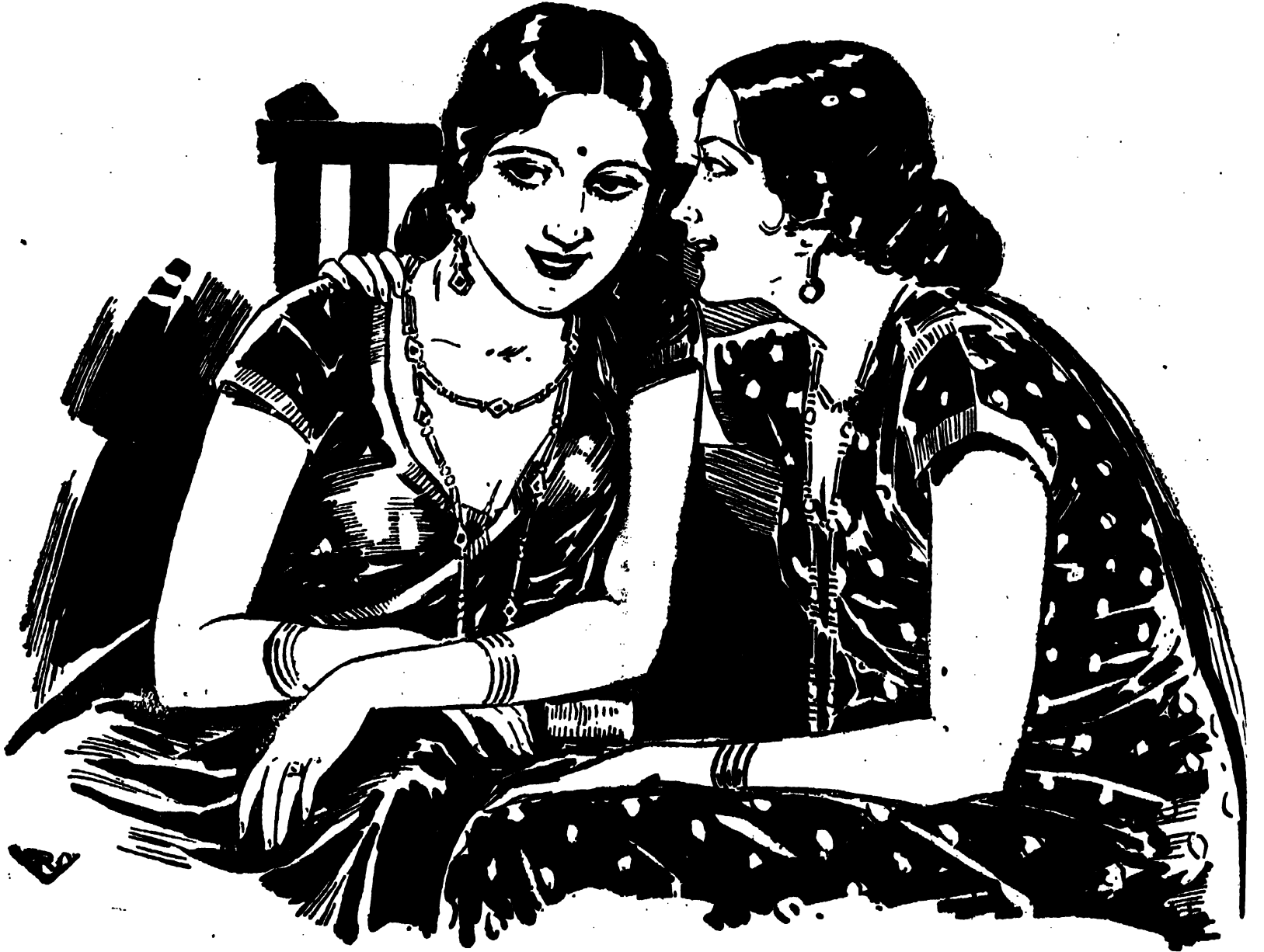
দেন, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের বন্ধু ব'লে স্বীকৃত হবেন না। তিনি যদি একেবারে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা না হন, অর্থাৎ যদি তাঁর অভিনীত ভূমিকাগুলি অন্য নটের দ্বারা অভিনয় করানো সহজ হয়,—তাঁর চাকরী যাবার সম্ভাবনা আছে।

তারপর ভূমিকা-নির্ব্বাচন। এর জন্যেও অনেক ভাল নাটক মারা যেতে পারে। যে ভূমিকাটী রামকে দেওয়া হয়েছে, সেটী যদি শ্যামকে দেওয়া হ'ত এবং শ্যামের ভূমিকাটী যদি মধুকে দেওয়া হ'ত, তাহ'লেই হয়তো সে নাটকের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু এই ভূমিকা-নির্ব্বাচনেও অনেক ক্ষেত্রে সত্ত্বাধিকারী-চাল চালা হয়। যথা, অমুক অভিনেতা আগের নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছে; এ নাটকে সে যদি আবার একটা ভাল ভূমিকা পায় এবং ভাল অভিনয় করে, তার দাম বেড়ে যাবে; অতএব ওকে চাপা দেওয়া দরকার। সুতরাং এ নাটকে হয় তাকে বসিয়ে রাখ, না হয় একটা অতি নগণ্য ভূমিকা দাও—যেন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এর ফলে যে অনেক সময় সমগ্র নাটকখানিই মাথা তুলতে অসমর্থ হয়, একথা তাঁরা অধিকাংশ সময়েই ভুলে যান।

দেশে ভাল নাট্যকার নেই সুতরাং ভাল নাটক হয় না,—একথা অতি সহজ, বুঝতে কষ্ট হয় না। অথচ থিয়েটার করতে গেলে সকলের আগে চাই নাটক। উপায় কি?—উপায় আছে; অন্ততঃ আমি মনে করি উপায় আছে। ভাল নাটক না থাক্, তবু অনেক লেখক আছেন—যাঁরা সময় ও সুযোগ মত নাটক, উপন্যাস সবই লিখে থাকেন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁদের আমন্ত্রণ করুন—তাঁদের সঙ্গে নাটকের রূপ ও প্রাণ নিয়ে আলোচনা করুন। তারপর তাঁদের স্বাধীনতা দিন। যাঁরা তাঁদের কাছে আসেন এবং তাঁদের খোসামোদ করেন, এমন নাট্যকারের নাটক নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। যদি অভিনেতা মেলে, তো নাট্যকার মিলবে না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। নাট্যকারেরা নিজেদের মর্য্যাদা হারিয়েছেন ব'লেই রঙ্গালয়ে তাঁদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। অভিনয়ের নামে যাঁরা হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করেন, রঙ্গালয়ে তাঁদের যেটুকু কদর আছে, প্রথম নাট্যকার-যশঃ-প্রার্থীর সে কদরও নেই। কল্‌কাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ক'টী পরস্পরের শত্রুতা ক'রে তাঁদের নিজেদের অবস্থা আরও খারাপ ক'রে তুলছেন। তাঁরা যদি এক হ'তে পারতেন, তাঁদের শক্তি বাড়তো। অভিনেতারা যদি মিলতে পারেন, তাঁদের শক্তি বাড়ে। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতারা মিলে যদি একটী মণ্ডলী গ'ড়ে তোলেন, সেই মণ্ডলী অনেক ভাল কাজ ক'রতে পারেন। নাটক পাওয়া যায়, অভিনেতা পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মান সম্ভ্রম বজায় থাকে।

কারো সঙ্গে কারো মিল নেই ব'লেই আমাদের দুরবস্থা এত বেশী। টকী থিয়েটারের শত্রু নয়। বাংলা থিয়েটারের কর্ত্তারা যদি একেবারে পুরাণতন্ত্রী (conservative) না হ'তেন, খোলা মন আর খোলা চোখ নিয়ে চিত্রনাট্যাভিনয়ের গতি লক্ষ্য ক'র্ত্তেন নির্ব্বাক ও সবাক ছবির মালিক তাঁরাই হ'তে পারতেন। থিয়েটারের কাছ থেকে অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, যন্ত্রী, এমন কি নাটক পর্য্যন্ত ধার নিয়ে ফিল্ম কোম্পানী বেঁচে আছে এবং তাঁদের মতে টাকা লুট ক'রছে অথচ থিয়েটার দিন দিন নির্জ্জীব হয়ে প'ড়ছে। তাঁরা কিছুই দেখ্‌লেন না, কিছুই করলেন না। বাঁচবার সাধারণ নিয়ম না মেনে শুধু—"মারা গেলাম" ব'লে চীৎকার করলে কি হবে? তাঁদের কাজ—কোন গতিকে একটী ধনী সংগ্রহ করা। যতদিন তিনি টিঁকে থাকেন—ভাল; তারপর তিনি যখন নিঃস্ব হ'ন, তখন আবার আর একটী নূতন ধনীর সন্ধানের আবশ্যক হয়। এইরূপে ধনীর পর ধনী হত্যা ক'রে বাংলার থিয়েটার চলে। এর মধ্যে কোন ধনীর আমলে দৈবক্রমে ২।৩ খানা নাটক যদি জ'মে যায়, সেই ধনী এবং সেই থিয়েটার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবি হয়। কিন্তু যে-সনাতন নিয়মে কোন প্রতিষ্ঠান জীবন্ত হয়, আজ পর্য্যন্ত এক প্রাচীন ষ্টার থিয়েটার ছাড়া বাংলার আর কোন রঙ্গালয়ে সে নিয়ম মানা হয়নি। থিয়েটারকে আজ বাঁচাতে পারে—নট ও নাট্যকার; তাঁরা যদি মিলতে পারেন, আমার বিশ্বাস ধনীর খুব-বেশী আবশ্যক হবেনা। ধনীরাও যদি এই কথাটী না বোঝেন, তাঁদের অর্থই ব্যয় হবে, কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে না! স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয় সমস্ত কর্ম্মশক্তির মূল উৎস। নটনটীগণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করুন।

নীতি ও চলচ্চিত্র

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

কিছুদিন আগে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'সুনীতি-সঙ্ঘ' বা ঐ ধরণের অন্য কোন নাম-ওলা সমিতির এক অধিবেশন হয়; সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—"মানব-মনের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব"। বিষয়-বস্তুটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও সভার আহ্বানকারী সমিতির নাম-ও স্থানমাহাত্ম্যে হাওয়াটা যে কোন্ মুখে বইবে, সেটা আগে থাক্‌তেই অনুমান ক'রে নিয়েছিলুম। এবং সেই কারণেই ধর্ম্মধ্বজীদের মনতূণ থেকে বাছা বাছা বিষাক্ত বাক্যবাণের আঘাতে বেচারা চলচ্চিত্র কি-ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে প্রাণ হারাবার যোগাড় করে, তা স্বকর্ণে শুনে একটি সন্ধ্যাকে মধুময় ক'রে তোলবার আগ্রহকে কোন মতেই দমন ক'রতে পারিনি।

ঐ সভায় সভাপতির পূর্ব্বে দু'জন ভদ্রলোক বক্তৃতা দেন। ব'লতে বাধা নেই, ধর্ম্ম ও নীতির কঙ্কালের চাপে প'ড়ে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য কতদূর বিকৃত হয়ে যেতে পারে, ঐ দুই ভদ্রলোকের অপূর্ব্ব বক্তিমা শোনবার আগে সে-বিষয়ে আমার রীতিমত ধারণা ছিল না। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে একজন বললেন—'বাল্যকালে কবে একদিন ক্ষণিকের জন্যে একটা অশ্লীল কথা শুনেছিলুম, আজও তার কথা মনে জাগে' এবং অপর ব্যক্তি শোনালেন—'বায়োস্কোপ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু পা সেদিকে ওঠে না; মনে হয়, আমার দৃষ্টান্তে যদি অপরের অনিষ্ট হয়।'—এঁদের মনের অসামান্য শুচিতার এ-হেন প্রচণ্ড নিদর্শন বিশ্বের সাধারণ স্বাভাবিক মানুষকে সচকিত ক'রে তোলে। দু'জনেরই বক্তৃতা সবটুকু উদ্ধৃত ক'রে দিলে পাঠকের পক্ষে জিনিষটা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠ্‌ত, সন্দেহ নেই; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তা' হ'ত অত্যন্ত অবান্তর।

কিন্তু সভাপতি মশায় এই ধর্ম্মের বাহন দু'টিকে প্রতি কথায় বিপর্য্যস্ত ক'রে সেদিন যা বলেছিলেন, তার মধ্যে নীতির নষ্টামির পরিবর্ত্তে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিচারবুদ্ধি বা Sanity of Thought-কে আমরা পেয়েছিলুম যথেষ্ট পরিমাণে। এবং তাঁর বক্তৃতার সারাংশকেই অবলম্বন ক'রে আমাদের আজকের আলোচনা। তিনি বলেন—'চলচ্চিত্র হ'লেই যে তা' দোষণীয়, এমন কথা আমি মনে করি না। "কো-ভেডিস্"-এর বিষয়-বস্তু বা "লা মিজারেবল"-এর বিভিন্ন আদর্শ চরিত্র আমাদের মনে বিমল আনন্দ দেয় এবং আমরা তা' দেখে সবিশেষ উপকৃত হই। মানবমনে যদি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার স্বাভাবিক পরিপূরণও দরকার। আমরা আনন্দ উপভোগ ক'রতে চাই; চলচ্চিত্র যদি স্বাভাবিকভাবে আমাদের সেই আনন্দ সরবরাহ করে, তা'হ'লে তাকে গ্রহণ ক'রতে ক্ষতি নেই। ভাল জিনিষ যারা উপভোগ ক'রতে পারেনা, যারা কিছু মন্দ না দেখলে খুশী হয় না, তাদের জন্যে যারা চলচ্চিত্রের ব্যবসা ক'রতে এসেছে, যারা কল্যাণের পসরা মাথায় নিয়ে আসেনি, তারা ছবির মধ্যে মন্দ জিনিষের অবতারণা করে, আসলকেও বিকৃত ক'রে দেখায়। দেহের নগ্নতা দেখেও আনন্দ পায়, এমন লোকেরও ত' অভাব নেই। কাজেই জিনিষের অপরাধ নয়, অপরাধ হচ্ছে চাহিদার। চলচ্চিত্র, অভিনয় প্রভৃতি জিনিষগুলো মানুষের পরম কল্যাণকর বস্তুরূপেই প্রথমে উদ্ভাবিত হয়েছিল; এদের মধ্যে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যাবার জিনিষেরও যে অভাব নেই, তা সৃষ্টিকর্ত্তারা ভাবেন নি। ... ... চলচ্চিত্রকে অনায়াসেই শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে—Bertrand Russel বলেন,—এমন দিন শীঘ্রই আসবে, যেদিন ইতিহাস-ভূগোল চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচারিত হবে। অভিনয় যদি যথাযথভাবে হয়, তা' হ'লে যে-সকল জিনিষের মীমাংসার জন্যে পণ্ডিতেরা দস্তুরমত মাথা ঘামান, তাদের অত্যন্ত সহজ মীমাংসা হয়। প্রতাপসিংহের জীবনীকে চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে প্রতাপের কথা ছেলেদের মাথায় পেরেক মেরে বসিয়ে দেওয়া যায়। ... ... অভিনয়কে আমরা লোকসমাজ থেকে দূরে ফেলে দিতে পারব না; কারণ ওর দ্বারা আমাদের শিক্ষা হয়, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন উন্নত হয়। সঙ্ বা অভিনয়কে যদি নিন্দা ক'রতে হয়, তা' হ'লে আদি-কবি হোমার, বাল্মীকি প্রভৃতিকে এর জন্যে অভিযুক্ত ক'রতে হবে। চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনয়কে সুন্দর, ভাল এবং মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকর করা সম্ভব, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।'—

প্রত্যেক শিল্পকলারই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবমনে আনন্দবিধান। কিন্তু মদ্যপানজনিত যে আনন্দ, তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়; কারণ তা' হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর; উপরন্তু তা' মানব-চিত্তকে আনন্দের ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত করে না। মদের যে আনন্দ, সে রসের আনন্দ নয়, সে হচ্ছে মাদকতার, জড়তার আনন্দ। অথচ আজকের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীগণ মানুষকে ঐ মদের আনন্দেই মাতাল ক'রতে ব্যস্ত। চিত্রনির্ম্মাতা যৌন-সম্পর্ক ছাড়া গল্পের বিষয়-বস্তু খুঁজে পান না; প্রকৃত আর্টকে সৃষ্টি ক'রে দর্শককে আনন্দরসে আপ্লুত করা যায় কি উপায়ে, তা' অন্বেষণ করবার জন্যে মস্তিষ্ক, সময় বা অর্থ—ব্যয় ক'রতে তাঁরা নারাজ। অতি সহজে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির ইন্ধন যুগিয়ে যদি অজস্র অর্থ আহরণ করা সম্ভব হয়, তবে তাঁরা অন্যপথ অবলম্বন করবেন কেন? তাঁরা যে ব্যবসায়ী; আনন্দকে বিক্রয় ক'রে তাঁরা লাভবান হ'তে চান; যত বেশী সস্তার জিনিষ যত বেশী চড়া দামে ছাড়তে পারা যায়, ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল। কাজেই তাঁরা যে মাত্র যৌন-নাটক বা Sex-drama নির্ম্মাণ ক'রতেই ব্যস্ত তা' নয়, সেই নাটকের মধ্যে যত রকমে সম্ভব Sex display ক'রে অর্থাৎ যৌন-প্রদর্শনী খুলে দর্শকের চোখে ও মনে লালসার আগুন জ্বালিয়ে তুলতেও অতি মাত্রায় তাঁরা যত্নবান। নারীর কুসুম-পেলব তনুলতার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে দর্শকের চোখের সামনে সুস্পষ্ট ক'রে উপস্থাপিত করবার সব ক'টি কৌশলকেই তাঁরা প্রয়োগ করেন ছবিকে অর্থলাভের দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে। বর্ত্তমানকালে দর্শক এমন একখানি আমেরিকান চিত্র দেখতে পাবেন না, যার মধ্যে চুম্বন বা আলিঙ্গন নেই। দর্শকও এই নেশায় এতদিন ভরপুর হয়েছিলেন। মদ খেয়ে যে মাতাল হয়ে রয়েছে, সে অমৃতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে কেন? কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন মাতাল আর মদ খেতে চায় না, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। আজ চলচ্চিত্রের দর্শকেরও সেই অবস্থা হয়েছে। The Cinemagoing public is fed up with Sex and it does not want to devour it any more—এই তথ্য চিত্র-নির্ম্মাতাদের মর্ম্মে প্রবেশ করেছে। প্রথম প্রথম পরিচালক মশাই ছবির মধ্যে অশ্লীলতার ইঙ্গিত যথাসম্ভব প্রবিষ্ট করিয়ে Sex-pictureকে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আমেরিকার উদার সেন্সরের নরম কাঁচির পক্ষেও তা' যথেষ্টই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কাজেই ছবি-সম্পাদনার সময়ে যখন ছবিকে পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়, তখন 'বস্'-কে এখানে-সেখানে থেকে থেকে ব'লে উঠ্‌তে হয়—'এ চলবে না; ওখানটা কাটতে হবে।' পরিচালক যখন মূঢ়ের মত প্রশ্ন করেন—'কেন? ওর মধ্যে অন্যায় ত' কিছু দেখছি না', তখন জবাব আসে—'আপনি না দেখতে পারেন, কিন্তু সেন্সরের কাঁচি ওকে কাটবেই কাটবে।' পরিচালক হতাশ হয়ে পড়েন;

বলেন—'তা' হ'লে আমরা করব কি? ছবি তৈরী করবার যত রকম মাল-মশলা ছিল, সবই ত' খরচ হয়ে গেছে। নতুন কিছু ত' আর দেখতে পাই না'।—বলা বাহুল্য, এই পরিচালককে শিল্পী বলা চলে না; তিনি নিজের আনন্দকে দশের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টি করেন না; তিনি হাটের মাঝে পাঁচজনের কাছে বেচবার জন্যে ছবিকে নির্মাণ করেন—জীবন্ত সৃষ্টি এক কাজ, আর নিষ্প্রাণ পেলেনা তৈরী হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য কাজ; দুইয়ের মাঝে আসমান-জমিন ফারাক্।

বিষয়-বস্তুর নূতনত্বের চাহিদা অসম্ভব রকম বেড়ে ওঠায় জন্ম হ'ল—ড্রাকুলা, ফ্রাঙ্কেন্‌স্টিন প্রভৃতি ভয়াবহ ছবির (horror picture-এর), ট্রেডার হর্ণ, আফ্রিকা স্পিক্‌স্ প্রভৃতি জঙ্গলে ছবির, ফ্লাগ্ লেফটেনান্ট, অল্ কোয়ায়েট প্রভৃতি যুদ্ধ ছবির। কিন্তু যে-জিনিষই একখানি ছবিকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়ে থাকুক না কেন, তার মধ্যে আমেরিকার চিত্র-পরিচালক একটি প্রেম-কাহিনীকে স্থান না দিয়ে স্থির থাকতে পারবেন না; কারণ, তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা Love এবং Romance-কে বাদ দিয়ে ছবি হ'তে পারে না এবং তা' যদি হয়, তা' হ'লে সে-ছবি ব্যবসার দিক থেকে মালিককে পথে বসিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ছবির রাজ্যে নাটকীয় উপকরণের এই সঙ্কীর্ণতা কেন? দর্শকের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দেবার জন্যে সেই একমাত্র মামুলী প্রেম ছাড়া আর কি অন্য বস্তু নেই? এবং সেই প্রেমের লীলাখেলা দেখানোকে উপলক্ষ্য ক'রে এমন দৃশ্য বা ঘটনার অবতারণা করা কি নিতান্তই আবশ্যক, যা দেখে দর্শকের দেহে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, শিরাউপশিরা স্ফীত হয়, পাশবিকতা দুর্দ্দমভাবে জাগর হ'তে চায়?—শিল্পকলার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই, এই ধূয়ো তুলে অনেকে মনকে আঁখ ঠারতে চান; কিন্তু সত্যিই কি তাই? মনের কৃষ্টি এবং নৈতিক উন্নতি-অবনতির জন্যে শিল্পকলা কি দায়ী নয়? শিল্পকলা প্রভাব বিস্তার করে কোথায়? মানব-মনের ওপর নয় কি? মানব-মনের আনন্দবিধানই শিল্পসৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য নয় কি?—মনের সুস্থতা ও আনন্দানুভূতির শক্তি তার নৈতিক উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে অনেকখানি এবং সেই কারণে আর্টের সঙ্গে নীতির নিকট-সম্পর্ককে গায়ের জোরে অস্বীকার করা যায় না।

নাট্য-কৌশলের ন্যায়সঙ্গত সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অমার্জ্জনীয় অপব্যবহারের মাঝে কোন্‌খানটিতে কোন্ সময়ে দাঁড়ি টানতে হয়, এই জিনিষটা অনেক শিল্পীর মনই আবিষ্কার ক'রতে ভুল করে এবং এই ভ্রান্তির জন্যেই তাদের সৃষ্টি হয় আগাগোড়া বিকৃত ও ব্যর্থ। নাটকের মধ্যে ভীতি-উৎপাদক বিষয়-বস্তুর ব্যবহার সম্বন্ধে অ্যাডিসন্ বহুদিন পূর্ব্বে যে-কথা লিখে গেছেন, তা' শিল্পীর ন্যায়-অন্যায়ের গণ্ডীজ্ঞানকে জাগ্রত করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। তিনি বলেন—"আমাদের থিয়েটারের দর্শকেরা আর কিছুতেই ততটা আনন্দ পায় না, যতটা আনন্দ পায় নাটকের মধ্যে ভূত দেখে ভয় পাবার মধ্যে, বিশেষ যদি সেই ভূত রক্তাক্ত পোষাকে আবির্ভূত হয়। মানুষের প্রতি ছুরিকাঘাত, বিষপ্রয়োগ, যন্ত্রণাদান বা শূলদণ্ড ইত্যাদি দেখে আনন্দ উপভোগ করা নিশ্চয়ই নির্দ্দয়তা ও চিত্ত-কাঠিন্যের পরিচায়ক; কিন্তু সেনেকা প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যকারেরা মানুষকে রক্তামোদী ক'রেই অঙ্কিত করেছেন। পূর্ব্বোক্ত নাট্যরীতির মধ্যে আমি কোন দোষ দেখতে পাই না, যদি তারা নাটকের ভিতর কৌশল সহকারে প্রযুক্ত হয় এবং তাদের সঙ্গে লেখার মধ্যে থাকে অনুরূপ ভাব, ভাষা ও অভিব্যক্তি। আমি রঙ্গমঞ্চ থেকে এই সকল চিত্তগ্রাহী যন্ত্রকে নির্ব্বাসিত করবার কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিই না; কারণ আমি জানি, ও-গুলো ছাড়া ট্রাজিডি টে'কতেই পারে না। আমি মাত্র এইটুকু চাই যে, এ-গুলোর যেন অপপ্রয়োগ না ঘটে; এই ধরণের ভীতিকর বস্তুর অবতারণার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবসর থাকা চাই। যখন নাটকীয়তার রস ঘনীভূতকারী সহায়করূপে এদের ব্যবহার করা হয়, তখন এদের ব্যবহার মাত্র ক্ষমারই যোগ্য নয়, প্রশংসালাভের যোগ্যও বটে।"—

নাটকের মধ্যে অবতারিত বস্তুর নাট্যরসসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবার এই যে অত্যাবশ্যকতার কথা অ্যাডিসন্ বলেছেন, এইটি চলচ্চিত্রক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হওয়া দরকার; কারণ মানুষের আনন্দবাহন হিসেবে চলচ্চিত্রের বিস্তার বহুদূরপ্রসারী এবং অন্য সকল শিল্পকলার তুলনায় ঢের বেশী। চলচ্চিত্রের আর্ট যাতে নীতি ও রুচিবিগর্হিত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবার আর এক কারণ, চিত্রপ্রিয়দের ভিতর শতকরা প্রায় ষাট-সত্তর জন হচ্ছে অপরিণতমতি যুবক-যুবতী এবং এর মধ্যে শিশু-দর্শকের সংখ্যাও বড় অল্প নয়।

আর্টের ক্ষেত্রে কয়েকজন দুর্ম্মতি অনুষ্ঠিত ব্যভিচারের ফলে মুস্কিল হয়েছে নিরীহ নাট্যকারের। কারণ, অধিকাংশ স্থলেই খোঁজ নিলে জানতে পারা যাবে, আসল জিনিষটা হয়ত' ভালই ছিল; অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীর কবলে প'ড়ে পাঁচ ভূতের দয়ায় তার রূপ দাঁড়িয়েছে বিকৃত। কিন্তু আইন অত বিচার ক'রে দেখবেনা; সে শেষ-ফল থেকেই নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নিচ্ছে এবং এক এক ক'রে নাট্যকারের তূণ থেকে অমোঘ অস্ত্রসমূহকে সরিয়ে নিজে সিন্দুকজাত করছে। ভাণ্ডার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ায় হৃত-সম্পদ নাট্যকার আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠছেন; শিল্পী নাট্যকার নিজের কলা-কৌশলকে সমর্থন ক'রে 'ছোট ডুমা'র ভাষায় ব'লতে চাইছেন—"It I can exercise some influence over society; if, instead of treating effects I can treat causes; if, for example, while I satirize and describe and dramatize adultery I can find means to force people to discuss the problem, and the law-maker to revise the law, I shall have done more than my duty as a poet, I shall have done my duty as a man."

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে এই মর্ম্মে বলেছিলেন যে, জগতে মানুষ যা-কিছু ভাবে বা করে, তা'কেই আর্টের বিষয়-বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; কারণ যা আর্ট, তা' সব সময়েই সুন্দর। যদি কোন জিনিষ প্রকৃত আর্ট বা রসবস্তু হয়ে থাকে, তখন তা' শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারের বাইরে গেছে; তখন লোকের দৃষ্টি তার কোন একটা বিশেষ স্থানে বা অংশে নিবদ্ধ থাকবে না, তার আনন্দোৎসারী সৌন্দর্য্যের সমগ্রতায় লোকের মন হয়ে থাকবে ভরপুর। কিন্তু পিছল পথে চ'লতে বিপদ আছে; পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। তাই বিশেষজ্ঞেরা আর্টের মধ্যে কতকগুলো জিনিষ নিয়ে সচরাচর নাড়াচাড়া ক'রতে নিষেধ করেছেন—অধিকারী-অনধিকারী ভেদের কথা তুলেছেন।—

সত্যিই, এই কথাটা সকল শ্রেণীর শিল্পীর মত চিত্র-পরিচালকেরও সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, "It is not always that matter matters much; what we are more concerned with is the manner of putting the thing"—বিষয়-বস্তুকে যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে রূপায়িত করা হয়, তারই ওপর সৃষ্টির সার্থকতা নির্ভর করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।—এবং মাত্র এইটুকু মনে রেখে চলতে পারলেই চিত্র-পরিচালকের বিরুদ্ধে নীতিবাগীশের নিষেধাঙ্গুলি সময়ে-অসময়ে উত্তোলিত হবার অবসর পাবে না।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৭ নং গ্রে ষ্ট্রীট ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ
৩৮-শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৩রা কার্ত্তিক,
১৩৪০

নাট্যজগৎ

Napoleonএর সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার কথা যতই ভাবি, ততই অবাক হতে হয়। আমাদের বিশ্বাস, একটি মাত্র যুদ্ধ জয় না করলেও আজ তিনি অমর হয়ে থাকতেন। তিনি শুধু সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন না, ছোটগল্প প্রভৃতিও রচনা করতে পারতেন। রণক্ষেত্রে মৃত্যু যখন জীবনকে নির্ম্মম আলিঙ্গন করছে, যুদ্ধের ফলাফলের উপরে যখন তাঁর বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে, তখনো তিনি কেবল লড়াই নিয়েই মাথা ঘামাতেন না,—রাজ্যচালনা করতেন, নূতন নূতন আইন রচনা করতেন, দেশের বালক-বালিকাদিগের জন্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। অতীত সভ্যতা আবিষ্কার করবার জন্যে পুরাতত্ত্ব নিয়ে য়ুরোপে প্রথম যে-কয়জন লোক মস্তিষ্কচালনা করেছিলেন, Napoleon হচ্ছেন তাঁদেরই একজন। তাঁর মিশর-অভিযানই এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। এবং ভূগর্ভ থেকে পম্পি সহরকে পুনরুদ্ধার করবার প্রথম গৌরব অর্জ্জন করেছেন তিনিই। একদিকে মনকে নিযুক্ত রেখেও তাঁর রঙ্গালয়ের কথাও চিন্তা করবার অবসর ছিল। তিনি সময় পেলে সাগ্রহে অভিনয় দেখতে তো যেতেনই, তার উপরে তাঁর নাট্যপ্রীতির অন্য একটু উজ্জ্বল প্রমাণও আছে। রুসিয়ার রণক্ষেত্রে যখন তিনি আত্মরক্ষা করতেই ব্যতিব্যস্ত, তখনো দেখি মস্কোর নগর-প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে Napoleon সুদূর প্যারি-সহরে অভিনয়-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা-পত্রে সই করছেন! আশ্চর্য্য মানুষ, তাঁর জোড়া নেই!

This Week of Grace চিত্রে
Gracie Field.

গেল সংখ্যার 'নাচঘরে' চন্দ্রশেখর "সিনেমার আর্ট" নিয়ে আলোচনা করেছেন। হ্যাঁ, এখনকার 'সিনেমা' যে শ্রেণীবিশেষের আর্ট, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু 'সিনেমা'য় যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা যে খুব উঁচু-দরের কলাবিদ, এ-কথা বিশেষ জোর ক'রে বলা চলে না। তাঁদের আত্মপ্রকাশে ধারাবাহিকতা নেই, পরিচালকের হুকুমে আজ হয়তো তাঁরা ছবির শেষ অংশে, কাল প্রথম অংশে, পরশু মাঝের অংশে অভিনয় করেন। তাঁদের আর্টে সমগ্রতা নেই। 'সিনেমা'য় বড় কলাবিদ বলা চলে তাঁকেই, ছবিতে যিনি সমগ্রতা দেন, অর্থাৎ পরিচালক।

*

চন্দ্রশেখর বলছেন, 'কথার পর কথা সাজিয়ে ষ্টেজের অভিনেতাকে দর্শকদের মানসপটে যে ছবি আঁকতে হয় সিনেমায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শকরা তা চোখের সামনে দেখতে পান।" কিন্তু এজন্যে মঞ্চের আর্টের চেয়ে যে পর্দ্দার আর্টকে বড় ব'লে মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই। এবং এখানেও পর্দ্দার শিল্পীদের চেয়ে মঞ্চের শিল্পীদের শ্রেষ্ঠতাই প্রমাণিত হচ্ছে। যিনি কেবল কথার সাহায্যেই রসিকদের মনে আসল ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতর শিল্পী, আর্টের ক্ষেত্রে তাঁর মর্য্যাদাই বেশী। সীমার মধ্যে থেকেও সীমাহীনকে দেখানোই বড় কলাবিদের কার্য্য।

*

ফ্রান্সের গত-যুগের সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা C. Coquelinএর "The Art of the Actor" পুস্তকের নব-প্রকাশিত অনুবাদে ভূমিকা-লেখক বলছেন:

"বিখ্যাত অভিনেতা Mounet Sully যখন Thebes-এর মন্দির-দৃশ্যে মাত্র তাঁর প্রথম কথা—"Enfants"—উচ্চারণ করতেন, তখনি মড়কে আক্রান্ত হতভাগ্যদের সমস্ত যন্ত্রণার ভাব শ্রোতাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেত। Reinhardt এই দৃশ্যটিকেই পরে নানা কৌশলে জমকালো ক'রে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অভিনেতার কণ্ঠস্বরের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন।"

*

পাশ্চাত্য সমালোচকরাও স্বীকার করেন যে, সেকালে যাঁরা দৃশ্যপটের সাহায্য না নিয়েও বা কুঅঙ্কিত, অস্বাভাবিক দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়ে কেবল কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শ্রোতাদের মনে আসল ভাব ও বাস্তবতার রূপটি ফুটিয়ে তুলতেন, এখনকার পরম স্বাভাবিক মঞ্চের অভিনেতাদের চেয়ে তাঁরা ছিলেন ঢের-বেশী শক্তিধর শিল্পী। অভিনয় হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাব ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের আর্ট—তা চিত্রকরের কিংবা 'ফোটোগ্রাফারে'র আর্ট নয় এবং চোখের সামনে যার স্পষ্ট বাস্তব রূপ দেখতে পাব, তাকেই যদি আমরা বড় আর্ট ব'লে মানি, তবে বাস্তব জগৎ ছেড়ে আমরা কলাবিদের কাছে যাব কেন? বাস্তব প্রকৃতি আমাদের সামনেই রয়েছে, তাকে তো কেউ আর্ট বলে না! সুতরাং এক্ষেত্রে 'সিনেমা'র বাহাদুরি থাকলেও আর্ট হিসাবে সে উচ্চতর প্রশংসার দাবি করতে পারে না।

*

কণ্ঠস্বরের শক্তি কত, পোল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী Modjeska একবার তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়ে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে পোলিশ ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরেজ দর্শকদের কাছে একবার তিনি যা আবৃত্তি করেছিলেন, তা গদ্য বা কবিতা নয়, পোল্যাণ্ডের পাটীগণিতের সংখ্যা! প্রথমে তিনি কমেডির সুরে এমন ভাবে সুরু করলেন যে দর্শকরা হাসতে লাগল! তারপর আকাশের দিকে করুণ ভাবে চোখ তুলে, রুমাল বার ক'রে হঠাৎ তিনি ট্র্যাজেডির সুর ও ভঙ্গি ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও দুঃখের ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল!

*

নিছক অভিনয়-কলার দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, বাস্তবতাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে আমরা ক্রমেই বেশী গরিব হয়ে পড়ছি। বিজ্ঞানের সাহায্য পেয়ে এবং অব্যবহারের ফলে আধুনিক মানব যেমন আদিম মানবের অনেক শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আলোক-শিল্প, চিত্রশিল্প ও যন্ত্রশিল্প প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে অভিনেতাও তেমনি নিজের আত্মপ্রকাশক্ষমতাকে ক্রমেই অধিক সংকীর্ণ ক'রে আনছে। যে-সব দর্শকের উপভোগ-শক্তি স্থূল, এর ফলে হয়তো তাদের লাভ হচ্ছে বেশী (যে-কারণে থিয়েটারের চেয়ে সিনেমা অধিকতর জনপ্রিয়), কিন্তু সূক্ষ্মরসের রসিকরা নিশ্চয়ই ষোলআনা উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরন্তু, এর ফলে দর্শকদের গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত কল্পনা ও ধারণা শক্তিও যে ব্যবহারের অভাবে ক্রমেই ক'মে আসছে না, এমনও বলতে পারি না। ফরাসী অভিনেতা Got, কেবল অভিনয়-গুণে যে কোন নীরস ভূমিকাকে সরস ক'রে তুলতে পারতেন। একটি ভূমিকায় তাঁকে সাত মিনিট ধ'রে একটানা কথা কইতে হ'ত এবং সে কথাও রসের কথা নয়, কতকগুলো নাম ও কাজের ফর্দ মাত্র! কিন্তু তাঁর সেই সাতমিনিটকালব্যাপী শুষ্ক বক্তৃতাও শ্রোতাদের কানে গানের মতন মিষ্টি লাগত এবং সেই দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে করতালি ও প্রশংসাধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত! আধুনিক প্রয়োগকর্তারা অভিনয়ের মধ্যে এমন দীর্ঘ বক্তৃতা রাখতে চাইবেন না, কারণ তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ব্যাপারকেও যিনি নিজের [illegible] গুণে স্বাভাবিক ক'রে তুলে দর্শকদের অধীর হয়ে ওঠবার অবকাশ দেন [illegible] তাঁর কলানিপুণতার কাছে তথাকথিত স্বাভাবিকতাও কি তুচ্ছ নয়?

*

অভিনয়-জগতের স্বাভাবিকতা, আলোকপাতকৌশল, দৃশ্যপট বা মঞ্চশিল্পের ভিতর থেকে আসে-নি, স্বাভাবিকতা আসে অভিনেতাদের প্রতিভা, অনুভূতি ও প্রকাশ-ক্ষমতার ভিতর থেকে। জাপানী "নো" নাটকের এক প্রাচীন অভিনেতা একদিন দেখলেন, রাজপথ দিয়ে জনৈক বৃদ্ধা যাচ্ছে এবং তার পিছনে পিছনে চলেছে তাঁর ছেলে, বৃদ্ধারই ভাবভঙ্গী নকল করতে করতে। ছেলেকে ডেকে তিনি সুধোলেন, "তুমি কি করচ বাবা?" ছেলে জবাব দিলে, "বুড়ীর ভূমিকায় আমি স্বাভাবিক অভিনয় করতে শিখচি।" বাপ বললেন, "তা'হলে তুমি কোনকালেই 'নো' নাটকে অভিনয় করতে পারবে না। তুমি যে বুড়ো এটা তোমাকে মনের ভিতরেই অনুভব করতে হবে, তবেই তুমি বাইরেও সত্যি-সত্যি বুড়ো হ'তে পারবে।"

*

মনই হচ্ছে শিল্পীর সর্ব্বস্ব। কাব্যের জন্যে কবি, ছবির জন্যে চিত্রকর, ভাস্কর্য্যের জন্যে ভাস্কর যথাক্রমে কেবল তাঁদের হাত ও কলম, তুলি ও বাটালির উপরেই নির্ভর করেন না, হাতের ঐ সব উপকরণের সাহায্যে নব নব সৃষ্টি করে একমাত্র তাঁদের মনই। দৃশ্যপট বা সাজপোষাক প্রভৃতির উপরে নয়, অভিনেতাকেও নির্ভর করতে হবে তাঁর নিজের মনের উপরেই। বহুরূপী-বিদ্যার গুণে তিনি পরম স্বাভাবিক রাম বা রাবণ সাজতে পারেন, মঞ্চশিল্পী তাঁর চারিপাশে অযোধ্যা বা স্বর্ণলঙ্কার পরম স্বাভাবিক দৃশ্যের সমারোহ দেখাতে পারেন এবং দর্শকদের দৃষ্টিও সে-সব দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতন হ'তে পারে; কিন্তু আসল রাম বা রাবণকে জ্যান্ত ক'রে তুলবে, আসল অযোধ্যা বা লঙ্কাপুরীর আবেষ্টন সৃষ্টি করবে এবং কেবল দর্শকদের চোখের উপরে নয়—মনের ভিতরে অযোধ্যাবাসী সত্য রাম বা লঙ্কাবাসী সত্য রাবণকে যে জাগ্রৎ করবে, সে হচ্ছে অভিনেতার মন, শিল্পীর ক্রীড়াশীল মন। যেখানে অভিনেতার এই স্বাধীন ও সচেতন মনের অভাব, সেখানে যে-কোনরকম কলাকৌশলে, দৃশ্যপট বা সাজপোষাকের নিখুঁৎ বাস্তবতাও জীবনহীন ও অসার ব'লে মনে হবে।

*

আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনয়ের আদর্শ দিনে দিনে নেমে যাচ্ছে। এখানে নূতন দল যখন প্রথমে [illegible] প্রকাশ করেন, তখন এ-রকম অভিযোগ করবার কারণ ছিল না। [illegible] বিভিন্ন রঙ্গালয়ে এখনকার চেয়ে ভালো-ভাবে অভিনয়-শিক্ষা দেবার চেষ্টা হ'ত। এবং সেই কারণেই তখন অল্পকালের ভিতরেই বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে অনেকগুলি শক্তিধর অভিনেতার পরিচয় সাধনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন গেছে। বাংলা রঙ্গালয়ের বাবুদের এখন ভালো ক'রে মহলা দেবারই সময় নেই, অভিনয় শিক্ষা দেবে কে? কাজেই বারো-চোদ্দ বৎসর আগে যাঁরা আসরে নেমে নাম কিনে-ছিলেন, তাঁরাই এখনো তাঁদের সেই পুরাণো নাম বাজিয়ে আসর রাখবার চেষ্টা করছেন।

*

তাঁরা নামজাদা হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের নামের টানে আগে যত লোক থিয়েটার দেখতে আসত, তত লোক এখন আর আসছে না। তাঁদের ভাবভঙ্গি, 'ষ্টাইল' ও মুদ্রাদোষ আজ অতি-পরিচিত ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, তাই তাঁরা চেষ্টা ক'রেও আর নতুন রসের খোরাক্

জোগাতে পারছেন না। তাই আজ তাঁদের খুব-চেনা মুখগুলির আশে-পাশে আজ এমন সব উল্লেখযোগ্য অচেনা নতুন মুখের দরকার হয়েছে, মঞ্চের উপরে আবার যাঁরা বিচিত্রকে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কেবল যে ভালো নাটকের অভাবেই বাংলা রঙ্গালয়ের জনতা ক'মে গেছে, তা নয়; "নূতন রক্তে"র অভাবেও বটে।

কিন্তু নূতন লোক তৈরি করবে কে? বাংলা রঙ্গালয়ে এখন যাঁরা অভিনয় শিক্ষা দেবার সুযোগ বা সময় পান না, কিন্তু শেখাবার ক্ষমতা যাঁদের আছে, তাঁরা অনেকেই শিক্ষা দেন বাঁধা-ধরা সেকেলে উপায়ে। "The defect of the Conservatoire method was to give the impression at there was a certain secret of style and interpretation which was handed on by a teacher and impressed upon a pupil, and which consisted almost altogether of tricks; tricks of voice, tricks of movement, above all tricks of usiness—the most dangerous snare of the accomplished actor."

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অধিকাংশ ছাত্রকে দেখলেই উপরের কথাগুলির স্পষ্টতর হবে। শিশিরকুমারের নিজস্ব ভঙ্গি ও মুদ্রাদোষই তাঁদের অভিনয়ে যত্র তত্র। কিন্তু গত যুগের শিল্পী হয়েও গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষা দিতেন ভিন্ন উপায়ে। তাঁদের ছাত্ররা ভালো মন্দ মাঝারি অভিনয় করতেন, কিন্তু কারুর অভিনয়ের ভিতর থেকেই গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখতে পাওয়া যেত না। শিষ্যরা সর্ব্বাগ্রে আত্মসাৎ ক'রে বসে গুরুর মুদ্রাদোষগুলিই; কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় এতটা স্বাভাবিক ছিল যে, তার মধ্যে মুদ্রাদোষ একরকম পাওয়াই যেত না।

*

সহযোগী "নবশক্তি"র অকাল-মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হয়েছি। পাঁচমিশেলী লেখায় সাজানো একখানি ভদ্র সাপ্তাহিক পত্র পাঠের সুযোগ থেকে বাঙালী পাঠকরা বঞ্চিত হলেন তো বটেই, তার উপরে বাংলা দেশে যে দুই-তিনজন নাট্য-সমালোচকের সহজবুদ্ধি ও শিষ্টতাজ্ঞান আছে, "নবশক্তি"র চন্দ্রশেখর ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমরা তাঁর অভাব বোধ করব।

*

এবারের পূজোয় কয়েকখানিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের 'শারদীয় সংখ্যা' যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হয়েছে।··· ··· ··· অনেক কাল আগে থেকেই "বঙ্গবাসী", "হিতবাদী" ও "বসুমতী" প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি পূজোর সময়ে একটু বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করত বটে, কিন্তু সাধারণ সংবাদ-পত্রের আসর হচ্ছে ভিন্ন আসর। সাহিত্য-পত্রের আসরে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ "শারদীয় সংখ্যা" সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন কে? বোধ হয় অধুনালুপ্ত "মানসী"। তারপর অন্যান্য মাসিকপত্রও "মানসী"র পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এখনকার মাসিক সাহিত্য-জগতে তেমনধারা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করবার উৎসাহ আর দেখি না, কিন্তু তার সাড়া জাগে এখন সাপ্তাহিক সাহিত্য-জগতে। এখানকার অতি-উৎসাহের জোয়ারে পাঠকরা সানন্দে গা-ভাসান্ দেন বটে, কিন্তু অ-মূল্য সম্পাদকীয় অনুরোধে সুপরিচিত লেখকদের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হয় যে কতখানি, বাইরের সবাই তো সে খবরটা রাখেন না!

বাংলা রঙ্গালয়ে উল্লেখযোগ্য নূতন কোন ঘটনাই ঘটে নি—তাই নূতন কোন খবর দেবারও উপায় নেই

গান

(শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ)

প্রজাপতি তোর পাখ্‌না মেলে
বেড়াস্ ঘুরে ঘুরে!
আমার মনটি ভরিস্ সুরে!
আমার ভুল ক'রে দিস্ কাজের মেলা,
দূর ক'রে দিস্ প্রাণের খেলা,
আমার হারানো দিন ফিরিয়ে আনিস্
হারিয়েছি যা দূরে।

প্রজাপতি তোর কেমন খেলা
এ ফুলে ও-ফুলে?
প্রেমে কি তোর ঘোর লাগেনা,
রং ধরেনা মূলে?
প্রজাপতি তোর লজ্জা কি নেই?
নেই ধীরতা তোর প্রণয়েই?
এখান থেকে মধু লুটে
সেথানে যাস্ উড়ে!

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়: (১) The Story of Temple Drake

(প্যারামাউণ্ট্)

শ্রেষ্ঠাংশে—মিরিয়ম্ হপকিন্স্ ও জ্যাক্ লারু।

টেম্পল্ ড্রেক্ নাম্নী একটি adventure-প্রিয় মেয়ের বিচিত্র জীবন-চিত্র। মেয়েটির অনন্যসাধারণ চরিত্রের মধ্যে একদিকে আছে শান্ত সমাহিত কল্যাণী মূর্ত্তি; অপরদিকে, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিণী! এই তুইটি পরস্পর বিরোধী অভিব্যক্তির সংঘাতে টেম্পল্ ড্রেকের জীবন অনুক্ষণ আলোড়িত হয়েছে। তার পিতামহ তাকে আদর্শবাদী যুবক ষ্টিফেন্ বেন্বো-কে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেন। তার অনিচ্ছা যে ছিল, তা ও নয়। তবুও টেম্পল ড্রেক্ বেন্বো-কে প্রত্যাখ্যান করলে।

*

টডি গোয়ান—মদপায়ী ছাত্র, তারই সঙ্গে টেম্পল ড্রেক্ বেড়াতে বার হ'ল। নির্জ্জন গ্রাম্যপথে তাদের মোটর গেল ভেঙে,—পথের উপর উঠে দাঁড়িয়ে তারা দেখলে, সুমুখে তাঁদের কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে—ট্রিগার,—এক অতিশয় ভীষণ চরিত্রের লোক!

ট্রিগারের আদেশে তাদের এক স্থানীয় বদমায়েসের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

*

সেইখানে টেম্পল্ কয়েকটি দুর্ব্বৃত্ত লোকের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। তাদের মধ্যে একজন, তার নাম টমি, সে মেয়েটিকে এদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার সঙ্কল্প করলে। গোয়ানকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। টমি টেম্পল্কে পাহারা দিতে লাগ্লো। সকাল বেলা ট্রিগার টমিকে মেয়েটির সঙ্গে দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে টমিকে হত্যা করলে এবং টেম্পল্কে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা বাড়ীতে রাখলে। টেম্পল তখন ট্রিগারের সাহস, বুদ্ধি এবং দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছে।

গুড্উইন্ নামে দলের আর একজনকে টমির হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বেন্বো তার সপক্ষে উকিল নিযুক্ত হ'ল। সে জানতে পারলে, এই ব্যাপারের পিছনে আছে ট্রিগার। সে তখন ট্রিগারকে খুঁজে বার করলে এবং দেখলে তার সঙ্গে টেম্পল্ রয়েছে। বেন্বোকে দেখে ট্রিগার তার পকেটে হাত দিলে—উদ্দেশ্য, পকেট থেকে পিস্তল বার ক'রে সে বেন্বোকে হত্যা করবে। টেম্পল্ তা দেখতে পেলে এবং দেখতে পেয়ে বেন্বো-কে বাঁচাবার জন্যে এক বিচিত্র উপায় অবলম্বন করলে—সে বেন্বোর সুমুখেই ট্রিগারের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল এবং বেন্বোকে প্রত্যাখ্যান করল। তাই দেখে ট্রিগার খুসী হ'য়ে বেন্বোকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিলে।

*

বেন্বো চলে যাবার পর টেম্পল উঠে দাঁড়ালো—তার অন্তর কী এক বিচিত্র অনুভূতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, ট্রিগারের মুখের দিকে তাকাতেও তার ঘৃণা বোধ হচ্ছে! সে ট্রিগারের আশ্রয় পরিত্যাগ করবে—এই মুহূর্ত্তে! ট্রিগার বাধা দিলে। কিন্তু সে যাবেই। অনন্যোপায় হ'য়ে টেম্পল্ ট্রিগারকে হত্যা করলে।

তারপর এক উত্তেজনাপূর্ণ বিচার-দৃশ্যের মধ্যে এই ঘটনাবহুল মেলোড্রামার যবনিকা নেমে এলো। ছবিখানিতে মিরিয়ম হপকিন্সের অভিনয় খুব উঁচুদরের হয়েছে। বিখ্যাত ডিরেক্টার আর্নেষ্ট্ লুবিশ এই অভিনেত্রীর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, এই ছবিতে তা অনেক অংশে সফল হয়েছে। ছবিখানি এই সপ্তাহে স্থানীয় এল্ফিনষ্টোন পিক্চার প্যালেসে দেখানো হবে।

(২) Suicide Fleet

(রেডিও পিক্চার্স)

প্রধান ভূমিকায়—রবার্ট আর্মষ্ট্রং ও জিন্জার রজার্স।

এই হপ্তায় ম্যা থিয়েটারে দেখানো সুরু

*

Suicide fleet-এর গল্পাংশ গত মহাযুদ্ধের সময়কার একটি ভীষণ লোকক্ষয়কর জলযুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে। এই যুদ্ধকাহিনীর মধ্যে যে তিনজন সৈনিক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে তাদের নাম—ব্যাল্টিমোর, ডাচ্ এবং স্কীটস্। তিনজনেই তারা স্যালি নাম্নী একটি তরুণী মেয়েকে ভালবাসে। স্যালির অন্তর ব্যাল্টিমোরের প্রতি অবনমিত।

যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণগণ একখানি রহস্য-রণতরী দিয়ে বহু অনিষ্ট সাধন করছিল। এই সৈনিকদের একখানি যুদ্ধ-জাহাজ-এর ভার দিয়ে আদেশ করা হ'ল—সেই রহস্যরণপোতকে খুঁজে বার করতে। ছবির এই স্থানে একটি রোমাঞ্চকর জলযুদ্ধের দৃশ্য আছে। তখন ব্যাল্টিমোরের প্রতি আদেশ হ'ল ঠিক যে-স্থানে জার্ম্মাণ-রহস্য-রণতরীকে ধ্বংশ করা হয়েছে, সেই স্থানে সে একখানি জাহাজ নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করুক—শত্রুদের সাব্মেরীন নিশ্চয় তার জাহাজকে আক্রমণ করবে, তখন সেই সাবমেরীণ-চালকদের কাছ থেকে যাতে আরও সংবাদাদি পাওয়া যায়—সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ব্যাল্টিমোর, ডাচ্ ও স্কীটস্—তিনজনে সেই মহা বিপদ-সঙ্কুল পাহারায় নিয়োজিত হ'ল—নিশ্চিৎ মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে তারা প্রস্তুত, তাই তাদের নাম হ'ল—Suicide fleet!

ভীষণ যুদ্ধ বাধ্লো—মৃত্যু সুনিশ্চিৎ! সেই আসন্ন মরণকালে ব্যাল্টিমোর

শুনলে স্বালি তাকেই ভালবাসে! সেই যুদ্ধের সময় যদি না স্বপক্ষের সাহায্যকারী রণতরীগুলি ঠিক সময়ে এসে প'ড়ত তাহলে এদের কেউই জীবিত থাকতো না।

এই ছবিতে ৫৫ লক্ষ ডলার মূল্যের রণতরী সম্পর্কীয় জিনিস-পত্র ব্যবহার করা হয়েছে! পাঁচ হাজার অফিসার এবং সেনানী এই ছবিতে কাজ করেছে। তাছাড়া আমেরিকার একটি সম্পূর্ণ fleet! জলযুদ্ধের যে বাস্তব-সদৃশ্য দৃশ্যগুলি এই ছবিতে আছে তা সত্যিই বিস্ময়কর!

•

ছায়াছবির মর্ম্মকথা—আমরা মনে করি,আমেরিকার ফিল্ম শিল্প অভাবিত এবং বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে, উক্ত দেশের উক্ত শিল্পের মহাজনেরা যত অর্থ উপার্জ্জন করেছে তা অন্য দেশে কল্পনাও করা যায় না, ফিল্ম-ব্যবসায়ে যত অর্থাগম হয়, তার সিকির সিকিও অন্য ব্যবসায়ে হয় না, আমেরিকার ফিল্ম শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পাঠকবর্গ শুনে বিস্মিত হবেন, ও-দেশের যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাদের মত সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমেরিকার ফিল্ম-শিল্প বর্ত্তমানে যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তা শিল্প এবং অর্থ কোন দিক থেকেই আশাপ্রদ নয়—এই তাঁদের মত। এবং যদি এই অবস্থার আশু প্রতিকার করা না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যা কল্পনা করতেও ভয় লাগে। আর্নেষ্ট্ লুবিশ্, মারভিন লি রয়, ফ্রাঙ্ক্ বোরজাজ্ এবং সিসিল, বি, ডি, মিলি—আমেরিকার ফিল্ম-জগতে এদের নাম এবং দান যে কতখানি তা আজ আর কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না। এঁরা সম্প্রতি স্বদেশের ফিল্ম-শিল্প সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলি এই সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হ'ল। পাঠকবর্গ লক্ষ্য করবেন, দোষ দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও দিয়েছেন। ফিল্ম-শিল্পসম্বন্ধে এঁদের চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বোধ করি খুব কমই আছে। সুতরাং এঁদের মতামতগুলি যে কম-দামী নয়, তা বলাই বাহুল্য!

আর্নেষ্ট্ লুবিশ্ বলেন—আজকের ছবির মধ্যে যে নানারকমের দোষ দেখা যাচ্ছে তার মূলে আছে, Czaristic dictatorship, which gave into the hands of five men the power to determine what One hundred and twenty million people shall see on the Screen! আর একটি দোষণীয় ব্যবস্থা হচ্ছে—বড় লেখককে একটি গল্প রচনা করার কাজে নিযুক্ত করা! (বাস্তবিকই অতিশয় মন্দ ব্যবস্থা) এমনি-ধারা গল্প-রচনায় না থাকে কোন চিন্তাশীলতার পরিচয়, না থাকে কোন স্বচ্ছন্দ সহজ ক্রমবিকাশ, না কোন স্থায়সঙ্গত চরিত্রাঙ্কন, না বা অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেদন। তাছাড়া, তত্ত্বাবধান-প্রণালীর মধ্যেও দোষ আছে। যে ডিরেক্টার বার বার নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, তার উপর আবার তত্ত্বাবধান কেন? নতুন যারা, তাদের পরে সে-কাজ চলুক। তাছাড়া, এখনকার প্রধান আফশোষের কথা হচ্ছে এই যে যে-সব ছবিতে সস্তা আবেদন নেই, অর্থাৎ যে-ছবিকে আমরা artistic ছবি বলি, সে-ছবিগুলি তেমন অর্থ উপায় করতে পারে না। Cavalcade-এর মতো, বা Man I Killed-এর মতো ছবি তোলা এখন দুঃসাহসের কাজ। আশা করা যায়, যারা নবাগত তারা আর্টকে আদর করবে এবং তার জন্যে পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

•

Frank Borzage বলেন—Motion Pictures need a damn good house cleaning! ছবি প্রস্তুত করা সম্পর্কে তিনি বলেন, একটা Standardised method of Production কখনো চিরদিনের জন্যে ধার্য্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া, তিনিও বর্ত্তমানের তত্ত্বাবধান-প্রণালীর প্রতি সন্তুষ্ট নন। যাদের পরে এই কাজের ভার আছে তাদের না আছে বুদ্ধি, না বা দূরদৃষ্টি। তারা হয়ত একটি চমৎকার effective দৃশ্যকে বর্জ্জন করলে, কারণ কি?—না, বহুদিন আগে কর্ত্তামশায় এই ধরণের একটি দৃশ্যকে নাকচ্ ক'রে দিয়েছিলেন! সে ছবির সঙ্গে এ ছবির এবং সে-দৃশ্যের সঙ্গে এ-দৃশ্যের যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকতে পারে সে অন্তর্দৃষ্টি তাদের নেই। তাঁর মতে, ছবি-তোলা কাজের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি লোকের উপর সমস্ত ভার এবং দায়িত্ব থাকবে—তিনি হচ্ছেন, পরিচালক (ডিরেক্টার); প্রযোজক বা কোম্পানীর মালিক নয়।

•

সিসিল, বি, ডি, মিলি বলেন—যারা যথার্থ গুণী তাদের বাদ দিয়ে এখন চলচ্চিত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, অপরিচিতের দল, টাকা-ওয়ালার দল, ব্যবসায়ীর দল,—যারা না জানে জনসাধারণের মনের গতি, না বোঝে ষ্টুডিওর আভ্যন্তরিক সমস্যার গভীরতা! পরিচালকের সঙ্গে এক কথা পরামর্শ না করেই ইচ্ছামতো একটি গল্প নির্দ্ধারিত ক'রে দেওয়া হ'ল এবং ভাল হ'ক মন্দ হোক সেই গল্পকেই ছবির পর্দ্দায় রূপান্তরিত করতে আদেশ করা হ'ল—এই যে ব্যবস্থা, এ-ব্যবস্থায় কোন বড় কাজ সাধিত হ'তে পারে না। আজকাল ছবির অভিনেতৃ এবং কর্ম্মীরা প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাহিনা পায় এবং একটি ছবির জন্যে যত অর্থ ব্যয় করা হয় তার অর্দ্ধেক অর্থও তারা উপার্জ্জন করতে পারে না। সুদীর্ঘ

তেরো বছর মিলি কোন ষ্টুডিও থেকে মাহিনা পান নি—বিক্রির অংশের ওপর তাঁকে ভাগ দেওয়া হ'ত। তাঁর মতে, অভিনেতৃদের জনপ্রিয়তা অনুসারে তাদের মাহিনা দেওয়া উচিং, যে হারে তারা অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে, সেই হারে তাদের মাহিনা দেওয়া হবে। অযথা-খরচ কম করা একান্ত আবশ্যক। ভূমিকা বিতরণ করার ভার যাদের ওপর আছে সেই পরিষদের বিশেষ উন্নতি দরকার। নতুন নতুন প্রতিভাদের অনেক সময়ে অবকাশ দেওয়া হয় না। যারা খ্যাতনামা তাদের অনেক সময় অনেক বেখাপ্পা ভূমিকায় নামানো হয়। এ সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। একটি ছবির দোষের জন্যে সব ভার চাপানো হয়, যারা ষ্টুডিওয় কাজ করেছে তাদের ওপর। অন্যায়। যারা ছবির distributor অর্থাৎ বাজারে ছবিখানি চালাবার ভার যাদের পরে, তাদেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে। এই দুই বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং মিল থাকা চাই। Distributorগণ অনেক সময়ে এক মারাত্মক ভুল করেন—একখানি ছবির সাফল্য নিরীক্ষণ করে তাঁরা প্রযোজকদের ঠিক সেই রকম আরও ছবি তোলবার জন্যে তাগাদা করেন। এ কথা তাঁরা বোঝেন না যে, সাধারণের রুচি নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। একখানি ছবি একসময়ে তাদের ভাল লেগেছে ব'লে বার বার সেই একই ধরণের ছবি যে তাদের কাছে ভাল লাগবেই—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে বিক্রেতাগণ বর্ত্তমানের পুঁজিকেই ভাঙিয়ে খেতে চান। তা হয় না।

*

মারভিন লি রয় বলেন—আজকালকার গল্পলেখক, অভিনেতা, পরিচালক, সংখ্যায় তারা দিন দিন বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তাদের প্রাণহীনতা, কৃত্রিমতা এবং মেকানিক্যাল্ ভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করবার দীনতা! Footage means nothing—Feeling everything! যে গল্পটিকে ক্যামেরায় গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ এবং সহানুভূতি-পূর্ণ গতি থাকা চাই—অভিনেতা এবং পরিচালকগণের গল্পটিকে নিজেদের প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া চাই, যাতে করে তারা নিজেদের আবেগ, নিজেদের বিশ্বাস এবং দরদ সহজ স্বাভাবিক ভাবে দর্শকদের মনে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে,—তবেই সে ছবি সাফল্য অর্জ্জন করবে। সত্যিকারের জীবনকে ছবির পরদায় প্রতিফলিত কর (মেকী জীবন নয়, অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিত জীবন নয়)—তোমার কাজের সাফল্য ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ছবির শিল্পনৈপুণ্য অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করবে—যদি আমরা তার মহলায় এবং আয়োজনে অধিকতর সময় ব্যয় করি। সংখ্যায় ছবি প্রস্তুত হ'ক অল্প—কিন্তু তারা যাতে ভালো হয় সেদিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হ'ক! আজকাল ডায়ালগের (কথোপকথন) উপর অত্যন্ত কম নজর দেওয়া হয়। আমি যদি ছবির মালিক হতাম, তাহলে আমি কখনই এমন পরিচালক নিযুক্ত করতাম না যিনি কথার মূল্য বোঝেন না। It is the basic feature of a great picture! এক লাইনের দ্বারা সমস্ত প্রযোজনা মাটি হ'তে পারে—এমনি এর মূল্য! প্রযোজকদের এবং পরিচালকদের ছবির কথোপকথনের দিকে অধিকতর অবহিত হ'তে অনুরোধ করি।

*

রূপবাণীতে এই সপ্তাহ থেকে Universal-এর Out all nignt নামক ছবিখানি দেখানো হবে। Slim Summerville এবং Zasu Pitts—এই দুজন নামকরা অভিনেতৃ এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। সুতরাং ছবিখানি যে রুচিকর হবে, এমন আশা করা অসঙ্গত হবে না।

গান

(শ্রীঅখিল নিয়োগী)

বাহুর মাঝে থাক্‌লে বাঁধা বলত মনে দূর—বহুদূর—
কোন্ রাহু তায় গ্রাস্‌ল বল আজ যে সখি সুদূর—সুদূর!
দীর্ঘ-নিশা কাটত যাহার কণ্ঠ আমার আলিঙ্গনে—
সেই সে প্রিয়ার কণ্ঠধ্বনি দেয় না সাড়া মনের-বনে!
তাহার কেশের-বাসের নেশায় চিত্ত আমার আজ ভারাতুর!

বক্ষ ছিল সহ্য ক'রে একটি পেলব তনুর বোঝা—
শূন্য হয়ে দীর্ঘশ্বাসে সার হ'ল আজ কেবল খোঁজা!
একলা আজি রইতে নারি,—শুনি তাহার রোদন-ধ্বনি—
দুপুর রাতে বুকের মাঝে শয্যা সম শূন্য গণি!
কানে-কানে নেইত কথা, চিত্তে বাজে তাহার নূপুর!

কিং কং

(শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত)

হলিউডে লেখা এডগার ওয়ালেসের শেষ গল্প 'কিং কং' রেডিও ফিল্ম কোম্পানী কর্ত্তৃক ছবিতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। গল্পটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা অনুমান ক'রতে পারবেন ছবির পর্দ্দায় এই শ্রেণীর গল্পকে রূপ ও শব্দ দেওয়া কি-প্রকার কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ!

রেডিওর কর্ম্মকর্ত্তা মিরিয়ান সি কুপার ও লেখক এডগার ওয়ালেস্ কয়েক ঘণ্টা যুক্তি পরামর্শ করবার পর এই গল্পকে ছবিতে রূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব ভেবেছিলেন। 'কিং কং'এর অন্যতম পরিচালক আর্ণেষ্ট্ বি স্কভস্যাকের মতে ছবিখানি নির্ম্মাণ পদ্ধতির দিক্ দিয়ে হলিউডের মধ্যে সব-চেয়ে সেরা ব'লে গর্ব্ব ক'রতে পারে।

হঠাৎ আবিষ্কৃত সভ্যতার ছায়া-বিবর্জ্জিত ও অধুনা-লুপ্ত জীব-জন্তুতে ভরা আদিম যুগের দ্বীপ থেকে এক অতিকায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু বানরকে আধুনিক যুগের নিউইয়র্ক সহরে ধ'রে আনবার পর, ঐ অসাধারণ জীবটি নানা অত্যাচার সুরু ক'রে দিলে...ইত্যাদি···এই ব'লে গল্পের প্রথম মুখপাত করা হ'য়েছে।

এই ছবিখানির মধ্যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিচিত্র জানোয়ারদের পরস্পর বিরোধ, যুদ্ধ ও তাদের ভীতি-উৎপাদক গর্জ্জন এবং ঐ বিকট বানরের আধুনিক লোহ ব্রিজ বা সেতু নির্ম্মাণ প্রভৃতি ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। কল্পনা করুন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সৌধ নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং-এর মস্তকের উপর ঐ অতিকায় বানর দাঁড়িয়ে,—তার এক হাতের মুঠোর মধ্যে ছবির নায়িকা রূপসী ফে রে; চারিদিকে উড়ন্ত উড়ো-জাহাজ থেকে ঐ দানবের ওপর গুলী-বর্ষণ চ'লছে···ক্ষিপ্ত দানব তার অপর হাতে একখানি উড়ন্ত উড়ো-জাহাজ প্রজাপতির মতো ধ'রে ঘৃণাভরে নীচে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে ইত্যাদি। এ-রকম দৃশ্যও ছবিতে দেখতে পাবেন।

এই অতিকায় বানরের দেহের মাপের বহর দেখুন।

দৈর্ঘ্য—পঞ্চাশ ফিট; মুখমণ্ডল—সাত ফিট; নাক—দু' ফিট; ঠোঁট – ছ' ফিট; ভ্রূ—চার ফিট ছ' ইঞ্চি; মুখ (হাসিলে) ছ' ফিট; চোখ—প্রত্যেকটি দশ ইঞ্চি; কাণ—এক ফুট; বুক – ষাট ফিট; পা—পনের ফিট; বাহু—তেইশ ফিট ইত্যাদি। যাদুঘরে রক্ষিত বিলুপ্ত জানোয়ারদের হাড় পরীক্ষা ক'রে ছবিখানির বিরাট বানর ও বিকট জন্তুগুলি প্রস্তুত করা হ'য়েছে। কার্টুন্ ছবির নির্ম্মাণ-প্রণালী 'কিং কং'এর অনেক দৃশ্যে অনুসৃত হ'য়েছে।

মনে করুন, বানরটা তার একটা হাত তুলেছে; এই দৃশ্যটি ছবিতে তুলতে হবে। প্রথমে হাতের ছবি নেওয়া হ'ল, পরে তার হাতটা একটু তুলে, আর একটা ছবি নেওয়া হ'ল; পুনরায় হাতটা আরো কিঞ্চিৎ তুলে, অপর একটা ছবি নেওয়া হ'ল। এই রকমভাবে ছবি তোলা চ'লল, যতক্ষণ না হাত প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিত হ'ল। তা' হ'লেই অনুমান ক'রতে পারা যায় যে, সারা ছবিখানা প্রস্তুত ক'রতে কত সময় ব্যয় করা হ'য়েছে। বানর ও আর একটা ভয়াবহ জানোয়ারের যুদ্ধের দৃশ্য তুলতে মোট সাত সপ্তাহ খরচ হ'য়েছে। অন্যান্য জন্তুদের নড়ন-চড়নের জন্যে তাদের সাহায্য নিতে হ'য়েছে—তবে তাদের যুদ্ধের দৃশ্যে কার্টুন্ ছবির প্রস্তুত প্রণালীকে অনুসরণ করা হ'য়েছে।

ছবিখানি ক্যামেরার কারসাজিতে ভরপুর থাকলেও, এর ঘটনাস্থান বাস্তবতার সম্মান প্রতি অক্ষরে রক্ষা ক'রেছে। ছবির নিউ-ইয়র্কের রাস্তা ও এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং নকল নয়—উড়ন্ত উড়ো-জাহাজগুলি বাস্তবপক্ষে উড়ো-জাহাজই বটে—ঐ অতিকায় বানরের হাতের মুঠোর ভেতর রবারের মডেলের ফে রে নেই···যে আছে, সে হচ্ছে রক্ত-মাংসের নায়িকা ফে রে···

কিন্তু ছবি তোলবার সময় ঐ দৃশ্যাবলী ঘটে নি, যাদের প্রতিবিম্ব ছবির পর্দ্দায় দেখতে পাবেন। যেমন "The Scenes on the Empire State Building are, in actual fact, seven different films super-imposed over one another."

শব্দ নিয়ে পরিচালক মহাশয় বিপদে প'ড়ে গিয়েছিলেন। হারানো যুগে অধুনা-বিলুপ্ত অতিকায় জীব-জন্তুগুলি কি ধরণের চীৎকার ক'রত, তা জানা কঠিন এবং জানলেও সেই শব্দগুলি ছবির ভেতর আনা আরো কঠিন।

রেডিও ফিল্ম কোম্পানীর শব্দযন্ত্রী মিঃ মারে স্পি ভ্যাক্ কিন্তু এই শব্দ-সমস্যার সমাধান ক'রেছেন। একটা ডিনোসাউরাস্ জন্তুর চীৎকার তিনি চল্লিশটি যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন; এরিম্-নো থেরিয়াম জন্তুর চীৎকারের জন্য তিনি অর্গানের পাইপের ভিতর বাতাস চালিয়ে শব্দকে শ্লো স্পিডে রেকর্ড ক'রেছেন। আবার সেই শব্দকে সাউণ্ড ট্রাক্ উল্টো ক'রে তুলেছেন। অপরাপর জানোয়ারদের চীৎকারের জন্য মিঃ স্পিভ্যাক্ বর্ত্তমান যুগের জানোয়ার অর্থাৎ সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতির গর্জ্জনের সাহায্য নিয়েছেন। ঐ অতিকায় বানরের চীৎকারের জন্য প্রথমে তিনি অনেকগুলি রকমারি গরিলার মিলিত চীৎকার রেকর্ড ক'রে আবার সেই শব্দকে শ্লো টেম্পোয় উল্টো দিকে রেকর্ড ক'রেছেন।

জন্তুগুলি প্রাণীতত্ত্ববিদ্ মিঃ উইলিস্ ও'ব্রায়েনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হ'য়েছে। যদি আপনারা নির্ব্বাক ছবি 'দি লষ্ট্ ওয়ার্লড্' দেখে থাকেন, তা'হ'লে জন্তুগুলির আকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আন্দাজ ক'রলেও ক'রতে পারেন।

'কিং কং' হলিউডে সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে।—ছবিখানি অতি শীঘ্রই কলিকাতায় দেখানো হবে।
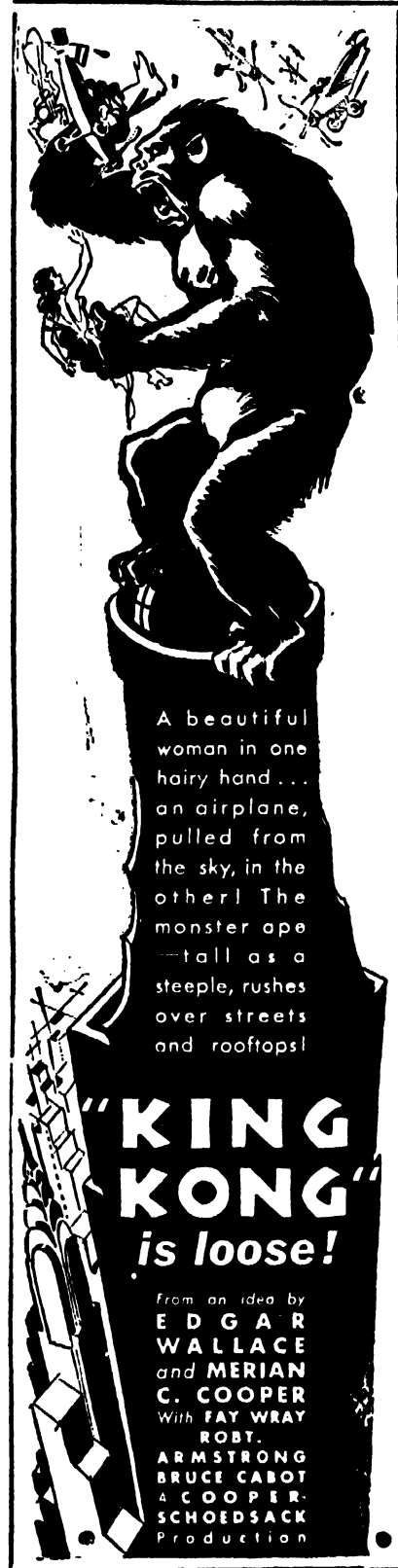
আশ্রম-শকুন্তলা

(শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়)

কণ্বের আশ্রম—বনের কোল যেন আলো কোরে রোয়েছে।

আশ্রমের এক প্রান্তে কুসুম-কানন - ফুলে, ফলে, বর্ণে, গন্ধে—আলোয় ছায়ায় পরিপূর্ণ-শ্রী।

প্রভাতের সোনার আলোর প্রশান্ত স্পর্শ এসে পোড়েছে আশ্রমের শিরে, সারা শরীরে।

দূরে আশ্রমের অন্তপ্রান্ত হেতে মিলিত কণ্ঠের বেদ গান শোনা যায়।—

বনদেবীগণের প্রবেশ।

অরণ্যশ্রী—বল্লরীশ্রী—মঞ্জরীশ্রী—সরঃশ্রী—

অরণ্যশ্রী। বনে যে ফুল আপনি ফোটে, এই আশ্রম-কাননের ফুলগুলিও ঠিক তাদেরি মত।

বল্লরীশ্রী। বনফুলের মতই সুন্দর এই আশ্রম-কাননের ফলগুলি।

মঞ্জরীশ্রী। তেমনি নম্র-নির্ম্মল।

সরঃশ্রী। এরাও তেমনি মনোহরণ করে।

অরণ্যশ্রী। তাইতো প্রভাতে রাতে আশ্রমের এই কুসুম-কাননে ছুটে এসে খেলা করি।

(গান)

প্রভাতে রাতে—
কাহার স্নেহে জীবন জাগে,
তরুরে ঘেরে পুলক-রাগে,
রূপের শিখায় কাঁপন লাগে
শেফালি মল্লিকাতে,
প্রভাতে রাতে।

মঞ্জরীশ্রী। এখানে মানুষের বসতি আছে।

অরণ্যশ্রী। কিন্তু বেসাতি নেই।

সরঃশ্রী। এরা মানুষ নয়, মুনি-ঋষি!

বল্লরীশ্রী। এঁরা শুধু ঈশ্বরকেই ডাকেন।

অরণ্যশ্রী। ঈশ্বরকে এঁরা পিতা বলেন।

দূরে বেদগান শোনা গেল।—ওঁ পিতানোঽসি ··

অরণ্যশ্রী। কী সুন্দর সুর!

সরঃশ্রী। জলকলতানের মত।

মঞ্জরীশ্রী। ভ্রমর-গুঞ্জনের মত।

বল্লরীশ্রী। যেন শত বসন্তের মর্ম্মের মর্ম্মর-গাথা।

অরণ্যশ্রী। এ গান শুনে সুরধুনীর কথা মনে জাগে।

সরঃশ্রী। মহাদেবের নৃত্যের কথা স্মরণে ভেসে ওঠে।

মঞ্জরীশ্রী। এ যেন উদয়-শিখরে প্রভাত-বিহঙ্গের জাগরণী।

অরণ্যশ্রী। ওই দেখ। ওই দেখ। দলে দলে পালে পালে কত বৃক-শিশু, মৃগ-শিশু, মেষ-শিশু আশ্রমের পানে ছুটে চলেছে!

মঞ্জরীশ্রী। ওরা যে মুনি-কন্যাদের কাছে আহার পায়।

অরণ্যশ্রী। আহারের সঙ্গে তাদের স্নেহের স্পর্শ পেয়ে ওরা হিংসা ভুলেছে।

মঞ্জরীশ্রী। বনের চেয়ে এই আশ্রম-কানন ঢের ভালো। সেখানে আঘাত পেয়ে নিরীহরা যখন করুণ সুরে চীৎকার কোরে ওঠে—

অরণ্যশ্রী। যখন বনস্পতিরা বিদ্রোহ ক'রে দাবানল জ্বালে—

সরঃশ্রী। না-না, এই আশ্রম-কানন ঢের ভালো। এখানে ত্রাস নেই, হিংসা নেই।

মঞ্জরীশ্রী। দেখলেনা, শুনলেনা? ওরা শান্তি শান্তি কোরে ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করেন!

অরণ্যশ্রী। ভগবান্ আমা'দের দেবী কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। আমরা যেন কলের পুতুল। শুধু কতগুলো গুণ দিয়েছেন। তারি জোরে আমরা চিরদিনই বনে বনে বনদেবী হোয়েই থাকব।

সরঃশ্রী। মানুষকে ভগবান মানুষ কোরে কী শক্তি, কত শক্তিই না দিয়েছেন!

মঞ্জরীশ্রী। ওরা যা ভাবে তাই করে—

বল্লরীশ্রী। ভগবান্ ওদের জীবন বীণায় তার খাটিয়ে দিয়েছেন; সুর বাঁদেন নি। তাই ওরা সব সুরেই বাজতে পারে। আমরা যে সুরে বাঁধা।... ওদের দেখলে নিজেদের বাঁধা সুর বড় একঘেয়ে লাগে।

অরণ্যশ্রী। ওই দেখ! আশ্রম কন্যারা এই দিকেই আসছে। হাতে জলের ঝারি। পশুর পালা শেষ হোয়েছে। এইবার গাছের চারাগুলিকেই স্তন্য দেবে।

বল্লরীশ্রী। ওদের মুখে চোখে মায়ের স্নেহ উথ্‌লে উঠছে।

অরণ্যশ্রী। সেই স্নেহের রসে পরিপুষ্ট হোয়েছে বোলেই এখানে ফুলে, ফলে, লতায়, পাতায় বর্ণরাগের এই বিচিত্র লীলা।

মঞ্জরীশ্রী। যেন নতুন জগতে এরা নতুন কোরে জ'ন্মে চির অমর হোয়ে রইবে।

সরঃশ্রী। ওরা এসে পড়ল;—চল, ভাই চল!—

গাইতে গাইতে প্রস্থান।

শকুন্তলা—অনুসূয়া—প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

শকুন্তলা। (এককোণে হাতের ঝারি রেখে)—ওলো, তোরা আয়,—এই মাটিতে, এই ঘাসের ওপোর একটু বোসে নি, একটু শুয়ে নি।

প্রিয়ম্বদা। সখি, শোবার সুখ কি এখনো মেটেনি? এদিকে কুসুম-শিশুরা যে যায়! সবিতার আলো ওদের জাগিয়ে দেয়। চোখ মেলে ওরা চায়। কাকে চায় জানো? তোমাকে।—একবারটি তোমায় দেখে নিলে ওদের জীবন গন্ধে ভ'রে উঠবে।

অনুসূয়া। তোমাকে দেখার আনন্দই তো ওদের গন্ধ।

প্রিয়ম্বদা। নাও, সখি ওঠো?

শকুন্তলা। আর একটু ভাই। ভারি ভালো লাগে আমার এই মাটির, এই ঘাসের স্পর্শ। এখানে বোসলে, শুলে কি মনে হয় জানিস? মনে হয় আমি বুঝি তোদের মত মানুষ নই। আমি যেন বনের পাখী, নদীর জল, ঝর্ণার ধারার মত কি জানি অন্য আর কিছু। ভুলে যাই সব কথা।

প্রিয়ম্বদা। আপনার ভাবে বিভোর হোয়ে থাকলেও, মানুষ ছাড়া আর কিছুই তুমি হবে না।

অনুসূয়া। ভগবানের হাতে-গড়া সৌন্দর্য্যের ভিতরে মানুষই সবার চেয়ে সুন্দর। আমার সখি আবার সেই মানুষের মধ্যে সেরা রূপসী। তোমার জন্ম সার্থক।

প্রিয়ম্বদা। সত্য সখি, এ রূপের যিনি জনক, মানুষ তাঁর কাছে কত প্রিয় সে কথা বোঝা ত কঠিন নয়!

অনুসূয়া। ভাবে বিভোর হোয়ে তুমি যদি ভুলে যাও যে তুমি মানুষ নও,—তা তো আমরা হোতে দেবো না। তুমি আমাদেরি মত মানুষ।

প্রিয়ম্বদা। তুমি রূপসী, সন্ন্যাসিনী শকুন্তলা।...নাও, ওঠো—বেলা হোয়ে গেল। হোমধেনুর বৎসরা তোমায় না দেখতে পেলে কান্না সুরু কোরবে।

অনুসূয়া। ওরা তোমায় পেলে মায়ের কথা ভুলে থাকে।

শকুন্তলা। সকলেই তো মাকে চায়। মাকে পেলে সব ভুলে যায়। আমিও মাটির কোলে বসলে সব ভুলে যাই। মাটি আমার মা!

প্রিয়ম্বদা। (হাসিয়া) মাটি তো সবারই মা। সকলকে কোলে ধোরে রেখেছেন বোলেই তো তিনি ধরিত্রী।

শকুন্তলা। তবে আর কী! আয় ভাই, সবাই মিলে এই মাটির কোলে ভালো ক'রে বসি।

অনুসূয়া। প্রিয়ম্বদা, সখীর চোখের ব্যাকুল মিনতি উপেক্ষা করিস্‌নে। একটুখানি বোস্।

প্রিয়ম্বদা। বোসতে আর হোলো না বোধ হয়। ঐ দেখ, মধুমালিকা এইদিকেই আস্‌ছে।

মধুমালিকার প্রবেশ।

মধুমালিকা। এই যে, তোমরা অজিনাসন ছেড়ে তৃণাসনে দিব্যি সভা পেতে বসেছো!

প্রিয়ম্বদা। হাঁ ভাই, তা বসেছি।

মধুমালিকা। গুরুদেব যে তোমাদের ডাকছেন!

শকুন্তলা। আঁ্যা, এমন অসময়ে তিনি কেন আমাদের ডাকছেন? সখী চলো!   সকলের প্রস্থান।

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

অরণ্যশ্রী। সত্যই বোলেছে; এ রূপের যিনি জনক, মানুষ তাঁর কাছে কতই না প্রিয়।

সরঃশ্রী। এ রূপের তুলনা নেই।

মঞ্জরীশ্রী। যদি বলি শতদলের মত!

সরঃশ্রী। তবু যেন অনেকখানি বাকি থেকে যায়।

বল্লরীশ্রী। যদি বলি, পূর্ণিমার মত!

সরঃশ্রী। তবু যেন অনেকখানি বাকি থেকে যায়!

মঞ্জরীশ্রী। ভরা ভাদরের গৈরিক স্রাবিনীর মত।

সরঃশ্রী। তবু যেন অনেকখানি বাকি থেকে যায়।

বল্লরীশ্রী। শারদশ্রীর মত।

সরঃশ্রী। তবু যেন ঠিক্ বলা হ'ল না।

অরণ্যশ্রী। মায়ের স্নেহের মত।

সকলে। মনে হ'ল যেন মিলে গেছে,—মনে হ'ল যেন মিলে গেছে।

মঞ্জরীশ্রী। আচ্ছা, ভেবে দেখি।

বল্লরীশ্রী। আমিও দেখি।

সরঃশ্রী। ভেবে দেখলে আর মিলোতে পারবে না। কথাটা প্রাণে লেগেছে, তাই মিলটুকু ধরা প'ড়ে গেছে।

অরণ্যশ্রী। ওরা এই দিকেই আসছে। এস, আমরা যাই।

সকলের প্রস্থান।

শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনুসূয়ার প্রবেশ।

শকুন্তলা। আমার ভালো লাগছে না।

প্রিয়ম্বদা। তোমার ভালো না লাগলে যে আমাদের আরো ভালো লাগবে না।

অনুসূয়া। তুমি ভেবো না সখি। গুরুদেব তোমায় ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে বেশীদিন কোথাও থাকবেন না।

শকুন্তলা। পিতা কোথাও গেলে আমার মনে আনন্দ থাকে না।

প্রিয়ম্বদা। গুরুদেব গুরুতর কাজেই আশ্রম ত্যাগ ক'রে গেছেন। তোমায় কি ব'লে গেলেন সখি?

শকুন্তলা। পিতা আমায় অতিথি-সৎকারের ভার দিয়ে গেলেন।

প্রিয়ম্বদা। আমরা থাকবো তোমার পিছনে। তোমায় সাহায্য করব। সে বেশ হবে?

অনুসূয়া। বেশ হবে ভাই, বেশ হবে!

প্রিয়ম্বদা। আচ্ছা, অতিথি যদি ব্রাহ্মণ হন!

অনুসূয়া। তবে আমরা তাঁর পদধূলি নেবো। পরে বসবার জন্যে কুশাসন দেবো। পূজার জন্যে তাম্রকুশাদি সরঞ্জাম এনে দেবে। আহারের জন্যে—

প্রিয়ম্বদা। আচ্ছা, যদি কোন ধনিক আসেন!

অনুসূয়া। যদি কোন নাগরিক আসেন!

প্রিয়ম্বদা। যদি—রাজা স্বয়ং আসেন? তাহলে কি হবে সখি?

শকুন্তলা। (ভ্রমর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া) সখি, আমায় রক্ষা করো! আঃ! কী হবে সখি! দেখোনা!—

প্রিয়ম্বদা। (তাড়িয়ে দিতে দিতে) ভ্রমরের আর দোষ কি সখি? পদ্মভ্রমে ও যদি মধু আহরণে এসেই থাকে সে আমাদের সৌভাগ্য।

শকুন্তলা। তোমার কথার শ্রী নেই।

প্রিয়ম্বদা। তোমার মুখশ্রীতে, তোমার সখীর সে দোষ ঢেকে দিয়েছে।—

মধুমালিকার প্রবেশ।

মধুমালিকা। সখি, তোমার নবমল্লিকায় আজ ফুল ফুটেছে! দেখো'সে!

শকুন্তলা। কী আনন্দ! নবমল্লিকার ফুল ফুটেছে? ওকে আমি রোপণ কোরেছিলাম।

প্রিয়ম্বদা। আমি আলবাল নির্ম্মাণ কোরেছি!

অনুসূয়া। আমি নিত্য জলসেচন কোরেছি!

শকুন্তলা। আমিও কোরেছি।

প্রিয়ম্বদা। আমি বুঝি করিনি?

সকলে। চলো, চলো!—দেখে আসি। অনুসূয়া, মঙ্গলশঙ্খ নিয়ে এস'গে! (প্রস্থান)

যবনিকা।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১০ই কার্ত্তিক,
১৩৪০

নাট্যজগৎ

অনেকদিন আগেকার পড়া বই, সেদিন চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় আলোচন-প্রসঙ্গে তার কথা মনে করিয়ে দিলেন ;—টলষ্টয়ের "What is Art", এদেশে অনেকেরই কাছে বইখানি সুপরিচিত। বইখানির প্রথম পরিচ্ছেদেই থিয়েটারি মহলার যে-বর্ণনা আছে, আমরা এখানে তার কিছু কিছু তুলে দিলুম। দিচ্ছি। এবং কেন যে দিচ্ছি, পড়লেই সেটা বোঝা যাবে :

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রথম হিন্দী টকি
"রামায়ণে"র একটী দৃশ্যে
রাম—দুর্লভরাম সীতা - রাজকুমারী

"একখানি গীতিনাট্যের মহলা দেখতে গিয়েছি। মস্ত-বড় এক বাড়ীর ভিতরে ধূলো ও অন্ধকারের রাজত্ব, চারিদিকে দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের ও আলোকপাতের জন্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্র, এখানে-ওখানে কারিকরেরা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এদেরই মধ্যে একজন ময়লা পোষাক-পরা, শ্রান্ত ও বিবর্ণ লোককে দেখলুম, আমার পাশ দিয়ে সে ক্রুদ্ধভাবে আর কাকে গালাগালি দিতে দিতে এগিয়ে গেল। নানান রকম পর্দ্দা ও দৃশ্যপট প্রভৃতির মধ্যে দলে দলে বিচিত্র সাজ-পোষাক-পরা লোক রং-করা মুখে দাঁড়িয়ে আছে বা ঘোরা-ফেরা করছে। সে দলে নারীরাও আছে, তাদের পরণের পোষাক যতটা-সম্ভব নগ্নতাকেই প্রকাশ করছে। এরা সব গাইয়ে বা নাচিয়ে, নিজেদের পালা আসবার অপেক্ষায় আছে।

মঞ্চের নীচে ঐকতান-বাদকরা প্রায় শতাবধি বাজনার যন্ত্র নিয়ে ব'সে আছে। সেইখানেই উচ্চতর আসনের উপরে উপবিষ্ট রয়েছেন অপেরার প্রধান পরিচালক।

*

মহলা সুরু হয়েছে। একদল ভারতবাসীর বিবাহের শোভাযাত্রার দল—বরের বাড়ীতে বধূ আনছে। শোভাযাত্রার দলের ভিতরে সাধারণ পোষাক-পরা দু'জন লোক ক্রমাগত ছুটোছুটি করছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন নাটকীয় অংশের পরিচালক এবং আর-একজন নৃত্য-শিক্ষক তিনি এত মাহিনা পান যা দশজন শ্রমজীবী একবৎসর খেটেও রোজগার করতে পারে না।

অর্কেষ্ট্রা, শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত নিয়ে তিনজন পরিচালক মাথা ঘামাচ্ছেন। শোভাযাত্রার দলে নিয়মমত প্রতি সারে দু'জন ক'রে লোক, তাদের প্রত্যেকের কাঁধে টিনের টাঙ্গি। তারা একদিক দিয়ে বেরিয়ে মঞ্চের উপরে বার-কয়েক মণ্ডলাকারে ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। শোভাযাত্রাকে ঠিক মনের মত করতে সময় গেল অনেকক্ষণ। প্রথমতঃ টাঙ্গিধারী লোকগুলি দেরি ক'রে মঞ্চের উপরে এল ; তারপর এল নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে ; তারপর এল ঠিক সময়েই, কিন্তু দাঁড়াল গিয়ে এক জায়গায় ভিড় ক'রে ; তারপর তারা ভিড় ক'রে দাঁড়াল না বটে, কিন্তু দুদিকে অত্যন্ত পাশ

ঘেঁসে দাঁড়াল। এই-সব দোষ শুধ্‌রোবার জন্যে প্রত্যেকবারেই অভিনয় থামিয়ে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করা হ'তে লাগল।

শোভাযাত্রা ঠিকভাবে দাঁড়ালে পর, একজন তুর্কীর মতন দেখতে লোক অদ্ভুত ভাবে মুখব্যাদান ক'রে গানের সুরে বললে, "বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি!" আবার শোভাযাত্রা সুরু হ'ল, কিন্তু ইতিমধ্যে গানের সুরের সঙ্গে যে ফরাসী শিঙ্গা বেজে উঠল, তার সুর হ'ল ভুল। যেন ভয়ানক একটা কিছু হয়েছে, এমনিভাবে শিউরে উঠে পরিচালক টেবিলের উপরে ঠকাস্ ক'রে বেত্রাঘাত করলেন। আবার মহলা বন্ধ হয়ে গেল এবং পরিচালক ঐকতানের দিকে ফিরে যে-ভাষায় ফরাসী শিঙ্গাকে আক্রমণ করলেন, তা ব্যবহার করে ঝগড়ার সময়ে কেবল গাড়োয়ানরাই। আবার গোড়া থেকে সুরু হ'ল। আবার শোভাযাত্রার দল মঞ্চে প্রবেশ করল, আবার সেই গান হ'ল—"বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি!" এবারে শোভাযাত্রার লোকগুলি বড় ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে এল। আবার টেবিলের উপরে বেত্রাঘাত, আবার গালাগালি বৃষ্টি, আবার গোড়া থেকে আরম্ভ! ফের সেই গান—"বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি!" শোভাযাত্রার লোকগুলি কেউ দুঃখিতভাবে এবং কেউ হাসিমুখে গল্প করতে করতে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে গান সুরু করল—এবং আর কোন গোলমাল হবে না ভেবে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছি, এমন সময়ে আচম্বিতে আবার টেবিলের উপরে ঠকাস্ ক'রে সেই বেত্রাঘাত! ব্যাপার কি? না, গান গাইবার সময়ে ওরা মাঝে মাঝে হাত তুলে জীবন্তভাব প্রকাশ করতে ভুলে গেছে! পরিচালক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "তোমরা কি কেউ বেঁচে নেই? অ্যাঁ? যত-সব গরুর পাল! তোমরা কি মড়া, যে একটুও নড়ন-চড়ন নেই?" আবার গোড়ায় ফিরে যাওয়া হ'ল, আবার সেই গান—"বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি!" আবার দুঃখিত মুখে 'কোরাসে'র মেয়েরা গান গাইতে লাগল এবং এবারে অবশ্য কেউ হাত তুলতে ভুললে না। কিন্তু দুটি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইলে—অমনি দ্বিগুণ জোরে টেবিলের উপরে বেতের ঠক্‌ঠকানি!—"তোমরা কি এখানে গল্প করতে এসেছ? বাড়ীতে ব'সে গল্প করতে পারো না? ওহে রাঙা-ইজের-পরা লোকটি! আমার কাছে এস তো! আমার দিয়ে তাকিয়ে থাকো। আরম্ভ কর!" আবার গান—"বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি!" এবং এইভাবে এক, দুই, তিন ঘণ্টা কেটে গেল। এ রকম মহলা রোজ ছয় ঘণ্টা ক'রে চলে। টেবিলের উপরে বেত্র আস্ফালন; পুনঃকথন; পুনঃকরণ; গানের, ঐকতানের, শোভাযাত্রার ও নৃত্যের বারংবার সংশোধন—তারই মধ্যে বারংবার মুখ-খিঁচুনি, বকুনি ও গালাগালির চাটনি! এক ঘণ্টার ভিতরে আমি অন্ততঃ চল্লিশবার এই মিষ্ট কথাগুলি শুনলুম—"গাধা", "শুওর", "হ্যাকা", "বোকা"! যে-বেচারাকে যখন এমনি সব মিষ্ট সম্বোধনে ডাকা হচ্ছে, নির্ব্বাক মুখে বিশৃঙ্খল মনে সে হুকুম তামিল ক'রে যাচ্ছে। "বধূকে আমি বাড়ীতে এনেছি"—গানের এই লাইনটি শুনলুম বিশবার!

*

পরিচালক বেশ ভালো রকমেই জানেন, সৌখীন জীবন যাপন ক'রে ক'রে এই লোকগুলির চরিত্র এমনি বিগড়ে গেছে যে, যতই গালাগালি দেওয়া হোক, চাকরি যাবার ভয়ে তারা সমস্তই নীরবে হজম করবে—কাজেই হীনতা প্রকাশ করতে তিনিও সঙ্কুচিত হন না কিছুমাত্র! বিশেষ ভিয়েনা ও প্যারি সহরের পরিচালকগণকে তিনি এম্‌নি ব্যবহারই করতে দেখেছেন! উঁচুদরের কলাবিদ্‌দের প্রকৃতিই নাকি এইরকম, আর্টের টানে তাঁরা এম্‌নি ভেসে যান যে, অন্যান্য আর্টিষ্টদের মানসিক ভাব বুঝে সুবিচার করবার খেয়াল তাঁদের হয় না!

এর চেয়ে বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করা সহজ নয়। যখন ভার নামানো হচ্ছে, তখন কোন শ্রমজীবী তার সহকর্মীর সাহায্য না পেলে তাকে গালাগালি দিতে পারে। খড়ের গাদা ঠিকমত সাজানো হয়নি ব'লে বুড়ো চাষা যদি কোন ছোকরা চাষকে গালাগালি দেয়, তাহ'লে সে ছোকরা মুখ বুঁজে গালাগালি শুনতে বাধ্য হয়। এ-রকম সব দৃশ্য দেখা যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন, এর একটা অর্থ বা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

*

কিন্তু থিয়েটারে এ কী হচ্ছে? কি জন্যে এবং কার জন্যে? খুব সম্ভব, এখানকার অন্যান্য কর্ম্মীর মত পরিচালক নিজেও শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কে তাঁকে শ্রান্ত হবার জন্যে মাথার দিব্যি দিয়েছে? এবং কোন্ মহৎ কারণের জন্যে তিনি এতখানি শ্রান্ত না হয়ে পারছেন না? যে-গীতিনাট্যের মহলা তিনি দিচ্ছেন, তা হচ্ছে আর পাঁচখানা অপেরার মত একখানা নিতান্ত সাধারণ অপেরা—এবং মস্ত এক অসম্ভব অপেরাও বটে। ভারতীয় রাজা বিবাহের জন্যে উৎসুক; সকলে তাঁর জন্যে একটি বধূ নিয়ে এল, রাজা ভাটের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করলেন; বধূ ভাটের প্রেমে প'ড়ে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে প্রথমে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু তারপর সে জানলে রাজা ও ভাট অভিন্ন ব্যক্তি,—অতএব সব ভালো, যার শেষ ভালো, পরিণামে সকলেই হাসিমুখে পালা সাঙ্গ করলে।

*

এ-রকম ভারতবাসী কস্মিন্‌কালে ছিলও না, থাকবেও না; এবং এই থিয়েটারি লোকগুলি দেখতে ভারতীয় লোকের মতন নয় তো বটেই. উপরন্তু এই রকম সব অপেরা ছাড়া তাদের দুনিয়ার আর কোথাও দেখতেও পাওয়া যায় না। মানুষরা এমন গানের সুরে কথা কয় না এবং পরস্পরের কাছ থেকে এমন মাপা-জোকা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ করে না; এবং থিয়েটার ছাড়া মানুষ আর কোথাও এমন টিনের টাঙ্গি ঘাড়ে ক'রে জোড়া বেঁধে চলা-ফেরা করে না; এবং এমন থিয়েটারি-ধরণে কেউ হাসেও না, কাঁদেও না, অভিভূতও হয় না; এবং পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই যে এমনধারা অভিনয় দেখে বিচলিত হবে না, এ-কথাও বিনা দ্বিধায় বলতে পারা যায়।

*

তাহ'লেই প্রশ্ন ওঠে, তবে কার জন্যে এ-সব করা হচ্ছে? এ-সব খুসি করবে কাকে? যদিও বা অপেরায় মাঝে মাঝে শুনতে-মিষ্টি গানের সুর পাওয়া যায়, তবে তা সাদাসিধে, সাধারণ ভাবে না-শুনিয়ে, এমন সব অর্থহীন সাজপোষাক, শোভাযাত্রা ও হাতনাড়া দেখিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ গাওয়া কেন?… … … আর ঐ নৃত্য-সজ্জা, যার মধ্যে আধা-ন্যাংটো নারীরা কামোদ্দীপক ভাব-ভঙ্গি দেখায়, দেহকে নানাভাবে কুঁচ্‌কে দুম্‌ড়ে রতিলালসা জাগাবার চেষ্টা করে,—এককথায় জঘন্য, তা জঘন্য!

*

সুতরাং, কার জন্যে যে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলা হয়, তা বোঝা বড় শক্ত। যার রসবোধ আছে, এ-সব দেখলে তার গায়ে জ্বর আসে এবং সাধারণ কর্ম্মী মানুষের কাছে এ সব ব্যাপার কল্পনার অতীত। অত্যন্ত নীচু-দরের লোকেরা (উচ্চশ্রেণীর কাছে যারা কদর পেতে চায়) হয়তো এই-সব পালা দেখে খুসি হয়, কিন্তু তাও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি

হয় না।… … … এবং এই বিশ্রী মূঢ়তাকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলা হচ্ছে সরলতা বা সদাশয়তার দ্বারা নয়, ক্রুদ্ধ চীৎকার এবং পাশব নৃশংসতার দ্বারা!"

*

যা আর্ট নয়, রসসাহিত্যে যা নিম্নমূল্যেও বিকোয় না, যা ছেলেখেলারও অধম এবং কোনদিক দিয়েই যা রুচিকে উপকৃত করে না, প্রধানতঃ সেই শ্রেণীরই জিনিষ নিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের সুখের বা দুঃখের দিন কেটে যাচ্ছে। অথচ তার জন্যে বিষম কোলাহল, বিপুল আয়োজন ও প্রাণপাত পরিশ্রমের অন্ত নেই। বাংলা রঙ্গালয়কে দেখিয়ে টলষ্টয়ের ভাষায় আমরাও কি প্রশ্ন করতে পারি না…"But what was being done here? For what and for whom?"

*

জনৈক গ্রাহক জিজ্ঞাসা করেছেন, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথমে কবি রবীন্দ্রনাথের কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল? উত্তরে জানাচ্ছি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ষ্টার থিয়েটার সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করেন। নাটকের নাম "বাল্মীকি-প্রতিভা" এবং আদি ব্রাহ্ম-সমাজকে অর্থসাহায্য করবার জন্যেই উক্ত অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। তারপরে আজ পর্য্যন্ত সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের পনেরোখানি নাটক-নাটিকার অভিনয় হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ তালিকা বোধ হয় এই: ১ বাল্মীকি-প্রতিভা, ২ রাজা ও রাণী, ৩ বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, ৪ কচ ও দেবযানী, ৫ বশীকরণ, ৬ ডালিয়া (ঠিক এই নাম ছিল কিনা মনে নেই। গল্প থেকে রূপান্তরিত), ৭ চিরকুমার সভা, ৮ গৃহপ্রবেশ, ৯ প্রায়শ্চিত্ত (ভিন্ননামে অভিনীত হয়), ১০ শোধবোধ, ১১ শেষ-রক্ষা, ১২ বিসর্জ্জন, ১৩ তপতী, ১৪ মুক্তির উপায় (গল্প থেকে রূপান্তরিত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলে এই গল্প অবলম্বনেই আর একখানি কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়েছিল), ১৫ বৈকুণ্ঠের খাতা এবং ১৬ "চোখের বালি" উপন্যাসের নাট্য-রূপ। সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের এ দান বড় কম দান নয়।

*

গত যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ মিত্র সুপ্রাচীন বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেছেন। গত-যুগের আর কোন অভিনেতাই বোধ হয় তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি। বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের সূত্রপাত হবার অনেক আগেই তিনি নটচর্য্যা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে কাশীধামে বাস করছিলেন, সেই কারণে এখনকার নব্য যুবকদের অনেকেই বোধ করি তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানেন না। কিন্তু আমাদের মত যাঁরা একাধিকবার তাঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, উপেন্দ্রনাথের মতন উচ্চশ্রেণীর নাট্যকলাবিদ পৃথিবীর যে-কোন দেশেই দুর্লভ। আমাদের মত হচ্ছে, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ, কিন্তু কেন জানিনা, তিনি কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের যোগ্য যশ ও সম্মান লাভ করেন নি! হয়তো এর জন্যে দায়ী করা যায়, বাংলা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নির্ব্বুদ্ধিতাকে। তিনি এমন স্বাভাবিক অভিনয় করতেন যে, এই নবযুগেরও কোন অভিনেতা বাস্তবতায় তাঁর চেয়ে বড় হ'তে পারবেন না। তাঁর অভিনয়ের কোথাও সস্তা প্যাঁচ ছিল না ব'লেই হয়তো 'গ্যালারি'র দেবতারা তাঁর অভিনয় নিয়ে অত-বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার হেতু খুঁজে পান নি। এবং তাঁর যুগে

নিয়মিত নাট্য-সমালোচনার রেওয়াজ ছিল না ব'লে তাঁর অভিনয়-শক্তির লিপিবদ্ধ কাহিনী পাবারও উপায় নেই।

*

অধিকাংশ অভিনেতাই নাট্যসমালোচকদের সুদৃষ্টিতে দেখেন না এবং অনেকে যে প্রত্যহ কল্পনায় নাট্যসমালোচকদের মুণ্ডচর্ব্বণ না ক'রে জলগ্রহণ করেন না, এটাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তথাকথিত অভিনেতৃগণ এই পরম সত্য কথাটাই ভুলে যান যে, ভালো অভিনেতারা 'গ্যালারির দেবতা'দের কৃপায় বঞ্চিত হ'লেও কেবল নাট্যসমালোচকদের অনুগ্রহেই তাঁদের নাম স্থায়ী—এমন-কি অমর ক'রেও রাখতে পারে। "দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়।" কিন্তু "দেহ-পট"কে হারিয়েও বিলাতের গ্যারিক, কেম্বাল, কীন, ম্যাক্রেডি, আর্ভিং, সিডনস্ ও টেরি প্রভৃতি নট-নটীরা কিছুই হারান নি, নাট্য-সমালোচকদের বর্ণনার মধ্যে আজও তাঁদের অভিনয় জীবন্ত হয়ে রয়েছে। তাঁদের দেখবার জন্যে আজ কেউ আর রঙ্গালয়ে দিকে ছোটে না, কারণ রঙ্গালয়ের সে-ক্ষমতা নেই ; কিন্তু নাট্য-সমালোচকের সে শক্তি আছে, লোকে তাই তাঁদের দেখবার ও জানবার আগ্রহে পুরাণো পুঁথিপত্র বা সাময়িক পত্রের 'ফাইল' খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়।

*

উপেন্দ্রনাথ মিত্র কোন্ কোন্ ভূমিকায় করেছিলেন, তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে দিলুম : চাটুয্যে (চাটুয্যে-বাড়ুয্যে), সুগ্রীব (রাবণ বধ), যুধিষ্ঠির (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস), ইন্দ্রজিৎ (সীতাহরণ), বিষ্ণু (দক্ষ-যজ্ঞ), মহাদেব (ধ্রুবচরিত্র), ঋতুপর্ণ ও যম (নলদময়ন্তী), শালিবাহন (কমলে-কামিনী), কর্ণ (বৃষকেতু), বাহুরাজ (শ্রীবৎস-চিন্তা), অদ্বৈত (চৈতন্যলীলা), রায় রামানন্দ (নিমাই-সন্ন্যাস), নন্দ (প্রভাস-যজ্ঞ), শুদ্ধোধন (বুদ্ধদেব-চরিত), বণিক ও দারোগা (বিল্বমঙ্গল), কান্তিরাম (বেল্লিক-বাজার), রূপ (রূপ-সনাতন), যোগেশনাথ (নসীরাম), যযাতি (নরমেধ যজ্ঞ), রাজা-বাহাদুর (রাজা-বাহাদুর), ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও জমাদার (প্রফুল্ল), রাজা (বিজয়-বসন্ত), মোহিনীমোহন (হারানিধি), শিখণ্ডী (চণ্ড), বামাদাস (বোমা), বটুক (হরিশচন্দ্র) ও মীরজাফর (পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত) প্রভৃতি। যদিও এ-ছাড়া আরো অনেক ভূমিকায় উপেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তবু এই অসম্পূর্ণ তালিকাই উপেন্দ্রনাথের শক্তির বৈচিত্র্য বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে ব'লে মনে করি। পাঠকরা লক্ষ্য করলে বুঝবেন, উপেন্দ্রনাথ হাস্য ও করুণ দুই রসেই ছিলেন সমান দক্ষ। "রাজা-বাহাদুরে"র চটুল ভূমিকায় আজ পর্য্যন্ত তাঁর জোড়া মেলে নি। এবং "পলাসীর প্রায়শ্চিত্তে" তাঁর "মীরজাফর" আজও আমাদের চোখের উপরে ভাসছে ছবির মত। তেমন "মীরজাফর"ও আর দেখলুম না। উপরের তালিকায় আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, খুব বড় বড় ভূমিকাতে নেমেও উপেন্দ্রনাথ খুব ছোট ছোট ভূমিকাতে দেখা দিতেও কোনদিন লজ্জিত হন নি—যে মহৎ গুণ আগেকার অনেক অভিনেতারই ছিল এবং যে মহৎ গুণ আজকালকার অধিকাংশ অভিনেতারই নেই। উপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ আমরা আর বেশী কিছু বলতে চাই না, কারণ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভরসা দিয়েছেন যে, 'নাচঘরে'র পাঠকদের কাছে বারান্তরে তিনিই উপেন্দ্রনাথের কথা ভালো ক'রে বলবেন।

*

বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের ও গ্রামোফোনের একজন গুণী বংশীবাদক এবং তাঁর প্রকৃতিও ছিল সুমধুর। তাঁর অকাল-মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হলুম।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

সে-ফুলেতেও আতর-মাখা,
যে-ফুল ফোটে ফুলদানীতে,
মরন্ত ফুল বৃন্ত-হারা,
সেও হাসে বাস ছড়িয়ে দিতে।

*

অমনি অমল ফুলের মত,
করব কবে জীবন-ব্রত,—
বিলিয়ে দিতে মনের মধু,
গগন, পবন, পৃথিবীতে।

*

এই মধুমার কুঞ্জদরে চিত্তকুসুম ফুটে নিতি,
তাদের কুঁড়ি ফুটবেনা কি, শুনে দখিন-হাওয়ার গীতি ?

*

কালোর বুকে মাখিয়ে আলো
ফুলের মতন বাসব ভালো,
পারব কি হায় মলয় হ'তে
—মরুর তাপে, হিমেল শীতে!

চিত্রপুরী : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : Murders In the Zoo (প্যারামাউণ্ট)

শ্রেষ্ঠাংশে—Lionel Atwill

এই হত্যারহস্য-মূলক ছবিখানি কাল থেকে এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেসে আরম্ভ হবে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ এরিক গরম্যান ছিল এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক। মানুষকে সে ভালবাসতে শেখেনি। সকলের পরেই ছিল তার হিংস্র অবিশ্বাস। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য অন্যায় আচরণ করেছে বলে সে অরণ্যে কাজ করবার সময় তার সহকর্মীকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে নি। আমেরিকা প্রত্যাবর্ত্তন করবার সময় গরম্যান বুঝতে বুঝতে পারলে তার স্ত্রী এভিলিন ও অন্য একটি সহযাত্রীর (রজার হিউইট) মধ্যে গুপ্ত প্রণয় চলেছে।

MURDER IN THE ZOO

গরম্যানের সঙ্গে অনেকগুলি জন্তু ছিল। অধ্যাপক ইভান্স্ ও তাঁর সহকারী ডাক্তার উড্‌ফোর্ড্ সেগুলি স্থানীয় জু-গার্ডেনে রাখলে। পিটার ইয়েট্‌স্ নামে এক ব্যক্তিকে চিড়িয়াখানার ম্যানেজার নিযুক্ত করা হ'ল।

এদিকে গরম্যান এভিলিন এবং হিউইটের উপর নজর রাখতে লাগল এবং এক নৈশ-ভোজন আসরে বিষাক্ত সর্পাঘাতে হিউইট মারা পড়ল। মাম্‌বা নামে এক অতি বিষাক্ত সর্প বন্ধন মুক্ত হ'য়ে তাকে দংশন করেছে। নিমন্ত্রিতের দল প্রাণভয়ে পলায়ন করল।

সেই রাত্রে এভিলিন বাড়ী ফিরে দেখলে গরম্যান বিচিত্র যন্ত্রপাতির সাহায্যে একপ্রকার বিষাক্ত ঔষধ প্রস্তুত করছে। সে তখন স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা বলবার জন্যে সেখান থেকে প্রস্থান করবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হ'ল না। গরম্যান তাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করলো।

এই দুই হত্যার জন্য চিড়িয়াখানাটি সাধারণের আনুকূল্য বঞ্চিত হ'ল। তখন ইয়েট্‌স্ অনেক পরিশ্রম ক'রে মাম্‌বা নামক বিষাক্ত-সর্পটিকে ধ'রে তাকে তার খাঁচায় বদ্ধ করলে। সেই সময় উড্‌ফোর্ড আবিষ্কার করলে, এই সাপের ফণার যে-রূপ চিহ্ন হওয়া উচিত হিউয়েটের অঙ্গে সেরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তাদের তখন সন্দেহ হ'ল যে, হয়ত আর একটা সর্প আছে। সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে উড্‌ফোর্ড্ গরম্যানের কাছে গেল। তখন গরম্যান উড্‌ফোর্ডকে আক্রমণ করলে। ইয়েট্‌স্ বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। জন্তুর মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠলো।

গরম্যান তখন পশুশালার সব দরজা খুলে দিলে—জন্তুরা তাদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। সে নিজে একটা শূন্য খাঁচার মধ্যে আশ্রয় নিলে। কিন্তু খাঁচা শূন্য ছিল না। তার মধ্যে ছিল একটা প্রকাণ্ড অজগর। তার দুর্দ্ধর্ষ পেষণে গরম্যান-এর মৃত্যু ঘটল।

•

Murders in the Zoo ছবিতে গরম্যানের ভীষণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—লায়নেল য়্যাট্‌উইল। এই অভিনেতার সম্বন্ধে আমরা আজো বিশেষ কিছু জানি না বটে, কিন্তু ওদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠা বড় কম নয়। এই সংখ্যার "ছায়াছবির মর্ম্মকথা"য় তাঁর সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিবদ্ধ করা হ'ল।

য়্যাট্‌উইল ছাড়া এই ছবিতে চার্লি রাগ্‌লস্, ক্যাথলিন বার্ক্ (যাকে Panther woman নামে অভিহিত করা হয়), র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ স্কট প্রভৃতি নামকরা নট-নটীরা নেমেছেন।

ছায়াছবির মর্ম্মকথা—একটি অভিনেতাকে এই সংখ্যায় আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করব। তাঁর নাম—**লাওনেল য়্যাট্‌উইল**। যে-ধরণের ভূমিকায় তিনি যশ অর্জ্জন করেছেন সে-ধরণের অভিনয়ে তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ছবির পরদার ভিতর দিয়ে দর্শকদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করাই তাঁর কাজ। এবং সে-কাজে তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী লন চ্যানিকেও নাকি অতিক্রম করেছেন।

লন চ্যানির মধ্যে আমরা দেখতাম, যা কিছু কুশ্রী যা কিছু ভয়াবহ, তা যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। মেক্‌-আপের কলা-কৌশল তাঁর কাছে ছিল যেন পুস্তকের খোলা-পাতা; তার সকল রহস্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। গ্রোটেস্ক্‌ মেক-আপে তাঁর জোড়া ছিল না।

•

লাওনেল য়্যাট্‌উইল সাড়ম্বর রূপসজ্জা আদৌ পছন্দ করেন না। মুখের উপর রং, চর্ব্বি, আঠা প্রভৃতি লেপন করতে তাঁর অসীম বিরাগ। তাঁর অভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দর্শকের মনে তিনি ভীতি সঞ্চার করেন—বীভৎস রূপসজ্জার দ্বারা নয়—নিজের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী-শক্তি এবং দুই গভীর চোখের সম্মোহনী-দৃষ্টির দ্বারা! য়্যাট্‌উইলের কাছে অদ্ভুত রূপসজ্জা নিতান্তই খেলো জিনিষ—মনের শক্তিই, তাঁর মতে অভিনেতার সব চেয়ে বড় সম্পদ! অন্তরের এই শক্তি, এই দুর্নিবার্য্য magnetiom য়্যাট্‌উইলের সমস্ত ভূমিকাকেই প্রাণবন্ত ক'রে তোলে—যে-বীভৎস ভূমিকার অভিনয়ে তিনি অবতীর্ণ হন, সেই চরিত্রের সকল কদর্য্যতাই সকল ভীষণতাই যেন তাঁর মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
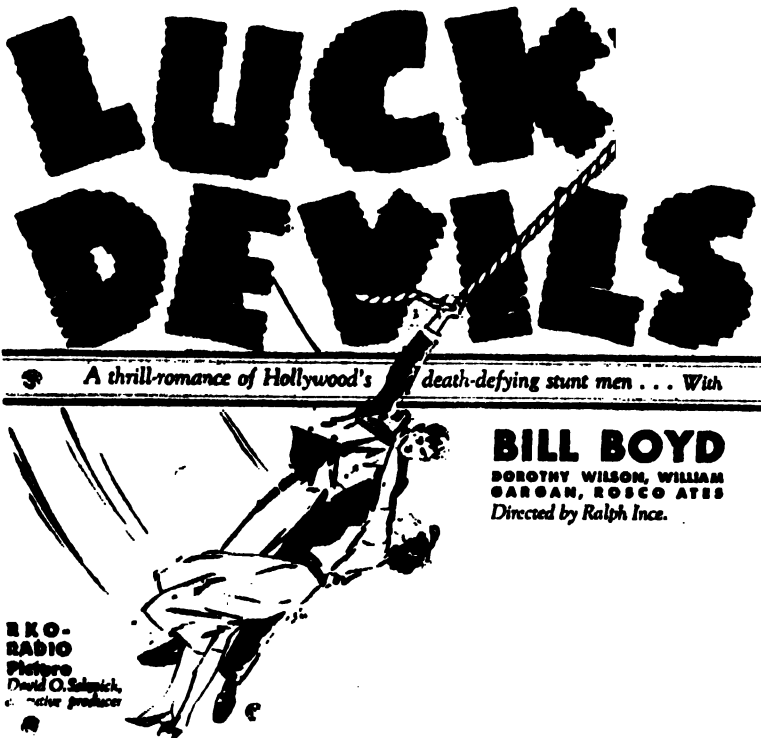
লাওনেল য়্যাট্‌উইলের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সব চেয়ে যা আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর দুই চোখ,—তাঁর সতেজ মনের ছবি যার মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে সেই দুই চোখের অতলস্পর্শী দৃষ্টি শীঘ্র ভুলতে পারা যায় না, এমনি তাদের সম্মোহনী শক্তি!

তাঁর সঙ্গে লন চ্যানীকে তুলনা করার প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত সমালোচক বলছেন—Chaney portrayed the monster type, a type that by its sheer inherent hideousness, struck terror into the heart of the victim. Not a detail of make-up was omitted that might help to achieve the effect of repulsion. Atwill, on the other hand, prefers to play such roles "straight," to strike terror into the sou's of those who oppose him, by sheer mental superiority, by playing in subtle fashion upon their imagination!

•

লাওনেল য়্যাট্‌উইল সম্প্রতি ওদেশে একখানি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিখানির নাম—The Sphinx! ওই ছবির ভূমিকা নাকি তাঁর চিত্রনট-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা। ওই ভূমিকার অভিনয়ে দর্শকদের কল্পনাকে ক্রীড়াশীল করবার জন্যে তিনি কোন প্রকার রূপসজ্জার সাহায্য গ্রহণ করেন নি। তবুও তাঁর অভিনয় দেখে আতঙ্কে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—এমনি অনন্যসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় তিনি এই ছবিতে দান করেছেন। যে-ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়াবহ! এক ক্রোড়পতি দানশীল ব্যক্তিকে একাধিক হত্যার অপরাধে সন্দেহ করা হয়েছে। লোকটি কালা এবং বোবা। সন্দেহ করা হ'লেও তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় না। বোবা ব'লে তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পার পেয়ে যান, কারণ যতবার হত্যাকার্য্য সাধিত হয়েছে ততবারই হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর কেউ-না-কেউ শুনতে পেয়েছে।

এই কালা-বোবা ধনকুবেরের অভিনয়ে য়্যাট্‌উইল অসাধারণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন—realism that is uncanny! তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয়, বোবা-কালার চরিত্র তিনি পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করেছেন—কেমন ক'রে তারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাত-মুখ নাড়ে, কেমন ক'রে বড় বড় দুই চোখের ভাষাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে তারা মনের কথা বলবার চেষ্টা করে, য়্যাট্‌উইলের অভিনয়ে এই সব অদ্ভুত অভিব্যক্তি অপূর্ব্ব হ'য়ে দেখা দিয়েছে!

Lionel Atwill is our new Lon Chaney, minus Chaney's grotesque trappings, a player who thrills as against our will, Oh! those eyes!

•

বর্ত্তমানে হলিউডের নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কোন্‌ কোন্‌ ছবিতে কাজ করছেন তার খবর দেওয়া গেল—

জন ব্যারিমুর মেট্রোর কারখানায় Night flight-এর কাজ শেষ ক'রে এখন ছুটিতে আছেন। লাওনেল ব্যারিমুর ঐ ষ্টুডিওয় Bride of the Bayow নামক ছবি তুলছেন। জর্জ্জ আর্লিস ওয়ার্ণার-ভায়াদের তরফে Voltair-এর কাজ শেষ করেছেন। লাওনেল য়্যাটউইল ইউনিভার্সালের তরফে The Secret of the Blue Room তুলছেন।

জোয়ান ক্রফোর্ড মেট্রোর ঘরে The Dancing Lady-তে নিযুক্ত আছেন। গ্রেটা গার্বো ওইখানেই তুলছেন—Queen Christina! হেলেন হেইজ্‌ তুলছেন—The Old Maid! মীর্ণা লয়—Night flignt!

ওয়ালেস বেরী ইউনাইটেড আর্টিষ্টদের তরফে The Bowery নামে ছবিতে অভিনয় করছেন। ক্লাইভ্‌ ব্রুক্‌ সম্প্রতি প্যারামাউন্ট্‌ ষ্টুডিওর Midnight Club-এর কাজ শেষ করেছেন। এডি ক্যান্টর ইউনাইটেড আর্টিষ্ট ষ্টুডিওর Roman Scandals প্রস্তুত করছেন। মরিস্‌ শিভ্যালিয়ে প্যারামাউন্টের The Way to Love ছবিতে অভিনয় করছেন।

মেরিয়ন ডেভিস মেট্রোর নতুন ছবি The Barretts of Wimpole

Street ছবিতে আজকালের মধ্যে কাজ সুরু করবেন। মার্লিন ডিয়েট্রিক্ প্যারামাউন্টের Song of Songs-এর কাজ শেষ ক'রে এখন ছুটি ভোগ করছেন। ডোলরেস্ ডেলরিও রেডিও পিকচার্সের Green Mansions নামক ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নির্ব্বাচিতা হয়েছেন। মারি ড্রেসলার সম্প্রতি মেট্রো র তরফে Tugboat Annie নামক ছবির কাজ শেষ করেছেন।

বাকী অভিনেতা-অভিনেত্রীর খবর আসছে হপ্তায়!

*

রূপবাণীতে কাল থেকে রেডিও পিক্চার্সের বহুবিখ্যাত চিত্র Bring them Back Alive আরম্ভ হবে। কয়েক হপ্তা পূর্ব্বে এই অনন্য-সাধারণ বন্য-চিত্রের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এমন-তরো ভয়াবহ বাস্তবদৃশ্য পরিপূর্ণ পশু-সংগ্রহের ছবি আর একখানিও আসে নি।

উক্ত ছবিখানি ব্যতীত রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষ ফক্স, ইউনিভার্সাল এবং রেডিও পিকচার্সের অনেকগুলি বাছাই-করা ভাল ছবি তাঁদের ছবিঘরে দেখাবার আয়োজন করেছেন। তাদের মধ্যে Zoo in Budapest নামে ছবিখানি রূপবাণীতেই প্রথম এ-শহরের দর্শকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। তাছাড়া, Cohens aud Kellys in trouble, Rebel, Fig Cage, King Kong প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলিও উক্ত সিনেমার পরদায় প্রতিফলিত হবে।

এই সূত্রে নাচঘরের গত সংখ্যায় প্রকাশিত "কিং কং নামক লেখাটির প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*

নিউ থিয়েটার্সের "মীরাবাঈ" খুব সম্ভব নভেম্বরের গোড়ার দিকেই 'চিত্রা'য় আত্মপ্রকাশ ক'রবে।

প্রয়োগ-কৌশল

তিন

প্রযোজকের কার্য্যসূচী

(মণিকা ইউয়ার)

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

যে-কোন নাট্যপ্রতিষ্ঠানের সব চেয়ে দরকারি ব্যক্তিটি হ'চ্ছেন, প্রযোজক। সর্ব্বগুণসম্পন্ন হ'তে হবে তাঁকে। যন্ত্র-সঙ্গীতের রস উপভোগ থেকে আরম্ভ ক'রে নাচের সূক্ষ্মগতির ইঙ্গিতও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবে না।

আজকালকারের থিয়েটারে প্রযোজকের দাম খুব বেশী। প্রযোজকের মর্য্যাদাকে থিয়েটার সংক্রান্ত কোন লোকেই এড়িয়ে যায় না। দর্শকরাও আজকাল প্রযোজকের কলানৈপুণ্যের পরে নির্ভর ক'রে তাঁর দ্বারা প্রযোজিত নাটকের বিচার করে।

অনেক অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ই পেশাদারি প্রযোজকের শরণাপন্ন হ'তে চান, নাটক যাতে দর্শনযোগ্য হ'য়ে ওঠে, তার জন্যে। প্রথম নাটক খোলবার সময় তাঁরা যদি পেশাদারী প্রযোজক জোগাড় করেন তাহ'লে ক্ষতি নেই। কিন্তু তারপর আর না। কারণ মঞ্চের কর্ণধার হ'চ্ছেন প্রযোজক এবং সেই প্রযোজককেই যদি বারবার সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে টেনে আনতে হয় তাহ'লে ক্ষতি হবে এই যে সম্প্রদায়ের কোন লোকই সৃজনক্ষম চেষ্টা ও পরীক্ষা করবার লিপ্সা নিয়েও কোনদিনই প্রযোজক তো দূরের কথা থিয়েটারকে ভালরকমে চিন্‌তে পারবে না। অবৈতনিক নাট্যপ্রতিষ্ঠান গ'ড়েও যদি আপনারা বাইরের শিল্পী ভাড়া ক'রতে সুরু করেন তবে এরকম নাট্যপ্রতিষ্ঠানের কোন দরকার নেই।

… যাক্, ধরা গেল যে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাটক নির্ব্বাচিত হ'য়েছে এবং প্রযোজকের সাহায্যে সেই নাটকের রূপের পরিকল্পনা ইত্যাদি চল্‌ছে।

* * *

*

মহলা আরম্ভ হবার আগে থাকতেই প্রযোজকের কাজ সুরু হয়। তাঁর কাজ হ'চ্ছে এমন সহজ উপায়ে নাটকটিকে দর্শকসমক্ষে বার ক'রতে হবে যাতে-ক'রে নাটকের আবেদনকে কোন দর্শকই অগ্রাহ্য ক'রবার সাহস না পায়। নাট্যকারের স্বপ্নকে বাস্তবের সাজ পরিয়ে তাকে জ্যান্ত ক'রে তুল্‌তে হবে।

সব ক্ষেত্রেই যে প্রযোজককে নাটকের জন্যে বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে তার কোন মানে নেই। নাট্যকার যদি পাকা হন তাহ'লে প্রযোজকের কাজের ভার ক'মে যায় বহুল পরিমাণে। কারণ নাটকের মধ্যেই প্রযোজকের সমস্যার সমাধান থাকে। তবে প্রত্যেক নাট্যকারের হাত পাকা না হ'লে সেই কাঁচা নাট্যকারের নাটকের জন্যে প্রযোজকের কি কর্ত্তব্য, আমরা এখানে তাইই বিবেচনা করবো। এমনিতর নাট্যকারের নাটকের মধ্যে পড়ুয়াদের মস্তিষ্কচালনা ক'রতে হয় বেশ ভালরকমেই।

প্রথমেই বার তিন-চার নাটকটি আগাগোড়া প'ড়ে ফেলতে হবে। এটা প্রযোজককে ভুললে চ'লবে না যে, যে-কোন আর্টের তুলনায় বিভিন্ন বুদ্ধি

সম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের লোককে থিয়েটারি আর্ট সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। এই বিভিন্ন-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের মনে স্বাভাবিক ভাবে কিরকমে আঘাত ক'রে সফলকাম হওয়া যায় তা' প্রযোজকের জানা উচিত। ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত জিনিষ ভালভাবে বুঝে প্রযোজককে কাজে এগুতে হবে। অসম্পূর্ণ মাল-মসলা থেকেই তাঁকে সম্পূর্ণতার সীমানায় পৌঁছবার চেষ্টা ক'রতে হবে। নাট্যকারের ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁকে নিজের ধারণাগুলো শিল্পীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্রের মতনই অনেক সময়ে অচল—তাঁদেরকে সুরে বেঁধে নিতে হবে।

নট-নটীদের ঠিকমত চালনা ক'রলেই প্রযোজকের কাজের শেষ হয় না। দৃশ্যপট, আলো, সাজ-পোষাক, বাদ্য-সঙ্গীত—আসলে যে-কোনটির ভিতর দিয়ে যদি দর্শকদের চিত্ত কিঞ্চিৎমাত্রও দোলানো যায়, তাদের মনে একটুও আঁচড় কাটতে পারা যায়, তার দিকে প্রযোজকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা উচিত। তাঁর নৈপুণ্য যাতে অতি সরল দর্শকও বুঝতে পারে এইরকম ভাবেই তাঁকে কাজ ক'রতে হবে।

গর্ডন্ ক্রেগ্ বলেছেন: "নাটক, অভিনয়, দৃশ্যপট বা নাচ কোনটাকেই থিয়েটারের আর্ট বলা চলে না,—it consists of all the elements of which these things are composed; কথাই হ'চ্ছে নাটকেরদেহ, গত হ'চ্ছে অভিনয়ের মূল শক্তি, দৃশ্যপট নিজেকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে পারে শুধু মাত্র রেখা ও বর্ণসমষ্টির মধ্যে দিয়েই, ছন্দই নাচের জীবন! এখানে কোনটাই অপর কোনটার চেয়ে বেশী দরকারি নয়।" অর্থাৎ element বা মূল পদার্থগুলির প্রকৃত মিলন ঘটাতে পারলেই উঁচুদরের আর্ট সৃষ্টি ক'রতে পারা যায়।

দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যপটের আসবাব-পত্র নিয়েই আপনাকে প্রথমে হাতে-নাতে কাজে লেগে যেতে হবে। 'Movable flats' যদি হাতে থাকে তাহ'লে দরজা, জানলা ইত্যাদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেখানে ইচ্ছা বসাতে পারেন। দৃশ্যপটের কাজে লাগবার আগে আপনার স্থাপত্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ টনটনে জ্ঞান থাকা চাই। চতুর্থ দেওয়াল দর্শকদের দিকে ধ'রে নিয়ে জানলা, দরজা ইত্যাদি এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে-ক'রে নাটক সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাবার সুবিধে পায়। আলোর দ্বারা আর্টের কৌশল দেখাতে গেলে জানলাই সাহায্য করে সবচেয়ে বেশী। তবে সাবধান, তিনটি দেওয়াল সাজানোর মধ্যে দিয়ে যেন না বদ্ধ কারাগারের ভাব ফুটে ওঠে।

দৃশ্যপটের জন্যে সর্ব্বদাই চৌকো চৌ-কোন বিশিষ্ট 'Set'-এর দরকার নেই। একটু তেরচা বা কোণ-বার-করা দৃশ্যই বেশী ফল দেবে। দৃশ্যপটের একটা নক্সা এঁকে বিভিন্ন উপায়ে কি-রকমে সেগুলো সাজানো যায় তার খসড়া ক'রে ফেলতে হবে। ভিন্ন রকমের angle বা কোণের দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্য তৈরি ক'রতে পারা যায়।

দৃশ্যপটের পালা সাঙ্গ হবার পর আসবাব-প্রশ্নের দিকে মন দিতে হবে। সব চেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিষ তাইই প্রথমে সাজাতে হবে। আসবাব পত্রের দ্বারা কখনই মঞ্চকে বোঝাই ক'রে তুলবেন না। যে-সব জিনিষ গতিকে প্রকাশ বা সাহায্য করে, এমন সব জিনিষই মঞ্চে স্থান পাবে। এবং সে-সমস্ত স্থাপন ক'রতে হবে এমন ভাবেই যে দর্শকরা যেন সে সব জিনিষ রাখবার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। দর্শকের দৃষ্টি বা বুদ্ধিকে আহত না ক'রে পারে না এমন জিনিষের উপকারিতা থাকলেও তাকে বাতিল ক'রতে হবে।

মঞ্চের বাহ্য অঙ্গসজ্জার সু-ব্যবস্থা করবার পর প্রযোজককে নাটকের দিকে মন দিতে হবে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের প্রতিটি গতি, প্রতিটি বিশিষ্ট কথার উপর ঝোঁক, বিরাম, লয়ের মাত্রা ইত্যাদি, আসলে সম্পূর্ণ মহলা দেবার পূর্ব্বে তাঁকে সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিষয় ঠিক ক'রে রাখতে হবে।

প্রত্যেক চরিত্রের বিষয় প্রযোজকের অনেক কিছুই ভেবে রাখতে হবে, কি-ধরণের নট-নটীর দরকার, অভিনয়-ধারা কি-পদ্ধতিতে সুরু হবে ইত্যাদি। তবে এ-বিষয়ে যদি নাট্যকারের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ সুরু করা যায় তবে অনেক সুবিধা। নাটকটির প্রতি লাইন ভাল ক'রে পড়বার আগে যদি নাট্যকারের সঙ্গে বইটির সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা করা যায় তাহ'লে আরো ভাল হয়। নাট্যকার তখন প্রথম কয়েকটি মহলায় যোগদান ক'রতে পারেন। তারপর তিন-চার সপ্তাহ তাঁর না আসাই উচিত। আবার যখন তিনি ফিরবেন তখন তাঁর মন থাকবে টাট্‌কা, পুরাণো আবহাওয়া হ'তে মুক্ত। এই অবস্থায় তিনি নাটকের জন্যে আরো অনেক মূল্যবান ইঙ্গিত দিতে পারবেন। যদি তিনি মাঝের ঐ তিন-চার হপ্তা বাদ না দিয়ে প্রত্যহই মহলায় উপস্থিত থাকতেন তাহ'লে তাঁর সমালোচনী শক্তি বিকাশলাভ ক'রতে পারবে না। এবং প্রযোজকের পক্ষেও এটা মস্তবড় একটা গুণ যে হাজার বার কোন কথা শোনবার পরেও সেটা যে ভুল হ'চ্ছে তা বুঝে শুধরে নিতে পারা। একটা কথা যদি বারবার উচ্চারণ করা যায় তাহ'লে তার মানের মূল্য কমে আসে। এবং সেই কারণে কেবল নাট্যপ্রতিষ্ঠানে প্রযোজকের বিচারশক্তিও বারবার মহলা শুনে অনেকটা 'ভোঁতা মেরে' যায়। এমনও দেখা গেছে যে মহলার পূর্ব্বে যে-জিনিষটাকে মন্দ ব'লে প্রযোজক আপত্তি তুলেছিলেন তাইই কিছু পরে তাঁর কাছে আর আপত্তিকর ঠেকেনি। এ-থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে, মাঝে-মাঝে অন্যের দ্বারা সেই ভূমিকা অভিনয় করানো।

মহলার পূর্ব্বে যা প্রযোজক ঠিক ক'রেছেন তার কিছুই যে পরে বদলানো হবে না, এমন কোন কথা নেই, তবে অনেক প্রযোজকই এই পদ্ধতিতে কাজ করেন। তাঁরা মহলার জন্যে যত না কালক্ষেপ করেন তার চেয়ে বেশী করেন নিজের জন্যে। মহলার সময় তাঁরা কিছুই বদলাতে চান্ না—কারণ দেখান যে, তাঁদের ঠাণ্ডা মাথায় যে ভাবের উদয় হয়েছে, তার তুলনায় মহলা-কালীন ভাব অনেক অংশেই নিকৃষ্ট হবে। তবে এ-ধরণের প্রযোজকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

প্রযোজকের কল্পনার শেষ তুলির টান চলে মহলার স যখন বাস্তবে পরিণত হ'তে দেখা যায় তখন তার পূর্ব্ব-রূপের এত পরিবর্ত্তন হয় যে তাকে কোনক্রমেই পূর্ব্বাবস্থায় ভাবতে পারা যায় না। মলার সময় প্রযোজকেরও ঠিক সেই দশা হয়। মহলার সময় অনেক

নট-নটী মূল্যবান ইঙ্গিত দিতে পারেন, সেদিকে প্রযোজকের কান দেওয়া উচিত। কল্পনা-অনুযায়ী প্রযোজকের সঙ্গে অনেক নট-নটীর কণ্ঠস্বরের মিল না হ'তেও পারে, অনেক হাব-ভাব ভালোভাবে ফুটে নাও উঠ্‌তে পারে। এক্ষেত্রে সোজা উপায়ে যাতে সেই 'effect' সৃষ্টি করতে পারা যায় তারই পথ প্রযোজককে বার করতে হবে।

তবুও মহলার সময় অনেক পরিবর্ত্তন হবে ব'লে প্রযোজক যে নিজের ইপ্সিতকে পরিত্যাগ ক'রবেন তা নয়, তাহ'লে মহামুস্কিল বেধে যাবে। তিনি নাটকের রূপ ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে কি কি চান তা তাঁর কাগজে-কলমে লেখা থাকবে।

এর পর ভূমিকা-নির্ব্বাচন ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে, খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে কোন ভয় এবং অনুগ্রহ না ক'রে উপযুক্ত নট বা নটীকে উপযুক্ত ভূমিকা অর্পণ ক'রতে হবে। যদি নাট্য-প্রতিষ্ঠানের পারগতার সঙ্গে প্রযোজকের পরিচয় না থাকে, তাহ'লে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত প্রত্যেককে পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হ'চ্ছে ততক্ষণ কোন ভূমিকাই কাউকে দেওয়া উচিত নয়। একটা মহলার আয়োজন করিয়ে প্রত্যেককেই কতকগুলো ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে দিতে হবে। এথেকে তাদের শক্তির দৌড় প্রযোজক অনায়াসেই বুঝতে পারেবেন। প্রথম মুখপাতেই যদি প্রযোজকের কোন নট-নটীর অভিনয়-ক্ষমতার উপর সন্দেহ জাগে তাহ'লে এই ব্যবস্থা ক'রতে হবে যে, অমুক নট বা নটী অমুক ভূমিকায় এখন কিছুদিন অভিনয় করুক। আগে থাকতেই কোন ভূমিকা কাককে ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত নয়। কারণ পরে হয়তো সেই ভূমিকায় নট বা নটীটি কোন সুবিধা ক'রতে পারছে না দেখেও তার থেকে ভূমিকা কেড়ে নেওয়া কষ্টকর। সুতরাং কিছুদিন না যাওয়া পর্য্যন্ত ভূমিকা নির্ব্বাচনে কাকুকে নিশ্চয়তা প্রদান করা উচিত নয়।

অনেক নাট্য-প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা বণ্টন হয় প্রতিযোগিতার দ্বারা। কোন একটা ভূমিকা পাবার জন্যে যারা উৎসুক, তাঁদের নিরপেক্ষ দুইজন বিচারক ও প্রযোজকের সম্মুখে একটা নির্দ্দিষ্ট দৃশ্যের অভিনয় ক'রতে হয়। এবং প্রত্যেক চরিত্রের জন্যেই এইরকম প্রতিযোগিতা চলে।

তবে প্রযোজক যদি তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত থাকেন তাহ'লে ভূমিকা-নির্ব্বাচন ব্যাপারটি খুব সহজেই শেষ হয়। ছোট-ছোট ভূমিকার অভিনয়ের জন্যে অনেক সময়ে বিবেচনা ক'রে ভাল নট বা নটীর নির্ব্বাচন ক'রতে হয় কারণ অনেক ভূমিকাই আকারে ছোট হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় অভিনয়ের দিক দিয়ে খুব শক্ত। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারা সত্যসত্যই কর্ম্মী নট বা নটী তা' প্রযোজকের জানা দরকার। অনেক সময়ে এই কারণেই খুব উঁচুদরের অথচ নির্ভরযোগ্য নয়, এমন নট বা নটীর তুলনায় ঠাণ্ডামাথা-ওলা অপেক্ষাকৃত নীচুদরের অথচ নির্ভরযোগ্য নট বা নটীকেই অভিনয়ে নামানো উচিত।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কোন নট বা নটীকে খুব ছোট ভূমিকা প্রদান ক'রে খেলো করবার দরকার নেই। তবুও তিনি সেই ছোট ভূমিকাতেই সুন্দর অভিনয় ক'রে অপরাপর ভূমিকাকে 'ম্লানিয়ে' দিতে পারেন। তেম্‌নি কোন অনিন্দ্যসুন্দর দুর্ব্বল নট বা নটীকেও কোন ভূমিকায় নামিয়ে সহ নট বা নটীদের উপর প্রবল হ'তে দেওয়া উচিত নয়। 'তারকা পদ্ধতি' সৃষ্টি করবার দরকার নেই, অর্থাৎ একই নট বা নটীকে সর্ব্বদাই প্রধান ভূমিকায় নামাবার দরকার নেই।

'Understudy' যারা তাঁদেরও ছোট ছোট ভূমিকায় নামাতে হবে। আর ছোট ভূমিকাও যে-কোন মুহূর্ত্তে ব'দলে ফেলা যায় আসল নাটককে কিছুমাত্র ক্ষতি না ক'রেই, কিন্তু বড় ভূমিকার বেলায় সেটি চ'লবে না। 'Understudy'—দের ভূমিকা কণ্ঠস্থ ক'রতে হবে, মহলা দিতে হবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মহলা বন্ধ না রেখে তাঁরা অমুক নট বা নটীর অনুপস্থিতিতে বা বিলম্বে মহলায় যোগদান ক'রতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানটি যতই কাঁচা হোক্ না কেন তবুও তার মধ্যে কর্তৃপক্ষ-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। এঁদেরই একজন হবেন মঞ্চাধ্যক্ষ, একজন

হবেন সম্পত্তিরক্ষক, একজন তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক, একজন পরিচ্ছদ-কর্ত্রী এবং একজন প্রচার-কর্ত্তা। প্রত্যেক কর্ম্মীই আপনাপন কাজের সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শস্থানীয় ক'রে তুলতে পারেন।

যদি ছোট-ভূমিকার অভিনেতাদের ওপর এই সব বিভাগের ভার দেওয়া যায় তাহ'লে খুব সুফল ফলবে আশা করা যায়। যদি প্রযোজক মশাই মঞ্চাধ্যক্ষকেই কোন ক্ষুদ্র ভূমিকায় নামান তাহ'লে প্রধান চরিত্রের মতই এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয়ে অনেক কিছুই সাহায্য ক'রবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি ও পারগতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক বাতী ও 'ফিউস' সম্বন্ধে সব কিছুই জানবেন; সম্পত্তি-রক্ষক সব কিছু জিনিষের সহিত পরিচিত থাকবেন; পোষাক বিষয়ে পরিচ্ছদ-কর্ত্রী হবেন সবজান্তা; প্রচার-কর্ত্তার সঙ্গে মুদ্রনকার্য্য ও লিখন-কার্য্যের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ থাকা উচিত।

মঞ্চাধ্যক্ষকে প্রযোজক মশাই "scene plot" দেবেন, তড়িৎ-বৈজ্ঞানিকে "light plot" দেবেন, সম্পত্তি-রক্ষককে দেবেন নানাবিধ আসবাব-পত্রের ফর্দ্দ—এবং এসবের পরিচালনার ভার থাকবে তাঁদেরই হাতে। মহলা আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই এসব সেরে ফেলতে হবে।

এই রকম প্রত্যেকের ওপর বিশিষ্ট কাজের ভার দিলে পর প্রত্যেকেই সাফল্যলাভ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রবেন এবং সাফল্যের জয়-মুকুট মাথায় প'রে আরো উৎসাহন্বিত হবেন। ছোট-ছোট অংশের অভিনেতারা আর কিছু কাজ করবার নেই ব'লে দৃশ্যের একপাশে দাঁড়িয়ে বাজে কথায় মন দেবেন না। প্রত্যেকেরই কাজ ভারী নয় অথচ কমও নয়, যথোপযুক্ত। প্রযোজক সাফল্যের জন্যে প্রত্যেক কর্ম্মীকেই উৎসাহ দেবেন এবং খুব সদ্ভাবের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ ক'রবেন। প্রযোজকই প্রতিষ্ঠানটির সুরদাতা। প্রযোজক যদি সকলকে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে চালাতে পারেন তবে তাঁরাও কখনো বেসুরো ব'লবেন না। প্রযোজক নিজে যদি আগ্রহশীল হন তাঁরাও হবেন; প্রযোজক যদি বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হন তাঁরাও ঐ-রকম হ'তে বাধ্য।

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র,টাকাকড়ি,বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ৩০২ নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে বিরাট অভিনয় আয়োজন

নাট্য নিকেতন

[রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট ফোন নং ৯৫১ বড়বাজার]

শুক্রবার—২৭শে অক্টোবর, বেলা ৪॥ টায়

গৈরিক পতাকা

শিবাজী—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
বীরাবাঈ—শ্রীমতী নীহারবালা

পোষ্যপুত্র

শ্যামাকান্ত—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
রজনীনাথ—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিনোদ—শ্রীশৈলেন চৌধুরী
হেমেন্দ্র—শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
শিবাণী—শ্রীমতী শান্তবালা
শান্তি—শ্রীমতী সুশীলা (ছোট)

শনিবার—২৮শে অক্টোবর, বেলা ২ টায়

কর্ণার্জ্জুন

কর্ণ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
শকুনি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বৈকুণ্ঠের খাতা

বৈকুণ্ঠ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
কেদার—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

রবিবার—২৯শে অক্টোবর, বেলা ২ টায়

মন্ত্রশক্তি

মৃগাঙ্ক—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
কৃষ্ণপ্রিয়া—শ্রীমতী কুসুমকুমারী
বাণী—শ্রীমতী শান্তবালা
অজা—শ্রীমতী সুশীলা (ছোট)

বৈকুণ্ঠের খাতা

(ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ)

শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজার
ছুটী উপলক্ষে—

রঙমহলে

৭৬।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট] [ফোন ২৪৪৫ বড়বাজার

শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর বৈকাল ৫ টায়
শনিবার ২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৭ টায়
রবিবার ২৯শে অক্টোবর বেলা ৩॥ টায়
মঙ্গলবার ৩১শে অক্টোবর রাত্রি ৭ টায়

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর

মহানিশা

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক নাট্যরূপান্তরিত
বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্যমণ্ডিত নাটক

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।
এখন হইতে প্রবেশ-পত্র পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের
নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

অশোক

মহলা চলিতেছে।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১৭ই কার্ত্তিক,
১৩৪০

নাট্যজগৎ

বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় যে উঁচু-দরের নয়, এ-কথা সপ্রমাণ করবার জন্যে কেউ আজ আর তর্ক করে না। সকলেই একমত। কিন্তু রঙ্গালয়ের বাইরে যে সব উঁচু-দরের অভিনেতা আছেন; তাঁরা যদি রঙ্গালয়ের ভিতরে প্রবেশ না করেন, তাহ'লে আমাদের থিয়েটার অভিনয়ের দর উঁচু হবে কেমন ক'রে?

রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-সব একের নম্বরের অভিনেতা পালে পালে বিচরণ করছেন, তাঁরা যদি আজ বাংলা থিয়েটারের খাতায় নাম লেখাতে রাজি হন; তাহ'লে শিশির ভাদুড়ী ও অহীন চৌধুরী প্রভৃতি অনেককেই যে মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় ব'সে পস্তাতে হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আবার, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও যে কত সেরা নোটো আছেন, সকলের তা জানা নেই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর
সাবিত্রী—চিত্রে
সাবিত্রী—শান্তিগুপ্তা সত্যবান—জীবন গাঙ্গুলী

সংপ্রতি একজন গত-যুগের সাহিত্যিক বুড়ো-বয়সে যে সখের অভিনয় সুরু করেছেন, সেই খবরটাই সকলকে জানাতে চাই। ... ... ইতিমধ্যেই এঁর তিন মূর্ত্তি আমরা দেখেছি। ইনি প্রথমে ছিলেন সত্যিকার সাহিত্যিক; তারপর হ'লেন ইনি খবরের-কাগজওয়ালা; তারপর হ'লেন ওঁচা বিলাতী "রেলওয়ে-উপন্যাসে"র ততোধিক ওঁচা অনুবাদক। এখন এঁর অভিনয় করবার সাধ হয়েছে। এঁর নাম শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়।

*

"মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় দীনেন্দ্রবাবু "সে কালের স্মৃতি" লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভালো কথা। কেউ বাধা দেবে না। সেকালের মানুষের সেকেলে মুখ থেকে সেকালের কথা শুনতে একালের অনেকেরই আগ্রহ হবার কথা। কিন্তু এই সুযোগে দীনেন্দ্রবাবু কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত যে-সব কাণ্ড আরম্ভ করেছেন, তা সাহিত্যও নয়, সেকালের কথাও নয়, তা অদ্ভুত প্রহসনের অভিনয় মাত্র—অতএব 'নাচঘরে' অনায়াসেই তার ঠাঁই হ'তে পারে।

*

দীনেন্দ্রবাবুর "সে কালের কথা" কি-রকম? না, জনৈক একালের পুরাতত্ত্ববিদকে এবং জনৈক একালের কবিকে শাসানো হ'য়েছে এই ব'লে যে, শীঘ্রই হাটের মাঝে তাঁদের হাঁড়ি সশব্দে ভেঙে দেওয়া হবে। এবং তৎপূর্ব্বেই তিনি এমন একটা 'মস্তভাগর' 'সত্যকথা' ব'লে ফেলেছেন, যা শোনবার জন্যে এতদিন সমস্ত গৌড়জন বিনিদ্র হয়ে অপেক্ষা করছিল। কী সেই সত্যকথাটা? শ্রীযুক্ত জলধর সেনের খ্যাতির ভিত্তি যে "হিমালয়" ও "প্রবাস-চিত্র"

তার আসল লেখক হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়! তরুণ বয়সে দীনেন্দ্রবাবু যখন জলধরবাবুর ছাত্র হয়ে লেখাপড়া শিখছিলেন, তখনই তিনি নাকি ঐ বইদুখানি ভক্তিভরে মাষ্টার মশাই জলধরবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন। এবং, সেই লেখারই তলায় বিপুল পুলকে নিজের নামসই ক'রে জলধরবাবু আজ এত বৃহৎ হয়েছেন! ... ... জলধরবাবুর খ্যাতির ভিত্তির তলায় এ এক প্রচণ্ড 'ডিনামাইট'!

*

বিস্ময়ের কথা বটে। কিন্তু বিস্মিত হবার আগে দুটি প্রশ্ন মনে জাগে। সত্যবাদী দীনেন্দ্রবাবু যে মহাসত্য লুকিয়ে রেখে যৌবন ও প্রৌঢ় বয়স পার হয়ে বার্দ্ধক্যেরও বাহির-মহল ছেড়ে অন্দর-মহলে গিয়ে ঢুকেছেন, ঝুলির ভিতর থেকে হঠাৎ আজ তাকে বার ক'রে দুলোয় ঝেড়ে ফেল্লেন কেন? এবং "হিমালয়" ও "প্রবাসচিত্র" যে তাঁরই রচনা, এটা প্রমাণিত করবার জন্যে প্রমাণের মত কোন প্রমাণই তিনি দাখিল করতে পারেন নি কেন? তাঁর মুখের কথা লোকে যে বেদব্যাসের কথা ব'লে ভ্রম করবে না, এটুকুও কি সহজ-বুদ্ধিতে তিনি বুঝতে পারেন নি?

*

অবশ্য এতদিন পরে জলধরবাবুর পক্ষে মানহানিকর ও মারাত্মক এই কথাটা প্রকাশ করবার একটা কারণ দীনেন্দ্রবাবু নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই ব'লে ফেলেছেন। আজ জলধরবাবু 'রায়-বাহাদুর' ও তাঁর কেতাবের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়; অথচ দীনেন্দ্রবাবু নাকি 'জীবন সংগ্রামে পরাভূত' ও দারিদ্র্যের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত! সক্ষম গুরুর বাড়বাড়ন্ত দে'খলে অক্ষম শিষ্যের চোখ যখন টাটায়, তখন গুরুর মুখে চুণ-কালি মাখানোই হচ্ছে সব-চেয়ে ভালো গুরুদক্ষিণা।

*

কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কি নিজের জন্যে নিজেই দায়ী নন? সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব দান কতটুকু? পুরাতন 'ভারতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও তিনি অধিকাংশ সময়ে 'ষ্ট্রাণ্ড' ও 'পিয়ারসন' প্রভৃতি বিলাতী জনপ্রিয় মাসিকপত্রে প্রকাশিত খেলো গল্পগুলিকে বিনা-'নোটিসে' আত্মসাৎ করতেন। সে-যুগের বাঙালী পড়ুয়ারা ছিলেন একটুতেই-খুসি এবং তাঁর লেখার হাতও ছিল মিষ্ট। কাজেই তাঁর লেখার অল্প-বিস্তর আদরের অভাব হয় নি। ... ... তিনি পল্লীগ্রামের ছবি আঁকতে সুরু করলেন। এবং এইখানেই আমরা শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লুম। তখনো পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় বাংলার তেমন ছবি আর কেউ আঁকেন নি। "পল্লীচিত্র" প্রকাশিত হ'ল। 'মাসিকে' দেখা ছবিগুলি আবার ভালো ক'রে দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি 'গুরুদাস-লাইব্রেরী' থেকে বইখানি কিনে আনলুম। পাঠকরাও গুণীর আদর করতে ভুললেন না, কাজেই বইয়ের বিক্রীও হ'ল না বড় কম। তারপর বেরুলো "পল্লীবৈচিত্র্য"। তাও কিনলুম, তাও সুন্দর। কিন্তু তারপরেই আবার দীনেন্দ্রকুমারের দীনতার সূত্রপাত! তাঁর যেটুকু শক্তি ছিল, ঐটুকু দেখিয়েই তা গেল ফুরিয়ে। তারপর থেকে তিনি আবার যা লিখতে সুরু করলেন, দুঃস্বপ্নেও কোন প্রকৃত সাহিত্যিক তেমন লেখার কল্পনাও করতে পারে না। বিলাতে যাদের বলে "পেনি ড্রেড্ফুল" বা "চার-পয়সা দামের-ভয়ঙ্কর" বই, সেই-সব কেতাবের অনুবাদেই দীনেন্দ্রবাবু নিজের সমস্ত শক্তি বা অক্ষমতাকে নিযুক্ত করলেন। কারণ? দু-পয়সা লাভের সম্ভাবনা!

*

আমরা ডিটেকটিভ ও চিত্তোত্তেজক উপন্যাসকে খেলো মনে করি না। আমরা তা পড়তে ভালোবাসি এবং এ-কথা মানতে গিয়ে লজ্জা পাই না। ভালো লেখকের হাতে তারাও অমর সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করতে পারে। প্রমাণ—ডুমা, ইউজিন সু, জুলে ভার্ণে, কুপার, গে-বোরিও, এড্গার অ্যালেন পো, ষ্টিভেন্সন, কলান উইল, রাইডার হ্যাগার্ড, লেব্লাঁ, ম্যাক্স পেম্বার্টন ও এইচ, জি, ওয়েল্স প্রভৃতি। এঁদের রচনা উচ্চশ্রেণীর চিত্তকেও আনন্দদান করে। কিন্তু এঁদের মত মৌলিক দান করবার ক্ষমতা তো দূরের কথা, দীনেন্দ্রবাবু যে-সব মাল নিয়ে আজ সুদীর্ঘকাল ধ'রে 'রহস্য-লহরী' লীলায়িত করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে এমন সব পুস্তকের অনুবাদ, রুচিকে যা গলা টিপে হত্যা করে। তবু, অনুবাদেও যদি কিঞ্চিৎ সাহিত্য-শ্রী পাওয়া যেত! কিন্তু সে আশাও দুরাশা মাত্র। কারণ এইসব কেতাবের তর্জ্জমা ক'রে ক'রে দীনেন্দ্রবাবুর একদা-সুন্দর ভাষাও হয়েছে আজ সম্পূর্ণরূপে অপাঠ্য। আজকালকার ইস্কুলের ছেলেদের লেখাও দীনেন্দ্রবাবুর এখনকার লেখার চেয়ে খারাপ নয়। যেমন বীজ তিনি রোপণ করেছেন, তেমন ফসলও পাচ্ছেন। আজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বইয়ের কাট্তি দেখে নিজের শূন্যগর্ভ শক্তির কথা ভুললে চলবে কেন? ... ... জলধরবাবু উত্তম, মধ্যম বা অধম যে-শ্রেণীরই লেখক হোন্ না কেন, তাঁর সম্বন্ধে এটুকু অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রের সীমানা ছেড়ে কোনদিনই তিনি কোনদিকে পা বাড়াবার চেষ্টা করেন নি। চিরদিনই তিনি সাহিত্য সেবক।

*

এবং গুরু জলধরবাবু যত বিনয়ী ও মাটির মানুষই হোন, অভিনয়-ক্ষমতাতেও তিনি যে শিষ্য দীনেন্দ্রবাবুর চেয়ে একরত্তিও খাটো নন, আশ্বিনের "মাসিক-বসুমতী"র "দুটি কথা"ই তার সেরা প্রমাণ। কারণ দীনেন্দ্রবাবুর ঐ অশিষ্ট ও কুৎসিত আক্রমণের পরেও মনের অশান্তিকে (যা স্বাভাবিক) তিনি লেখনীর মুখে প্রকাশ করেন নি (যা করা স্বাভাবিক)। তিনি বলছেন: "বিগত ভাদ্র-সংখ্যা 'মাসিক-বসুমতী'তে আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং আমার পরম প্রিয়তম ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তাঁহার 'সে কালের স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ ক'রে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাকে যে উচ্চ আসন দিয়াছেন, আমি তার যোগ্য নই, ইহা বিনয় নয়, সত্যই আমার মনের কথা। ইহা বন্ধুপ্রীতি-অন্ধতার নিদর্শন বলেই মনে করি।" সাধু, জলধরবাবু, সাধু! রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অমন আক্রমণের উত্তরে এমন মোলায়েম কথা বললে "গ্যালারি"র শ্রোতারা নিশ্চয়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাততালি দিত। কিন্তু বিনয় এখানে সীমা ছাড়িয়ে বড় বেশীদূর এগিয়ে পড়েছে—এ-রকম বিনয়ের বাড়াবাড়ির মধ্যে আন্তরিকতা ও বাস্তবিকতার অভাব। আমরা আরো দু-একজন "সাবধানী ভদ্রলোক"কে জানি, যাঁদের 'বিনয়' হচ্ছে এই জাতীয়। তাঁরা দুনিয়াকে ভালো ক'রেই চিনেছেন, কাজেই 'বিনয়ে'র সদ্ব্যবহার করতেও শিখেছেন। সাধু জলধরবাবু, সাধু!

*

কিন্তু 'সুবিনয়ী' জলধরবাবু বিনয়ের খাতিরে আসল কর্ত্তব্যটি ভোলেন নি। বিলাতের "Observer" পত্রে প্রকাশ, "Irving contended that the actor felt, and Coquelin that the actor only simulated feeling". জলধরবাবু দেখছি শেষোক্ত শ্রেণীর অভিনেতা। অভিনয়ের সময়ে তিনি ভাবের স্রোতে ভেসে যান না, দিব্য সচেতন ভাবেই নিজের ভূমিকার আসল অর্থটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারেন! তাঁর অভিনয়-শক্তির তুলনা নেই!

তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবেই তাঁর "পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু" এবং "পরম প্রিয়তম ছাত্র" দীনেন্দ্রবাবুকে একেবারে অগাধ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেছেন। এর পরেও দীনেন্দ্রবাবু যদি আবার ভেসে ওঠেন, তাহ'লে সত্যসত্যই আমরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাব! জলধরবাবু একরকম নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত করেছেন যে, "হিমালয়" ও "প্রবাসচিত্রে"র লেখক নন শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়।

*

কী ছাই অভিনয় দেখছি আমরা আজকালকার বাংলা রঙ্গালয়ে! এই অপূর্ব্ব "দীনেন্দ্র-জলধর-সংবাদে"র পর আমাদের বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে তাকালেই মনে হবে যে, অসীম আকাশের আলো-করা চাঁদের তলায় আমরা ডোবার জলে নিবু-নিবু নক্ষত্রের দীপশিখা দেখছি। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও সাহিত্য-সেবক। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে! এবং তিনি নিজেও একজন বড় সখের অভিনেতা। শরৎচন্দ্রেরও অনেক উপন্যাস রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে নাটকাকারে অভিনীত হয়েছে। এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে নটরূপে কোনদিন দেখা না দিলেও, তরুণ বয়সে অন্ততঃ একদিনের জন্যেও যে তিনি সখের অভিনেতা সেজেছিলেন, সে-কথা আমরা অনেকদিন আগে তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে দীনেন্দ্রবাবু ও জলধরবাবুর চেয়ে বড় অভিনেতা নন, এ-কথা প্রমাণিত করবার জন্যে আমরা বাজি রাখতে রাজি আছি। ... ... দীনেন্দ্রবাবু এবং জলধরবাবু! এঁদের মধ্যে কে বড় অভিনেতা? পাঠকরা এ-বিষয় নিয়ে একটু মাথা ঘামিয়ে 'ভোট' দিলে মন্দ হয় না। রঙ্গালয়ের ভিতরে ব'সে তো অনেক অভিনয়ই দেখা গেল। এখন রঙ্গালয়ের বাইরের অভিনেতাদেরই নিয়ে কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করা যাক্ না কেন!

*

'অভিনয়' মানে কি? শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান বলে, "আন্তরিকতাশূন্য (লোক-দেখান) কার্য্যকলাপ; ভাণ"। এই অর্থ অনুসারে দীনেন্দ্রবাবু ও জলধরবাবুকে অভিনেতা বলেছি ব'লে কেউ যদি আমাদের নিন্দা করেন, তা'হলে আমরা যার-পর-নাই অবাক হব। ... ... তবে, হ্যাঁ! এখানে একটা 'কিন্তু' আছে বটে! ... ... দীনেন্দ্রবাবুর অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে স্পষ্টভাবেই, জনৈক কৃষ্টি-হীন ব্যক্তির পঙ্গু কষ্টের কাহিনী। কিন্তু জলধরবাবুর সম্বন্ধে সে-কথা বলবার যো নেই। 'সাবধানী ভদ্রলোক' হ'লেও, বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিমান সভ্য ব্যক্তিদের যে-ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা উচিত, তিনি তার বেশী আর কিছুই করেন নি! তাঁর সংযম প্রশংসনীয়। গালাগালির জবাবে তিনি গালাগালি দেন নি—নিম্নশ্রেণীর লেখক (সাহিত্যিক নয়) যার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি নিজের কাজ গুছিয়েছেন। কিন্তু পরকে ছোট ক'রে নয়, নিজেকে ছোট ক'রে। এমনি কৌশল তাঁর, বিনা-প্রমাণেও জনসাধারণ তাঁর কথা মানতে আপত্তি করত না। এ একটা মস্ত আর্ট। ... ... কিন্তু জলধরবাবু কেবল বড় আর্টিষ্টের মতন অভিনয়ই ক'রে যান নি,—সেইসঙ্গে তিনি যে-সব নজিরও দিয়েছেন, তা দেখলে শুধু আমাদের কেন, তাঁর শত্রুদেরও মুখ বন্ধ হওয়া উচিত।

*

"শক্তির মন্ত্র" দুই শতবার অভিনয়ের গৌরবলাভ করেছে ব'লে, মিনার্ভা থিয়েটারে গেল বুধবারে একটি উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। অবসরের অভাবে আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত হয়েও হাজির থাকতে পারিনি বটে, কিন্তু 'মিনার্ভা'র এই অভাবিত সফলতায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। 'মিনার্ভা'র দলে একজনও হোমরা-চোমরা নট বা নামজাদা নটী নেই, তার উপরে বাজারের এই হাল; এমন দুঃসময়েও 'মিনার্ভা'র একখানি নাটকের পরমায়ু দুই শতবার অভিনয়ের পরেও ফুরিয়ে যায় নি, এ-কথা আমরা যত-বেশী ভাবছি, তত-বেশী অবাক হয়ে যাচ্ছি! "কর্ণার্জ্জুনে"র পরে বাংলার আর কোন নাটক এতবার চলে নি এবং "কর্ণার্জ্জুনে"র জনপ্রিয়তার অন্যান্য কারণেরও অভাব হয় নি। সে-সময়ে একসঙ্গে নবযুগের অনেকগুলি শক্তিধর অভিনেতা "কর্ণার্জ্জুনে"র নানা ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিলেন এবং তার উপরে তখন কিছুকাল সহরে "ষ্টার" ছাড়া আর কোন বাংলা রঙ্গালয়ই ছিল না। সুতরাং "কর্ণার্জ্জুন"কে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্যে সংগ্রাম করতে হয় নি—"শক্তির মন্ত্র"কে প্রতিপদেই যা করতে হ'য়েছে। সত্যকথা বলতে কি, 'মিনার্ভা' অসম্ভবকেও সম্ভবপর ক'রে তুলেছেন,—প্রয়োগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর বটে!

পাবনা থেকে আমাদের সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইদ্রিস্ লিখছেন :—

"স্থানীয় গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে গত ২৭শে অক্টোবর তারিখ হইতে সাম্বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে গত ২৮শে তারিখে সেখানে একখানি ছোট নাটিকা অভিনয়েরও অনুষ্ঠান হয়। স্কুলের মেয়েরা 'ভক্তির ডোর' নামে একখানি ছোট নাটিকার অভিনয় করে। ছোট ছোট মেয়েদের এই ছোট আয়োজন আমরা বেশ উপভোগ করেছি। বালক মনের হরি-ভক্তির আগ্রহ; ভক্তির একাগ্রতায় পাথরের নুড়ির মাঝেই শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন; ভক্তির টানে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের পাথর থেকে রূপ পরিগ্রহ এবং ভক্তের মারফৎ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার;—বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয় এই।—

ছোট-বড় দোষ-ত্রুটির মাঝ দিয়েও তাদের অভিনয়ে যে আমোদ আমরা পেয়েছি তা উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করবার বিষয় এই, ১১।১২ বছরের দু'তিনটী মেয়ে ছাড়া আর সবাই প্রায় ৮৯ এর কোঠায়। ভক্ত ধনার ভূমিকায় শ্রীমতী হীরারাণীর স্বভাব-সুন্দর দীরগতির ভাব ভক্তের ভাবটাকে সব-সময় জাগিয়ে রেখেছে এবং তা ভক্তের অনুরূপই হয়েছিল। শান্ত স্থির ছবির মতই তাকে আমরা উপভোগ করেছি! গানের চাপে তাকে চেপে রাখলেও দুইদিন অনাহারী ধনার ভগবান জ্ঞানে পাথরের নুড়িকে খাওয়াবার সেই আকুল আবেদন আমাদের অন্তরে লেগেছে। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় শ্রীমতী শ্যামলতার সহজ প্রবেশ ও প্রথম দৃশ্যের প্রবেশের পরে কিছুক্ষণ বলার কথা কিছু না থাকলেও ষ্টেজের ভেতর সহজ সজীব অবস্থান সত্যিই আমাদের আনন্দ দিয়েছে—অতটুকু মেয়ের কাছে এটুকু বড় কম দামের নয়। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমতী তরুলতার দেহ পোষাকের ভারে বেমানান হ'লেও তার বচন-ভঙ্গি ও তৎপরতা এবং ঠোঁটের সাথে সর্ব্বক্ষণ লেগে-থাকা সরল হাসিটুকু বেশ উপভোগের। মধুবরের (ধনার পিতা) ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলার ভাষণ সহজ, জোরালো ও স্পষ্ট। বালকগণ ও ভিক্ষুকগণের মধ্যে শ্রীমতী গীতা ও বীণা নামে মেয়ে দুটীর বচন ও প্রকাশভঙ্গি চমৎকার হয়েছে। আরও যে দু'চার জন ছিল তারাও নিজেদের ভূমিকায় ভালভাবেই অভিনয় করেছে। মোট কথা, দোষ-ত্রুটির দুঃখের উপর আনন্দটুকু বেশ স্থান পায়। শ্রীমতী মৃণালিনী নামে একটী মেয়ে নিয়তির গান গেয়েছিল। স্থানীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ও মৃণালিনীকে দুটী রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিয়েছেন। মঞ্চশিল্পী মাষ্টার মদনের নামটাও এখানে উল্লেখ করবার। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও stage-এর ভেতর যেটুকু ভাবের প্রকাশ দেখেছি তা প্রশংসার যোগ্য। একটু অসুবিধার সৃষ্টি ক'রেও stage-এর কদর্য্যতা ঢেকে রেখে এর স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য তিনি যে চেষ্টটুকু করেছেন তা ধন্যবাদ দাবী করতে পারে। আর

শেষ-দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাসমানভাবে আবির্ভাবের ideaটাও একটু উন্নত ধরণের।"

•

দক্ষিণ কলিকাতা, বেহালার চলচ্চিত্রাগার "সুচিত্রা"র প্রতিষ্ঠাতা ও সত্বাধিকারী, বিখ্যাত জমিদার ভূপেন্দ্রনাথ রায় গেল ২৫শে অক্টোবর তারিখে, মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেছেন শুনে দুঃখিত হলুম। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অস্থায়ী সভাপতি, অনারেবল স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বেহালা-অঞ্চলের জনহিতকর সমস্ত অনুষ্ঠানেই ভূপেন্দ্র নাথকে অগ্রণী দেখা যেত এবং তাঁর প্রকৃতিও ছিল অত্যন্ত মধুর ও ভদ্র। দানী, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ভূপেন্দ্রনাথের অভাব বেহালার বাসিন্দারা ভুলতে পারবে ব'লে মনে হয় না। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

কাচের বাটির আঙুর-দারায়
মুখ যে আমার মিষ্টি তোলো,
রোদ-বাদলের রামধনুতে
সাত-রঙে প্রাণ মাতিয়ে তোলো!

•

তপন হাসে, আকাশ কাঁদে,
বুক ভরে মেঘ-রোদের ছাঁদে,
পাত্র আমার উছলে ওঠে,—
এখন সখি, জগৎ ভোলো।

•

চাইনে আমি রাখতে হিসেব, শুক্‌নো মাটির ধূলো মেখে,
চিত্তে নাচে সিন্ধু-লহর দীপ্ত নয়ন-প্রভা দেখে।

*

তোমার আঁখির সুরায়, বধূ!
মন-পিয়ালা করব মধু,
আঙুর প্রিয়ে, যায় শুকিয়ে,
আঙুর-নধর অধর খোলো।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়ঃ (১) **Lucky Devils** (রেডিও পিক্‌চার্স)

প্রধান ভূমিকায়—বিল্ বয়েড্; ডোরোথি উইলসন্ এবং অন্যান্য আরো অনেকে।

এই সপ্তাহে ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হবে।

*

স্কিপার, বব, স্লাগার প্রভৃতি বন্ধুরা হলিউডে দুঃসাহসী ব্যোমযান চালকের কাজ করে। বিবাহ করা তাদের কাছে নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্বেও ফ্রান্ নামে একটি মেয়ে এবং স্কিপার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হ'ল। মেয়েটিকে বব্ ভালবাসতো। একদিন একটি আগুন লাগার দৃশ্যে অভিনয় করবার সময় ফ্রানের দোষে বব্ ও স্কিপার বিশেষ রকম আহত হ'ল। স্কিপারের ওপর দোষারোপ ক'রে ষ্টুডিওর কর্ত্তারা তাকে বরখাস্ত করলে।

*

স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। চাকরীর জন্যে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে শেষে স্কিপার এক অসমসাহসিক কাজ নিলে—নিশ্চিৎ মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে উড়োজাহাজের কারদানি দেখাতে হবে। ভাগ্য নিতান্ত প্রসন্ন ছিল বলেই স্কিপার সে-যাত্রা প্রাণে বাঁচল এবং যথাসময়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হল। Lucky Devil-এ অনেকগুলি চমকপ্রদ উড়োজাহাজের দৃশ্য আছে।

(২) **College Humour** (প্যারামাউন্ট্)

অভিনয় করেছেন—সুগায়ক বিং ক্রস্‌বি; জর্জ্জ বার্ন্‌স্ ও গ্রেসী য়্যালেন্; রিচার্ড আরলেন্; মেরি কারলাইল্; জ্যাক ওকি; লোনা আনড্রে; এবং বত্রিশজন তরুণী অভিনেত্রী (Ox Road Co-eds)

•

ছবিখানিতে আমেরিকার সহ-পাঠ (co-education) ও ছাত্র-জীবনের একটি সুন্দর আলেখ্য দেখানো হয়েছে। বার্ণে শিরেল্ নতুন কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে কিরূপ বিপদগ্রস্থ হ'ল; সঙ্গীত-শিক্ষক ডাভার্স শেষ পর্য্যন্ত কেমন ক'রে তার শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে বার্ণের ভগ্নী বারবারাকে বিবাহ করল; অপটু ভীরু প্রকৃতির বার্ণে শেষ পর্য্যন্ত কেমন করে খেলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করল—তারই কৌতুক-প্রদ কাহিনী এই হাস্য গীত-নৃত্য সমুজ্জ্বল ছবিখানিতে দেখানো হয়েছে।

০

বার্ণে শিরেল্-এর ভূমিকায় জ্যাক ওকি সুখপ্রদ অভিনয় করেছেন। বিং ক্রস্‌বি কয়েকখানি গান গেয়েছেন। ছবিখানির ভিতর হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে জীবনের একটি গভীর অনুভূতির ছাপ শেষের দিকে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এবং সেই কারণেই ছবির বিশেষত্ব দর্শকদের আকৃষ্ট করবে বলেই বিশ্বাস।

এই সপ্তাহে স্থানীয় এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেসে সুরু হবে।

ছায়াছবির মর্ম্মকথা—এবার চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ বিভাগ—সিনেরিও অর্থাৎ চিত্রনাট্য সম্বন্ধে দুচার কথা বলব।

চিত্রনাট্য কেমন ক'রে প্রস্তুত করা হয় সেই কথাটাই আগে জানা দরকার।—হয়ত চলচ্চিত্রের জন্যে বিশেষভাবে লেখা কোন গল্প, কিম্বা কোন রঙ্গমঞ্চের নাটক, অথবা কোন উপন্যাস বা সাধারণ গল্পকে অবলম্বন ক'রে ছবি নির্ম্মাণ করা হবে। চিত্রনাট্যকারের প্রথম কাজ হ'চ্ছে সেই রচনাটির একটি সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করা। আখ্যায়িকার সকল কারুকার্য্য বাদ দিয়ে শুদ্ধমাত্র কাঠামোটীকে বার ক'রে নেবার পর সেটিকে চলচ্চিত্রের উপযোগী ক'রে তোলবার কাজ আরম্ভ হয়। যতক্ষণ না রচনাটি পরদার উপযোগী আকার ধারণ করে ততক্ষণ তাকে নিয়ে পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্ত্তন চলে। অনেকে একটি নাটক বা উপন্যাসের চলচ্চিত্র-সংস্করণের মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য্য হ'য়ে যান। কিন্তু সে-সব পরিবর্ত্তন অকারণ নয়—

অনেক সময় দেখা যায় একটি আখ্যায়িকার মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যে-গুলিকে পরদায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।—এমন কতকগুলি দৃশ্য হয়ত তার মধ্যে আছে যেগুলি ছবির পরদায় কৌতূহলের সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না, উপরন্তু নিতান্ত নীরস প্রতীয়মান হবে। উপন্যাসের মধ্যে এমন পরিচ্ছেদ থাকা অসম্ভব নয় ছবির পরদায় যেগুলিকে হয়ত নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হবে। ছবিতে সেই সব পরিচ্ছেদগুলির সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে না, কারণ একখানি ছবির পরমায়ু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—সত্তর বা বড় জোর আশী মিনিটের মধ্যে সব কথা তাকে শেষ করতে হবে। তাছাড়া উপন্যাস বা নাটকের গতি এবং চলচ্চিত্রের গতি এক নয়।—

তারপর অনেক সময় হাস্যরসের অবতারণা, বা নতুন ঘটনা-বৈচিত্র্য সঞ্চার করবার জন্যে নতুন চরিত্রের সমাবেশ করতে হয়। অনেক সময় আবার এমনও হয় যে, নায়কের ভূমিকা কেটে ছোট ক'রে দিয়ে, নায়িকার ছোট্ট ভূমিকাকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে বাড়ানো হল—কারণ উক্ত নায়িকার অভিনেত্রীকে দিয়ে হয়ত প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হবে। তারপর, অনেক সময় খরচের জন্যেও মূল আখ্যায়িকার অনেক অংশ বর্জ্জন করতে হয়। একটি পরিচ্ছেদে হয়ত বিলাতের বিখ্যাত ঘোড়-দৌড় ডারবির বিশেষ এবং বিস্তৃত বিবরণ আছে। ছবির পরদায় সেই দৃশ্যটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা প্রচুর অর্থ সাপেক্ষ। অনেক সময় প্রযোজকগণ দৃশ্যটি না দেখিয়ে লাউড্-স্পীকারের সাহায্যে সে-কাজ সেরে নেন।

সময় সময় কেন যে মূল গল্প এবং চিত্র নাট্যসংস্করণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তার কারণ উপরের কথাগুলি থেকে পাঠকবর্গ কতকটা আন্দাজ করতে পারবেন।

•

চলচ্চিত্র-সংস্করণের কাটামো তৈরি হবার পর, সেটিকে এক বা একাধিক লেখকের কাছে অর্পণ করা হয়, তাঁরা তার মধ্যে ছবির উপযোগী বাক্য এবং ঘটনা সংযোজনা করেন—ঐ কাজকে বলা হয় Screen Treatment ! The treatment is a fuller adaptation written more in terms of the Screen ! কাঠামোটিকে চিত্রনাট্যে গঠন করার কাজে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তার একটি প্রমাণ নীচে দেওয়া হ'ল—

কাঠামোর মধ্যে এইভাবে একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—"একটি বাগানের মধ্যে প্রেম-দৃশ্য।" কাঠামোটিকে গঠন করবার সময় লেখক দৃশ্যটিকে বিস্তৃততর ভাবে বর্ণনা করবেন— "আধুনিক এবং সরস কথোপকথন সংযুক্ত একটি রোমান্টিক্ প্রেমদৃশ্য। সুন্দর সুসজ্জিত উদ্যান। পরদার অন্তরাল হইতে অর্কেষ্ট্রার সুর ভাসিয়া আসিতেছে এবং অন্যান্য প্রেমিক যুগল পিছন দিকে ঘোরা ফেরা করিতেছে।"—

ইত্যবসরে পরিচালক, আলোকচিত্র-শিল্পী এবং ব্যবস্থাপক লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করেন। গঠন-কার্য্য সম্পূর্ণ হবার পর, তাদের ভিতর থেকে এক-একটি দৃশ্যকে গ্রহণ ক'রে শেষবারের মতো তাদের ওপর কারুকার্য্য রচনার পর সেটিকে গঠিত চিত্রনাট্যের ভিতর অঙ্গীভূত ক'রে নেওয়া হয়। এই চূড়ান্ত গঠন কার্য্যের জন্যে সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক লেখককে নিযুক্ত করা হয়। প্যারামাউন্ট্ যখন মার্ক্সদের চার-ভায়ের জন্যে Horse Feathers নামক ছবিখানি তোলে তখন তারা উক্ত চিত্রনাট্য রচনার জন্যে চৌদ্দজন লেখক নিযুক্ত করেছিল—তাদের মধ্যে হলিউডের সব চেয়ে বিখ্যাত gag menগুলি ছিল। ছবির মধ্যে হাস্যরসপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার ভার যার 'পরে থাকে তাকে বলা হয় gag man !

•

গঠন-কার্য্য শেষ হবার পর Continuity অর্থাৎ ধারারক্ষার কাজ সুরু হয়। চূড়ান্ত গঠন-রূপটিকে ভেঙে বিভিন্ন shot-এ পর্য্যবসিত করার কাজকে বলা হয়—ধারারক্ষা ; শুধু তাই নয়, ধারারক্ষীকে ক্যামেরার কাজ সম্বন্ধেও যথাযথ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করতে হয় and describing the various devices to deliver the action before the Camera's eye ! উপরন্তু, গল্পটিকে আগাগোড়া ঠিক পথে চালনা করা, তার মধ্যে আগাগোড়া সমতা রক্ষা করা, তার আভ্যন্তরিক tempo যথাযথভাবে বজায় রাখা—এ সব কাজও ধারারক্ষীর ! ধারারক্ষার কাজ চিত্রনাট্যের মধ্যে একটি প্রধান উপাদান।

হলিউডে একমাত্র বিশেষজ্ঞদের হাতেই এ-কাজের ভার দেওয়া হয়। কাঠামো প্রস্তুত করা, কথোপকথন রচনা করা, চিত্রনাট্য লেখা প্রভৃতির কাজে যেমন বিশেষজ্ঞ আছেন তেমনি ধারারক্ষার কাজেও বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। Bess Meredyth জগতের মধ্যে সব-চেয়ে বিখ্যাত এবং সব-চেয়ে উপার্জ্জনক্ষম ধারারক্ষী।

Howard Eastabrook, Grover Jones, Ernest Vadja, Richard Schayer, Tim Whelan, George Marion, Frances Marion, Harry Hervery, Sam Mintz—এঁরা কয়েকজন হলিউডের বিখ্যাত চিত্রনাট্য-লেখক। Bess Meredyth-এর নাম ও চাহিদা এঁদের কারুর চেয়ে কম নয়।

ধারারক্ষীর কাজ শেষ হবার পর চূড়ান্তভাবে গঠিত Scriptগুলিকে বলা হয়—Scenario। সাধারণতঃ একটি সিনেরিওর মধ্যে পাঁচশো বিভিন্ন shot থাকে।—অর্থাৎ পাঁচশোটি বিভিন্ন দৃশ্য, যাদের বিভিন্ন angle থেকে ক্যামেরায় গ্রহণ করা হয়।

সিনেরিও কেমন ক'রে রচনা করা হয়, বিলাতী ছবি Lost Squadron-এর চিত্রনাট্য থেকে কয়েকটি দৃশ্য উদ্ধৃত ক'রে তার নমুনা দিলাম। ছবির গল্পের মর্ম্মকথা হ'চ্ছে এই—গিবসন নামে এক সুদক্ষ ব্যোমযান-চালক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হলিউডে যোগ দিলে—Stunt Flier, মানে কসরতি-ব্যোমযান-চালক রূপে। পরিচালক ভনফার্ষ্ট ছবির মধ্যে রোমাঞ্চ সঞ্চার করবার জন্যে পাগল। সে গিবসনকে নানা বিপদসঙ্কুল কসরৎ দেখাতে উত্তেজিত করতে লাগল—রোমাঞ্চকর কসরতের ছবি পেলেই হ'ল, গিবসন প্রাণে বাঁচুক আর বাঁচুক আর নাই বাঁচুক—তাতে ফার্ষ্টের কিছু যায় আসে না—হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ফার্ষ্ট! আখ্যায়িকার এক স্থানে আছে, গিবসনের জাহাজ চালকের শাসন মানছে না—বেসামাল হ'য়ে পড়েছে—পরিচালক গিবসনের বিপদ দেখে কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে ক্যামেরম্যানকে দৃশ্যটি গ্রহণ করতে আদেশ করছে। সেই স্থানের সিনেরিও কেমন ক'রে লেখা হয়েছে তার নমুনা—

দৃশ্য ৩৭; Sequence E; Long Shot; বহির্দৃশ্য; এরো-ড্রোম (স্থান) কাল—দিবস।

ব্যোমযানের উপর গিবসন। জাহাজখানি ঘুরতে ঘুরতে নীচে নামছে!!

দৃশ্য ৩৮; Medium Long shot: বহির্দৃশ্য; এরোড্রোম। দিবস

ক্যামেরার সন্নিকটে ভন ফার্ষ্ট! ক্যামেরাম্যান ভীতনেত্রে জাহাজখানিকে লক্ষ্য করছে এবং পরিচালকের দিকে চাইছে। ফার্ষ্ট গিবসনকে লক্ষ্য করতে করতে তার কোট খুলে ফেল্লে।

নেপথ্য থেকে গিবসনের জাহাজের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফার্ষ্ট বলছে: ছবি তোলার কাজ বন্ধ কোরো না।—উড়োজাহাজ যা করছে করুক—গিবসনকে ধ্বংস হ'তে দাও!! Let him crash!

সিনেরিওর এই স্থানে আমরা এরোপ্লেনের একটি দৃশ্য দেখছি; তারপর নীচে লোকেদের শঙ্কিত অভিব্যক্তি; এবং তারপর রোমাঞ্চ-প্রিয় পরিচালকের দৃশ্যটি না বন্ধ ক'রে ছবি তোলার কাজে ক্যামেরাম্যানকে কাজ চালাবার আদেশ! বহির্দৃশ্য কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, দৃশ্যটি ষ্টুডিওর মধ্যে না হ'য়ে ফাঁকায় তোলা হচ্ছে।

Lost Squadron থেকে আর কয়েকটা নমুনা দেওয়া গেল—

দৃশ্য ৪৬; বহির্দৃশ্য; সাণ্টা ও মনিকা (স্থানের নাম) দিবস।

Medium close shot।

উড়ো জাহাজের উপর গিবসন। জাহাজখানি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

দৃশ্য ৪৭; বহির্দৃশ্য; সাণ্টা মণিকা। দিবস

Medium Long Shot।

ব্যোমযান সমুদ্রগর্ভে পড়ল।

দৃশ্য ৪৮; বহির্দৃশ্য; সাণ্টা মনিকা দিবস। একখানি মোটরকার; M. L. Shot।

গাড়ীর উপর নায়িকা। সমুদ্রে জাহাজ পড়া দেখে তার ভয়ের অভিব্যক্তি।

দৃশ্য ৪৯; বহির্দৃশ্য: সান্টা মনিকা সমুদ্র; দিবস। M. Long Shot।

গিবসনকে উদ্ধার করতে একটি মোটর বোট ধাবমান। ক্যামেরা তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

শব্দ:

মোটর বোটের আওয়াজ।

দৃশ্য ৫০; বহির্দৃশ্য: একই সময়। Medium Shot।

ধ্বংস-প্রাপ্ত ব্যোমযান থেকে গিবসন গুঁড়ি মেরে বার হ'চ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, সিনেরিওর এই জায়গায় ঘটনার মধ্যে অতিশয় ক্ষিপ্রগতি আছে। কাজে-কাজেই দৃশ্যটিকে অতগুলি shotএ ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে। Medium বা Long shot নামে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের দ্বারা ক্যামেরার দূরত্ব বোঝানো হয়েছে।

*

দৃশ্য-শেষ বা Fade out কিরূপ হওয়া উচিৎ, Mata Hari থেকে তার একটি নমুনা দেওয়া গেল—

Shot ৪৪; Sequence 11;
বিচারালয় দিবস।
Medium close Shot।

মাতাহারি কয়েদির আসনে আসীনা। ক্যারণ (তার উকিল) তার পাশে। পরদার পাশ থেকে (মানে, নেপথ্য থেকে) সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

সরকারি উকিল:—

এবং নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে তুমি তাকে গুলি করেছো। কিন্তু তোমার সে কাজ তোমায় রক্ষা করতে পারলে না, মাতাহারি। তুমি যে ফ্রান্সের শত্রু, এ-কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

মাতাহারি অবিচলিতভাবে কথাগুলি শুন্‌লে। আমাদের মতো কথাগুলির অর্থ বুঝতে তারও দেরী হ'ল না।

Fade out।

Action এবং পরিচালনার নির্দ্দেশ বেশীর ভাগ সিনেরিওর বাঁ দিকে লেখা হয়; কথোপকথন এবং শব্দ—ডানদিকে। শব্দের কথা আজকাল বিশেষ লেখা হয় না—পরিচালনার সময় তাদের তৈরী ক'রে নেওয়া হয়।

এখন ধরা যাক যে, আপনি একখানি চিত্রনাট্য লিখতে মনস্থ করেছেন। কেমন করে সুরু করবেন? প্রথমে ছবিঘরে যে ছবিগুলি দেখেন, মনোযোগ দিয়ে তাদের পর্য্যবেক্ষণ করুণ এবং তারই সঙ্গে মনে মনে নিজের সিনেরিও গঠন করুন। যদি কোন মৌলিক গল্পের আখ্যানভাগ মাথার মধ্যে থাকে, তাহ'লে ছোটগল্পের মতো সেটিকে লিখে ফেলুন। তারপর সেটির কাঠামো তৈরী ক'রে তার মধ্যে, যদি সম্ভব হয়, Screen Treatment সঞ্চারিত করুন। Shot, sequence প্রভৃতি সংযোগ করা বিশেষজ্ঞের কাজ, নতুন ব্রতীর নয়। গঠন করবার সময় এই কথাটি সব সময় মনে রাখবেন যে, আপনার সিনেরিওর প্রত্যেকটি shot-এর অর্থ থাকা চাই—অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু যেন তার মধ্যে না থাকে। সিনেরিওর মধ্যে বাজে আড়ম্বর একেবারে চলবে না।

*

ভাল ছবিগুলো মনের গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করুন—লক্ষ্য করুন, কখন তারা Close-up-এর ব্যবহার করে—কখন medium, কখন করে Long Shot! Try to think in terms of pictures, and who knows?—to morrow you may be writing Screen stories like the Champ or adaptations like The Calendar or Grand Hotel!

*

নিউ সিনেমার চুটকি ছবি Excuse Me Sir-এর মহলা শেষ হয়েছে; আজকালের মধ্যেই ছবি তোলা সুরু হবে। আশা করা যায়, মাস্তুত ভাই-এর চেয়ে "মাপ করবেন মশাই" অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করবে।

*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের 'সাবিত্রী" ছবিখানির এতদিনে মুক্তিলাভ ঘটেছে। বারান্তরে ছবিখানির পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা; শ্রীমতী তারাসুন্দরী; জীবন গঙ্গো; কৃষ্ণচন্দ্র দে; (অন্ধগায়ক) প্রভৃতি। পরিচালনা করেছেন—নরেশচন্দ্র মিত্র। গল্প-লেখক - সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। আলোক-শিল্পী—যতীন দাশ।

চিত্রায় "সীতা"র অবসান ঘট্‌ল। এ-সপ্তাহে উক্ত চিত্রভবনে একখানি উঁচু শ্রেণীর বিলাতী ছবি দেখানো হবে। ছবিখানি নিউ এম্পায়ারে আমরা দেখে এসেছি এবং দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। F. P. 1. অতলান্তিক সমুদ্র বক্ষে রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে তৈরী হয়েছে। ছবিখানিতে কনরেড ভেড ও জিল্ এসমণ্ড্ সু-অভিনয় করেছেন।

আগামী সপ্তাহে চিত্রার পরদায় বহু-আলোচিত ও বহু অপেক্ষিত **মীরাবাই**-এর মুক্তিলাভ ঘটবে।

*

রূপবাণীতে Bring Them Back Alive-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ চল্ল। Bring Them-এর সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ছিল না। ছবিখানি বাঙালী দর্শকেরা সাদরে গ্রহণ করেছে দেখে—আনন্দিত হওয়া গেল।

গান

(শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত)

মজনু, তোমার জল ভরেচে চোখের কোণে কোণে,
দিন-রজনী মেহর আঁখি স্বপন কাহার বোনে?
বিদায় নিতে যাই যে ভুলে
পর্‌লে মালা গলায় তুলে,
ভ্রমর-কালো নয়ন-বাঁশি বাজ্‌চে বিভোর মনে।
কোন্ সরাবে লাল করেচ তোমার অধরখানি?
সাম্‌নে আমার হাস্‌চে যেন গোলাপী ফুলদানী!
ছুটি তোমার বহুলতায়
পাই যে খুঁজে মনের-কথায়,
লয়লা যে তার কাজ্‌লা প্রাণে আলোর বাণী শোনে।

প্রয়োগ-কৌশল

তিন

প্রযোজকের কার্য্যসূচী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(মণিকা ইউয়ার)

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

এই রকমে সম্প্রদায়ের সমস্ত কর্ম্মী ও শিল্পীকে একত্রিত ক'রে প্রযোজকের প্রথম কাজ হ'চ্ছে তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে নাটকখানি পড়ান, সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া এবং নাটকখানির মূল্য কতখানি তা' বুঝিয়ে দেওয়া।

এর পরে প্রকৃত মহলা আরম্ভ করা যেতে পারে। ঠিক সময়ে যাতে মহলা সুরু হয় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি আটটায় মহলা দেবার কথা থাকে তা'হ'লে ঠিক আটটাতেই সুরু ক'রতে হবে এবং যদি দরকার পড়ে তবে 'understudy'দের কাজে লাগাতে হবে। এতে ক'রে এই হবে, দেরীতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা দেখবেন যে ঠিক সময়ে মহলার আসর ব'সেছে, সুতরাং তাঁরা পরের মহলা থেকে সময়মত যোগদান ক'রতে চেষ্টা ক'রবেন। আসরকে ঠিক সময়ে ভাঙ্তেও হবে।

গোড়া থেকেই ঠিক ক'রে রাখতে হবে কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ সময়ে মহলার আসর ব'সবে। কোন-কোন কোম্পানী এক মাসের মহলার ছক্ কেটে রাখেন। অত্যন্ত দরকারী ব্যাপার না ঘটলে এর কোন পরিবর্ত্তন চলে না। আর শিল্পীদের পক্ষেও এই সুবিধে হয় যে, তাঁরা মহলার সময়ের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে অন্য জায়গার নিমন্ত্রণে প্রতিশ্রুতি দান ক'রতে পারেন। শিল্পীদের এই রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখা প্রযোজকের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। শিল্পীরা জানবেন যে কোন্ সময় গিয়ে ক'ঘণ্টা মহলা দিতে হবে, এবং প্রযোজকের অনুরোধে তাঁদের কোনদিন বে-যারে এসে মুস্কিলে প'ড়তে হবে না।

মহলার সময় যদি কোন শিল্পীর অভিনেয় ভূমিকা কিছু থাকে তবে তাঁকে আসতে হবে, নচেৎ না। যদি নাটকের কোন অঙ্কের প্রত্যেক নট-নটীই উপস্থিত থাকেন তবে সেই অঙ্কের পুরো মহলা দেওয়ান ভাল হবে। অঙ্কের পুরো মহলা যদি না-ই চলে, অঙ্কের কোন দৃশ্য নিয়ে যদি প্রযোজক মহলায় নিযুক্ত থাকতে চান্ ত' অ-দরকারী শিল্পীদের আসবার কোন প্রয়োজন নেই। অবৈতনিক সম্প্রদায়ের শিল্পীদের সন্তুষ্ট রাখা প্রযোজকের খুব উচিত, তাঁরা মহলায় এসে যেন না মনে করেন, মিছিমিছি একটা সন্ধ্যে নষ্ট হ'লো।

শিল্পীরা যেন তাঁদের আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে মহলায় না আনেন। প্রযোজকের কাজে এতে বাধা প'ড়বে, এবং সম্প্রদায়ের অপরাপর শিল্পীরাও অস্বস্তি বোধ ক'রবেন। তবে এমন লোক মহলায় যোগদান ক'রলে ক্ষতি ছাড়া লাভের আশাই বেশী, যাঁর বিচারশক্তির উপর শিল্পীদের আস্থা আছে।

নাটকের অভিনয়ে কত সময় নেবে তা' নির্ভর করে প্রযোজকের প্রয়োজনার উপর। তিন-অঙ্কের নাটকের জন্যে, হপ্তায় চার রাত ক'রে, চার হপ্তা মহলা দিলেই চ'লবে।

নাটকখানি প'ড়তে মাত্র একরাত্ত কাটাবার পর, পরের রাতে প্রযোজক মশাইকে শিল্পীদের ভূমিকাগুলির অভিনয়ের মধ্যে কোন্ স্থানে কি-রকমে দাঁড়াতে হবে, কি-রকমে নড়া-চড়া ক'রতে হবে তা' দেখিয়ে দিতে হবে, এবং শিল্পীরা যে তাঁর ইঙ্গিত তাঁদের ভূমিকা লেখার খাতায় ঠুকে নিলে তা'ও দেখতে হবে। দ্বিতীয় রাতে এইভাবে দু'বার কোন অঙ্কের অভিনয় চ'লবে, তারপর পরের প্রত্যেক রাতের মহলাতেই নতুন অঙ্ক আরম্ভ ক'রে আসর ভাঙ্তে হবে প্রথম অঙ্কের পুনরভিনয় ক'রে। এক-একটা অঙ্কের দরুণ দু'রাত ক'রে মহলা দিলে চ'লবে এবং পুরো নাটকখানির একবার সম্পূর্ণ মহলা হবার পর প্রত্যেক রাতে দু'অঙ্ক ক'রে মহলা যাতে চলে তাই প্রযোজকের চেষ্টা ক'রতে হবে। এই রকম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মহলা হ'লে পরে সমস্ত নাটকখানিই নিখুঁত ভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে।

প্রযোজকের কাজে চাই কলাশিল্পের প্রতি নিখুঁত দৃষ্টি এবং উৎপাদনক্ষম শক্তি। কোন বাঁধাধরা নিয়মে চলা তাঁর চ'লবে না, উচিতও নয়। ভালর চেয়েও আরো ভাল ভাব তাঁর মনের মধ্যে যদি উদয় হয় তবে তাকেই তাঁকে গ্রহণ ক'রতে হবে।

মহলার সময় শিল্পীদের কোন কিছু বোঝাতে গেলে প্রযোজকের উচিত সেটাকে 'suggestion' হিসেবেই ব্যবহার করা, আদেশ হিসেবে নয়। "আমি যে-রকম ব'লছি সেই রকম করুন" ব'লে নট বা নটীর স্বতঃপ্রবৃত্তিকে ও ব্যক্তিত্বকে আঘাত দেওয়া প্রযোজকের উচিত নয়। "আচ্ছা, এই রকমে অভিনয় ক'রলে কি-রকম হবে আপনার মনে হয়"—ইত্যাদি তাঁকে নট বা নটীকে ব'লতে হবে। তবে তাঁর উদ্ভাবিত প্রথায় যদি নট বা নটী না চলেন তবে পূর্ব্বোক্ত ভাবে ব'লতে প্রযোজককে বাধ্য হ'তে হবে।

শিল্পীদের অভিনয়ের ধারা কোনদিকে প্রবাহিত হ'চ্ছে তা' দেখবার জন্যে প্রযোজক মশাই গোড়ার দিকের কতক মহলায় নিজের ভাব প্রকাশ না-ও ক'রতে পারেন। এতে দু'রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ শিল্পীদের একসঙ্গে কতকগুলো ইঙ্গিত গিলিয়ে দিয়ে তাঁদের 'হ্যাবাচাকা' ক'রে তুলতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ তাঁরা নিজেরাই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে চরিত্র-চিত্রণ ও অবস্থা উপলব্ধি ক'রতে কি-রকম সক্ষম হ'চ্ছেন তা' প্রযোজক বুঝতে পারবেন। প্রযোজকের চেয়ে তাঁদের ভাবধারা আরও উন্নত হ'তে পারে। এতে থেকে শিল্পীরা যে কোন শ্রেণীর তা' প্রযোজক ধারণা ক'রে নেবেন।

তবে এই ব্যাপারটা বেশী কাল ঘটতে দেওয়া প্রযোজকের উচিত নয় কারণ, তাঁদের নিজের ধরণের অভিনয়েই তাঁরা অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়বেন। তা'হ'লে ভুল সংশোধন করা মহা মুস্কিলের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। ভাবের কোন আরোপিত অর্থ বদলাতে গেলে নট বা নটীর ব্যক্তিত্ব ও দৈহিক গঠনের দিকে প্রযোজকের দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে নট বা নটীকে তাঁর দৈনিক আত্ম-স্বত্বাকে ত্যাগ ক'রতে ব'লে চরিত্রের রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জোর করা প্রযোজকের উচিত নয়। নতুন বিকৃত কিছু ফুটিয়ে তোলার চেয়ে নিজের স্বত্বার রূপের অনুরূপ ভাবকে রূপান্বিত ক'রলে লাভজনক হ'তে পারে। ধরুণ, নির্ব্বাচিত নাটকের নায়কের দেহ হ'চ্ছে পাতলা ছিপ্‌ছিপে, 'this glass-of-milk-and-a-bath-bun' ধরণের লোক। পাতলা লোকের স্বভাবানুযায়ী রসেরও আধার তিনি। কিন্তু ঐ ভূমিকার জন্যে নির্ব্বাচিত নটটি হ'চ্ছেন মোটা। সুতরাং এখানে প্রযোজক মশাইকে চির-প্রথার বিরুদ্ধে যেতে হবে; নটটিকে বলবার দরকার নেই যে রোগা লোকের হাব-ভাবের অনুকরণ তিনি করুন। বরঞ্চ মোটা লোকদের চরিত্রের সঙ্গে খাপ্

খাইয়ে সে-চরিত্রের রূপ দিন। আসল জিনিষকে বিকৃতভাবে নটটি ফুটিয়ে না তোলেন সেইটে দেখাই প্রযোজকের উদ্দেশ্য। দর্শকরা যাতে একেবারে মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না এমন কিছু 'illusion' সৃষ্টি ক'রলে তাঁর পক্ষে মন্দ হয় না। 'If your ingenue is a hobbledehoy, do not try to make of her a simpering miss, but develop her along her own lines.' সুতরাং শিল্পীদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে তাঁদের-নিরূপিত সহজ পথে চলবার শিক্ষা দিন এবং শিল্পীরাও এতে সহজে এগুতে পারবেন, প্রযোজকের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ ও সম্প্রদায়

(শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র)

বিজ্ঞ-লোকেরা ঘাড় নেড়ে বলছেন থিয়েটার-বাড়ীগুলির ভাড়া যতদিন না কমছে ততদিন বাংলার থিয়েটার ওয়ালাদের কিছুতেই কল্যাণ নেই। যতটা বিক্রী এখনকার দিনে হওয়া সম্ভব তাতে অতটা খরচ করা যায় না।

একটা সম্প্রদায় একটা বাড়ী চিরকাল ধ'রে আটকে রাখতে চাইলে তাই হবে। সব বই 'গৈরিক-পতাকা' কিম্বা 'মহানিশা'র মত পয়সা দিতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। দশ-বারখানা নাটক খুলতে খুলতে একখানা ঐ রকম বই খুলতে পারা যায়। কিন্তু দশ-বারখানা নাটক খুলে যে টাকা অপচয় হয় তা ঐ একখানা নাটকে ঠিক পূরণ হয় না। অথচ একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে বসলে হাতের কাছে ভাল নাটক না থাকলেও যা হোক একখানা বই খুলতেই হয়।

কিন্তু বিলাতে অধিকাংশ সম্প্রদায়েরই নিয়ম আছে যে তারা বাঁধা প্রেক্ষাগৃহ রাখে না। ভাল বই বেছে, ভাল ক'রে রিহার্স্যাল দিয়ে যখন দেখে যে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েছে তখন একটা প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া ক'রে অভিনয় দেখাতে সুরু করে। সহরের এক অঞ্চলে দেখিয়ে যখন সেখানে ভীড় ক'মে আসে তখন অন্যদিকে গিয়ে আর একটা বাড়ী ভাড়া নেয়, তারপর বিদেশে বেরিয়ে পড়ে। ফলে একখানা বই হয়ত উপর্যুপরি দেড় বৎসর কি দু'বৎসর ধ'রে প্রত্যহ অজস্র পয়সা দেয়। তা'তে ক'রে আবার বৎসর-খানেক এক জায়গায় স্থির হয়ে ব'সে আর একখানা বই প্রস্তুত করার সুযোগ ঘটে।

এতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়া পান নিয়মিত, কারণ একটা দল চ'লে গেলেই আর একটা দল আসে এবং সম্প্রদায়গুলিরও ভাড়া দেবার মত অবস্থা থাকে। দুখানা বই একরাত্রি জুড়ে সাতাশ টাকা বিক্রী হয় না!

এদেশে দু'-একটী চলন্ত দল হয়েছে সম্প্রতি, কিন্তু সে নাচারে। যেমন শিশির সম্প্রদায়। তাঁদের লক্ষ্য যে সুবিধা মত বাড়ী ও ভাড়া দেওয়ার মত টাকা যোগাড় হ'লেই রঙ্গগৃহে জেঁকে বসবেন, যতদিন তা না হয় অগত্যা ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সেই পুরোণো 'সীতা', 'আলমগীর', 'ষোড়শী', দেখে দেখে যে চোখ প'চে গেছে সকলের, তাতে কত বিক্রী তিনি আশা করেন? তার চেয়ে একখানা নতুন বই ভাল ক'রে তৈরী ক'রে কেন একখানা বাড়ী কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে সেই বই-এর অভিনয় করুন না? শিশিরবাবুর এখনও যে জনপ্রিয়তা আছে তাতে নতুন বই খুললে কিছুদিন যথেষ্ট লোক হবেই—বই ভালই হোক আর মন্দই হোক। এখানের বিক্রী কিছু ক'মে এলেই মফস্বলে বেরিয়ে পড়তে পারেন; সেখানেও নতুন বই দু-একরাত্রি যথেষ্ট টাকা দেবে। ..."নাট্যকুঞ্জ" নতুন বই করবেন বলে অনেকদিন ধরে শাসাচ্ছেন বটে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন পাত্তা নেই।

একটা প্রেক্ষাগৃহ পুষে রাখার সব-চেয়ে বড় অসুবিধা হ'চ্ছে যে বই ভাল ক'রে তৈরী করা যায় না। সপ্তাহে তিন রাত্রি নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে এবং প্রায়ই আরও দু-চার বার বিশেষ অভিনয় রাত্রির ব্যবস্থা ক'রে নিজেদের ঘর-সংসার ও অন্যান্য দিক (অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য দিকও দেখতে হয় আমাদের দেশের নটনটীদের, কারণ থিয়েটারের মাইনে নিয়মিতও নয় অনেকস্থলে পর্য্যাপ্তও নয়) দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীর কতটুকু সময় ও শক্তি থাকে নতুন বই তৈরী করার? এবং কর্ত্তাদেরই বা অহোরাত্র পাওনাদারদের কথা চিন্তা ক'রে নতুন বই সম্বন্ধে ভাববার বা ব্যবস্থা করার সময় কৈ? কিন্তু রিহার্স্যাল জিনিষটা মোটেই খুব সহজ নয়—তাতে যথেষ্ট সময়, মনোযোগ ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়।

এবং বই নির্ব্বাচনেরও কত অসুবিধা। দু-বছর অন্তর যাদের নতুন বই লাগবে তারা স্বচ্ছন্দে ভাল বই বেছে নিতে পারে (অবশ্য যদি ভাল বই বাছবার মত মস্তিষ্ক থাকে) কিন্তু যাদের বছরে চারখানা বই চাই-ই তাদের উপায় কি? কতকগুলো বাজে বই খুলে লোকসান দিতেই হবে।

তাছাড়া নট নটী নির্ব্বাচনেরও সুবিধা হয়। যে বই-এ অহীন্দ্রবাবুর উপযুক্ত পার্ট আছে, সে বইতে অভিনয় করার জন্য অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট্ করা যায়—তারপর যে বই খোলার সময় ওঁকে হয়ত মোটেই প্রয়োজন নেই সে সময় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, তিনি তখন অপর একখানা বইয়ের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট্ করতে পারেন। সম্প্রদায়গুলির সাদাহাতী পুষতে অনর্থক প্রাণান্ত হবার প্রয়োজন থাকেনা এবং শিল্পীরাও নিয়মিত মাইনে পান।

কর্ত্তারা যদি একটু কলকাতার মায়া কাটাতে পারেন, মানে বারোমাস গদীয়ান হ'য়ে ব'সে থাকার ইচ্ছাটা, তা হলে বোধ হয় এ-ব্যাপারের মীমাংসা হয়। একখানা বায়স্কোপের ছবি যে-ভাবে কলকাতার নানা চিত্রগৃহে দেখানো হ'য়ে বাইরে যায় এবং নানা স্থানে দেখানো হ'তে থাকে, ঠিক সেই উপায়েই থিয়েটারে নাটক নিয়ে একটা সম্প্রদায় পয়সা করতে পারেন না কেন? প্রত্যহ দুবার বা তিনবার দেখিয়েও 'চণ্ডীদাস' ছবি বাহান্ন সপ্তাহ কলকাতাতেই চলল একখানা ভাল বই-ই বা চলবে না কেন?

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৭ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. . 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২৪শে কার্ত্তিক,
১৩৪০

Song of Songs চিত্রে
মার্লিন্ ডিয়েট্রিক্ ও ব্রায়ান্ আর্ণ্

নাট্যজগৎ

আর্টে নগ্নতার কথা নিয়ে "ভারতী" ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বারকয়েক আলোচনা করেছি। সংপ্রতি "Isadora Duncan's Russian Days" নামক পুস্তকে, নগ্নতা সম্বন্ধে অমর নর্ত্তকীর মতামত প'ড়ে আবার ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

•

নগ্নতার নাম শুনলেই আজকাল আমরাও শিউরে উঠতে শিখেছি। 'আমরা'—যাদের সভ্য দেহ কোনদিনই বস্ত্রবাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয় নি এবং যাদের ধর্ম্ম নগ্নতাকেই প্রশ্রয় দেয়। প্রতিদিনই এদেশের কুললক্ষ্মীদের যে-'পোষাকে' গঙ্গাস্নান করতে দেখি, আসলে তা নগ্নতারই ভিন্ন রূপ ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু তা দেখে আমাদের মন পঙ্কিল হয় না। কামাখ্যা-তীর্থে গিয়ে এবং শিবলিঙ্গের সামনে ব'সে আমরা যখন নগ্নতার প্রতীককে পূজা করি, তখনো মনে প্রাণে আমরা নির্ব্বিকার থাকি। পুরী, কণারক ও ভুবনেশ্বরের নানা মন্দিরের গায়ে যখন সত্যসত্যই কুৎসিত কামোদ্দীপক সব মূর্ত্তির ভিড় দেখি, তখনো আমাদের মনের ধর্ম্মভাব আহত হয় না।

এথেকে কি প্রমাণিত হয়? মানুষের মনের ভিতরে যখন বিশেষ একটি কুভাব সচেতন হয়ে থাকে, নগ্নতাকে কুৎসিত দেখে সে তখনই। শুকদেবের নগ্নতা বা শৈলেন পরেশনাথের উলঙ্গ মূর্ত্তি তাকে অভিভূত করে না, কারণ কোন কুভাব তখন তার মনকে আক্রমণ করবার সুযোগ পায় না। চিত্রের এই যে প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব, এই ভাবের আবেগেই পটুয়া আঁকে নগ্ন মূর্ত্তির ছবি, ভাস্কর গড়ে বিবস্ত্র নর-নারীর দেহ।

*

কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করের এই-সব ধ্যানের ছবি বা মূর্ত্তিকে সাধারণও যে শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারেন', তার পরিচয় পাওয়া যায় নিত্যই। আমার বাড়ীতে এই শ্রেণীর অনেকগুলি ছবি ও পাথরের মূর্ত্তি আছে। বন্ধু ও বান্ধবীরা যখন আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁদের অনেকেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন। অনেকে লজ্জার প্রথম ধাক্কা সামলে এমন সব ছবি ও মূর্ত্তি সাজিয়ে রাখবার হেতু জিজ্ঞাসা করেন। আগে আগে জবাব দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতুম, কিন্তু তাঁরা বুঝেও বুঝতে পারতেন ব'লে মনে হ'ত না। এখন মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। জবাব করলে চুপ ক'রে থাকি।

*

জনসাধারণকে শিল্পীর চক্ষু ও চিত্ত দান করা একরকম অসম্ভব বললেও হয়। আদিম কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত শিল্পীর পর শিল্পী এই চেষ্টাই ক'রে আসছেন, কিন্তু কোন দেশে কোন যুগেই তাঁদের চেষ্টা সমগ্র ভাবে সফল হয় নি—একমাত্র প্রাচীন গ্রীস ছাড়া।... ... ... এই যে এখানে ব'সে আমি লিখছি এবং দৃষ্টিকে ক্ষণিক বিশ্রাম দেবার জন্যে মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমার সামনের এই যে "ভেনাস ডি মেডিচি"র পুরাতন, বিবস্ত্র মর্ম্মর-মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে দেখছি, এর মধ্যে পঙ্কিলতা কোথায়? ভেনাস, ভেনাস! গ্রীক পুরাণের রূপলক্ষ্মী তিনি, হিন্দুর উর্ব্বশীর মত পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে তিনিও সাগরের অনন্ত গর্ভ থেকে সৃষ্টির কোন্ প্রভাতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই আজ তাঁকে পূজা করে না, কিন্তু শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় আর্টের জগতে আজও তাঁর মোহনীয় তনু পূজনীয় ও অমর হয়ে আছে। শিল্পীর সাধনার মহিমায় আজ পৃথিবীর সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁর দিব্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে। তাই এই বিদেশিনী সাগরবালয়া আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কলভাষিণী গঙ্গার ওপারে শ্যামলিত তীর দিকে নীরবে, নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন! বাংলার নীলাকাশের সোনার আলো তাঁর কবরীবদ্ধ কেশ, প্রশস্ত ললাট, চাপ-নাক-মুখ, কমনীয় মরাল গ্রীবা, পরিপূর্ণ স্কন্ধ, নধর বক্ষ, নিটোল সুগঠন শ্রোণী-তটের উপরে এসে পড়েছে এবং তারই পাশে পাশে স্বচ্ছ ছায়া তুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কবিতার মতন মধুর ছবির মালা! সমগ্র দেহটি যেন একটি লাবণ্যের মন্ত্র! সকাল ও দুপুরে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় পরিবর্ত্তনশীল আলোক-ছায়ার বিচিত্র ইন্দ্রজালে এই মৌন মূর্ত্তির দেহের উপর দিয়েও লীলায়িত হয়ে যায় বিভিন্ন ভাবের সুন্দর ছন্দ! এই অপূর্ব্ব দেহের উপরে যখন সাদরে সন্তর্পণে হাত রাখি, তখন শ্বেত পাষাণের ভিতর থেকেও জেগে ওঠে যেন পেলব জীবনের তপ্ত সাড়া! এর মধ্যে আমার দৃষ্টি দেখে যে স্বর্গীয় রূপ ও রেখা, অন্যের চোখ নগরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে তা দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

*

এই অপরূপ কত মূর্ত্তিই প্রাচীন শিল্পীরা ব'সে ব'সে একমনে গ'ড়েছেন! Venus de Medici, Petrograd Venus, Venus and Cupid, Aphrodite Capitoline Venus, Venus de Milo, Venus of Arles ও The crouching Venus প্রভৃতি। ভেনাসের মূর্ত্তি গড়বার সুযোগ পেলে নগ্নতার উপাসক গ্রীক শিল্পীরা কখনো সে সুযোগ ছেড়ে কথা কইতেন না। কিন্তু এই ভেনাস-পূজার প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন মহাশিল্পী প্রাক্সিতেলেস্ (Praxiteles)। অধিকাংশ বিখ্যাত ভেনাস মূর্ত্তির উপরেই তাঁর গড়া অমর Cnidian Venus-এর স্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। প্রাক্সিতেলেসের ভেনাস এখন ইতালীর Vatican চিত্রশালাকে আলো করে আছে। তাও নগ্ন মূর্ত্তি, কিন্তু য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার চোখে সে-নগ্নতা নাকি অসহনীয়। তাই একালের মূর্খরা সেকালের পবিত্র সৌন্দর্য্যের প্রতীক এই দেবী-মূর্ত্তির নিম্ন-অংশটা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিজেদের কুৎসিত ও বিকৃত 'সুরুচি' প্রকাশ করেছে! এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক Joseph Pijoan সাহেব তাঁর History of Art গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৩০২-৩ পৃষ্ঠায়) বলছেন, "শিল্পশালার কর্ত্তৃপক্ষ লজ্জান্বিত হয়ে মূর্ত্তির নিম্নাংশ কাপড়ে ঢেকে রেখেছেন; ফলে প্রাক্সিতেলেসের নগ্ন ভেনাস মূর্ত্তি যে কদাকার হয়ে গেছে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। ... ... দুই পদ ও দেহের সুষমা এবং স্কন্ধের সুগঠন দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়; মূর্ত্তির ব্যক্তিত্ব এমনি সুস্পষ্ট যে, সেকালের পৃথিবী কেন এই মূর্ত্তি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। পবিত্র মৌখিক ভাব, তার মধ্যে কোনরকম কামমোহ প্রকাশ পায় নি। তাঁর সুন্দর, তরুণ দেহ যে বিশ্বের হৃদয়কে আকর্ষণ করছে, শান্ত দৃষ্টির মধ্যে এমন কোন সচেতনতাই ফুটে ওঠে নি।"

*

এমন নগ্নতা দেখলেও বর্ত্তমান য়ুরোপ লজ্জা পায়। সুতরাং ইজাডোরা ডানকান সুদীর্ঘকাল য়ুরোপে থেকে গ্রীক নৃত্যের সাধনা ক'রে যখন তাঁর স্বদেশ আমেরিকায় ফিরে গেলেন, তখন উচ্চতর আর্টের সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ ইয়াঙ্কিরা যে তাঁকে দেখে খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে, তাতে আর অবাক হবার কিছুই নেই। কিন্তু তেজস্বিনী ইজাডোরা স্বজাতির এই শোচনীয় অজ্ঞতা নীরবে সহ্য করতে পারেন নি। যা বলা সব দিক দিয়েই তাঁকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, ইয়াঙ্কিদের মুখের মুখের উপরে স্পষ্ট ভাষায় সেই কথাগুলিই তিনি জানিয়ে দিলেন:

*

"আমার আর্ট যদি কোন-কিছুর প্রতীক হয়, তবে তা হচ্ছে ইয়াঙ্কি রুচিবাগীশদের কবল থেকে নারীত্বকে মুক্তিদান করবার প্রতীক।

*

"দেহকে অনাবৃত করার মধ্যে আছে আর্ট; গোপনতা হচ্ছে কুৎসিত। যখন আমি নাচি, তখন সকলকার শ্রদ্ধা জাগাবার জন্যেই নাচি; কুৎসিত কোন-কিছুর সঙ্কেত দেবার জন্যে নাচি না। তোমাদের অ্যাংলো-স্যাক্সন 'ব্যালেট'-বালিকাদের মত নাচবার সময়ে আমি মানুষের পশুত্বকে উৎসাহিত করি না। বরং আমি পূর্ণ-নগ্ন হয়েও নাচতে রাজি, তবু আমেরিকার পথে পথে যে-সব রঙ্গিনী দেহকে আধ-ঢাকা দিয়ে লোকের মনে কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে বিচরণ করে, তাদের দলে গিয়ে ঢুকতে পারব না।

*

"নগ্নতা হচ্ছে সত্য, সুন্দর, আর্ট। সুতরাং তা কুৎসিত হওয়া অসম্ভব। তা কখনোই অশ্লীল হ'তে পারে না। আমি কাপড় পরতুম না, কিন্তু

পরতে বাধ্য হই উত্তাপলাভের জন্যে। আমার দেহ হচ্ছে আমার আর্টের মন্দির। আমি তাকে প্রতিমার মত প্রকাশ করি সৌন্দর্য্যের উপাসনার জন্যে।

*

"ওরা বলে, সবাই যে-ভাবে কাপড় পরে আমি কাপড় পরি না সে-ভাবে। একটু উল্টোপাল্টে কাপড় পরায় কিছুই আসে-যায় না। আমার দেহের কোন্ অঙ্গকে প্রকাশ করেছি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? দেহের এক অংশ অন্য অংশের চেয়ে কু-ভাব জাহির করবে কেন? সমস্ত দেহ আর আত্মা কি এমন এক সাধন-যন্ত্র নয়, যার সাহায্যে শিল্পী তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির রূপবাণীকে প্রকাশ করেন? দেহ হচ্ছে শ্রীমন্ত; দেহ হচ্ছে বাস্তব, সত্য, বন্ধনমুক্ত। সে বিভীষিকা জাগায় না, জাগায় শ্রদ্ধা। অশ্লীলতা ও আর্টের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। কারণ আর্টের সিংহাসনের উপরে শিল্পী তাঁর সমস্তকেই—দেহ, আত্মা ও মনকে একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন।

*

"যখন আমি নাচি তখন আমার দেহকে সেই ভাবেই ব্যবহার করি, যে-ভাবে সঙ্গীতবিদ তাঁর বাজনার যন্ত্রকে, চিত্রকর তাঁর তুলি ও বর্ণাধারকে এবং কবি তাঁর মানসিক কল্পনাকে ব্যবহার ক'রে থাকেন।

*

"বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের অনেক নর্ত্তকই হচ্ছে অশ্লীল, কারণ তারা গোপন করে, প্রকাশ করে না। তারা যথেষ্ট কম অশ্লীল হ'তে পারত, যদি তারা নগ্ন হ'তে পারত। তবু তাদের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে না, যে-হেতু তারা রুচিবাগীশদের গোপন লালসাকে পরিতৃপ্ত করছে। এইটেই হচ্ছে এদের মহাব্যাধি। এরা মুখে স্বীকার না ক'রে নিজেদের পশুত্বকে লুকিয়ে খুসি করতে চায়। এরা সত্যকে ভয় করে। এরা নগ্ন দেহ দেখলে পালায়। কিন্তু কুভাবোদ্দীপক পোষাক-পরা দেহ দেখলে আনন্দ এদের ধরে না। এরা নিজেদের নৈতিক দৌর্ব্বল্যকে আসল নামে ডাকতে ভয়ে শিউরে ওঠে।"

*

কিন্তু মিছে! এতদিন যা হয় নি, এর পরেও তা হবে না। ইজাডোরা শিল্পীর স্বপ্ন দেখেছেন, প্রাকৃতজন এ স্বপ্নের কোনই হদিস্ খুঁজে পাবে না। মানুষ নগ্নতার সৌন্দর্য্য ভোলবার আগে কাপড় পরতে শেখেনি। এবং কাপড় পরতে শিখে সে যখন নিজের সরলতাকে ঢাকা দিয়েছে, তখন জামা-কাপড়ের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিয়েই আজ নগ্নতার সৌন্দর্য্যকে কলঙ্কিত করা ছাড়া সভ্য মানুষের আর উপায়ান্তর নেই। মানুষের মন এখন এতটা বিকৃত হয়েছে যে, আধুনিক আর্টের পূর্ণ-নগ্নতা পর্য্যন্ত কুৎসিত উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখনকার অনেক শিল্পীর মূর্ত্তিই দেহের মধ্যে দেহাতীত সৌন্দর্য্যের দিকে নয়,—দেহের কুশ্রী নগ্নতার দিকেই সকলের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। গ্রীক শিল্পের অধঃপতনের পরেও ভাস্করের বাটালি পাথর থেকে অসংখ্য ভেনাসের মূর্ত্তি কুঁদে বার করেছিল। কিন্তু তাদের ভিতরে আর প্রাক্সিতেলেসের ভেনাসের পবিত্র দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয়তা এবং নির্ব্বিকার নগ্নতার উদ্দেশ্যহীন ভাব খুঁজে পাওয়া যায় নি। নিজেদের নগ্নতা সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা দর্শকদের কুপ্রবৃত্তিকেও সচেতন ক'রে তোলে। নিছক নগ্নতা সম্বন্ধে যে সজাগ, নগ্নরূপ সে দেখতেও জানে না, সৃষ্টি করতেও পারে না।

আর একটি দুঃসংবাদ। পুরাণো-দলের আর-একজন বড় অভিনেতা, চুনীলাল দেব মহাশয় গেল বারোই কার্ত্তিক, রবিবার, পুরুষোত্তম-ধামে যাবার পথে বালেশ্বরে সাতষট্টি বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কয়েক বৎসর আগে থেকেই বাংলার রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোন-রকম সম্বন্ধ ছিল না বললেই চলে, কিন্তু এক সময়ে তিনি বাংলার একজন প্রধান অভিনেতা ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং কোন কোন ভূমিকায় তাঁর নাম ভবিষ্যতেও বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তাঁর অধ্যক্ষতায় বাংলার একাধিক রঙ্গালয় যার-পর-নাই উন্নতিলাভ করেছিল। অভিনয়-শিক্ষাদানেও তাঁর শক্তি বড় অল্প ছিল না এবং তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতির সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলুম। স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি নটজীবন গ্রহণ ক'রে প্রথম প্রথম চুনীবাবুর কাছে নানা বিষয়ে মূল্যবান সাহায্য লাভ করেছিলেন। চুনীবাবু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের শ্যালকের পুত্র।

*

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চুনীবাবু প্রথম খেলাঘরের অভিনয় সুরু ক'রে, তারপর প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এসে অবতীর্ণ হন—সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অনেক প্রসিদ্ধ অভিনেতার মত চুনীবাবুরও অভিনয়ের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রাণের টান ছিল। তারপর তিনি গিরিশচন্দ্রের গঠিত তখনকার তরুণ অভিনেতাদের দলে ভর্ত্তি হয়ে, আটাশে জানুয়ারি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাকবেথ' নাটকে তিনটি ছোট ভূমিকা নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেন। এবং প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে তাঁর নিয়মিত অভিনয় শেষ হয় মনোমোহন থিয়েটারে। তিনি যে-যে নাটকে অভিনয় করেছিলেন তার অসম্পূর্ণ তালিকা এই:—ম্যাকবেথ (কেথ্‌নেস, ২য় হত্যাকারী ও রক্তাক্ত সৈনিক), মুকুল-মুঞ্জরা (চন্দ্রধ্বজ), আবুহোসেন (বিচারপ্রার্থী পুরুষ), জনা (অর্জ্জুন), জীবন্ত-প্রতিমা (ফটিকচাঁদ), সংসার (বড় সাহেব), ঐন্দ্রিলা (বৃত্র), পৃথ্বীরাজ (দুর্গামল), কল্যাণী (সাঁওতাল সর্দ্দার), রাজলক্ষ্মী (ম্যাজিষ্ট্রেট), জয়দেব (জয়দেব), বঙ্গ-বিক্রম (কেদার রায়), কপাল-কুণ্ডলা (কাপালিক), ব্রহ্মতেজ (পরশুরাম), ভীষ্ম (পরশুরাম), নবাবী আমল (ভৈরব?) অযোধ্যার বেগম (মীর-কাশিম), মোগল-পাঠান (হুমায়ুন), পাণিপথ (সংগ্রাম সিংহ), দেবলা-দেবী (আলাউদ্দীন), বলিদান (করুণাময়) ও প্রফুল্ল (যোগেশ) প্রভৃতি। ...... চুনীবাবু কেবল রঙ্গালয়ের একজন প্রসিদ্ধ নট, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকই ছিলেন না, থিয়েটারি নাট্যসাহিত্যেও তিনি কিছু-কিছু হাতের ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর 'রাজলক্ষ্মী', 'গুলক-জোরিনা,' 'আলুথালু' ও 'দুধে দরজা' প্রভৃতি নামের কয়েকটি পালা বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীতও হয়েছে। শেষোক্ত কৌতুক-নাট্যখানি এই সেদিনও "নাট্যমন্দির" নতুন ক'রে খুলেছিলেন এবং বহুবৎসর আগেও তার ভাগ্যে জনপ্রিয়তার অভাব হয় নি—আমরা যখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছি।

*

"বাংলার নট-নটী" নামে একখানি বই সমালোচনার জন্যে পেয়েছি, লেখক হচ্ছেন শ্রীসুধীর বসু। বইখানি প'ড়ে বুঝলুম, নবীন লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তবে আর-একটু বেশী চেষ্টা ক'রে তিনি বিলাতী "Who's Who in the Theatre"-এর মতন অত-বড় না হোক্, একখানি নাতিবৃহৎ পুস্তক ও রচনা করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁকে আমরা অধিকতর প্রশংসা করবার সুযোগ পেতুম। তবে এ-কথাও বলা বাহুল্য যে, বাংলায় এ-রকম কেতাবও একখানিও নেই। এ-হিসাবে আমরা তাঁর বইখানিকে আদর না করলে অন্যায় করা হবে। বইখানির ভিতরে জনকয়েক বাজে

লোকের নাম ও পরিচয় ঠাঁই পেয়েছে, পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলিকে বাদ দেওয়া দরকার।

•

বিভিন্ন রঙ্গালয়ে শীঘ্রই তিনখানি নূতন নাটকের অভিনয় সুরু হবে—'নিকেতনে' "মা", 'রঙমহলে' "অশোক" ও 'মিনার্ভা'য় "বামনাবতার"। কার রূপ যে কেমন হবে, এখনো তার কোন হদিসই মিলচে না—প্রাচীর-পত্রের চকমকানি ছাড়া। তিন থিয়েটারে প্রায় একই সময়ে তিন তিনখানা নাটকের অভিনয় হওয়া তো নয়,—নাট্যসমালোচকদের প্রাণ বাঁচির হওয়া! কারণ সে-অভাগাদের সকলের মন রেখে, সকল দিক বাঁচিয়ে, পানি না ছুঁয়েই মাছ ধ'রে—লাঠি না ভেঙেই সাপ মেরে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখতে হবে! থিয়েটারওয়ালারা আবার এদের উপরে রাগ করেন! এদের জন্যে দুঃখ হওয়া উচিত। বেচারীরা! ... ... আর কারুর দুঃখ হোক্ না হোক্, অন্ততঃ আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে দুঃখিত।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

ওগো, বল বল বল মোরে,
কোথা গেলে পাব মনোচোরে।

মেঘে মেঘে মাখা আঁধি,
'আলো-আলো' ব'লে সাধি,
কেঁদে কেঁদে খুঁজি দোরে দোরে

•

আমার পীতম পাশে
রবি-শশী-তারা হাসে,
প্রেমের কিরণ পড়ে ঝ'রে।

•

হে বঁধু, বিরহী বুকে
এস তুমি হাসিমুখে—
দেখে সুখে ভাসি আঁখিলোরে।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ (১) সাবিত্রী (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম)

পরিচালক—নরেশচন্দ্র মিত্র।

ভূমিকালিপি :—সাবিত্রী—শান্তিগুপ্তা; সত্যবান—জীবন গাঙ্গুলি; দ্যুমৎসেন—অল্পগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র; শৈব্যা—তারাসুন্দরী; প্রভৃতি।

ছবিখানি এই সপ্তাহে ক্রাউন সিনেমায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করল।

•

'সাবিত্রী'র আখ্যানবস্তু আমাদের কাছে নতুন নয়। এবং এর পূর্ব্বে এই পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রসংস্করণ দেখবার সৌভাগ্য (?) আমাদের

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর
সাবিত্রী-চিত্রের একটী দৃশ্য

হয়েছে। সুতরাং এই নতুন-সাবিত্রী দেখতে যাবার সময় যদি তার মধ্যে কোন নতুনত্ব উপভোগ করবার আশা ক'রে থাকি, তাহলে খুব বেশী অন্যায় করেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সাবিত্রীর মধ্যে বিশেষ কোনই নতুনত্ব বা শিল্পোৎকর্ষের প্রমাণ পাইনি।

•

নরেশ বাবুর কাজের মধ্যে উল্লেখ ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারি এমন কোন উদাহরণ মনে পড়ছে না। প্রশংসা করতে পারি সাবিত্রীর ফোটোগ্রাফী—চমৎকার হয়েছে, কোথাও কোন অসঙ্গতির ছাপ ফুটে ওঠে নি।

মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি, সাবিত্রীর লোকেশন নির্ব্বাচনের। নরক-দৃশ্যের Suggestive representation ও সঙ্গে-সঙ্গে তার realistic effect উদ্ভবের টেক্‌নিক্‌-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। শেষের দিকে যমের পিছনে সাবিত্রীর দীর্ঘ অনুসরণ দৃশ্যটিও কৌশলের সহিত গ্রহণ করা হয়েছে।

*

সাবিত্রীর সিনেরিও রচনা ভাল লাগল না। স্থানে স্থানে অর্থহীন এবং হাস্যকর উক্তি অনেক দৃশ্যের মাধুর্য্য নষ্ট করেছে। দুটো উদাহরণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—রাজা অশ্বপতি রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে কন্যা সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে কেমন আছে তাই দেখতে যাচ্ছেন। রাণী এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বল্‌ছে—'আপনি যাচ্ছেন! কিন্তু রাজ্য'? একদিন একরাত্রে রাজা অন্যত্র গেলে রাজ্য রসাতলে যাবে নাকি?

আর-একস্থানে অত্যন্ত ট্র্যাজিক অবস্থার মধ্যে যমের সঙ্গে সাবিত্রীর কথোপকথনের সময় 'প্রেমের হিল্লোল' কথাটি অত্যন্ত চটুল এবং লঘু শুনিয়েছে।

মোটের উপর সাহিত্যিক - সৌরীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে উন্নত শ্রেণীর ডায়লগ্‌ আশা করেছিলাম।

*

যমের conception আমাদের রুচি ও পৌরাণিক জ্ঞানকে আহত করেছে। যম দেবতা; তাঁকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়। তাঁর ওরূপ দানবীয় চেহারা এবং বীভৎস বাচনভঙ্গী মোটেই correct হয় নি বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া ধর্ম্মরাজের দণ্ডের অগ্রভাগে মড়ার মাথা লাগানোর ব্যাপারটিও অত্যন্ত হাস্যকর লাগ্‌লো।

Song of Songs—চিত্রে
মার্লিন্‌ ডিয়েট্রিক ও লাওনেল এ্যাট্‌উইল

অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করবার প্রয়োজন নেই। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, চিত্রনাট্যের ভাবপ্রবণ উক্তিগুলিকে অভিনেতৃবর্গ প্রাণপনে ভাবপ্রবণতার অতি-উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে স্বাভাবিক সহজভাবে তাঁর কথাগুলি ব'লে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছিলেন। তাঁর গানগুলিও মাধুর্য্যের সঞ্চার করেছিল। সাবিত্রীর অভিনয়ে শান্তি গুপ্তার আড়ষ্ট ভাব এবং নিষ্প্রাণ যন্ত্রচালিত বাচনভঙ্গী আমাদের পরম দুঃখের কারণ হয়েছিল। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি ভালো - তবে তা পৌরাণিক সাবিত্রীর চেয়ে আধুনিক কথাশিল্পীর সাবিত্রীর অভিনয়ে অধিকতর প্রযোজ্য! তারাসুন্দরীর অভিনয়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইনি। পাবার Scope-ও বিশেষ ছিল না। তবে যে তিনি আজীবন ষ্টেজে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে অভিনয় ক'রে এসেছেন, সে-কথাটি তাঁর সামান্য অভিনয়ের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল।

*

ছবিখানির মধ্যে আর একটি বস্তু যা আমাদের চক্ষুকে দস্তুরমতো পীড়িত করেছে তা হচ্ছে এর পাত্র-পাত্রীর অনাবশ্যক মৃদু গতিভঙ্গী এবং সেই হাস্যকর slow movementকে ক্যামেরার সামনে অসহ্য দীর্ঘক্ষণ বজায় রাখা। মনে হচ্ছিল যেন, কোন স্বাভাবিক ছবির slow-motion-এ তোলা সংস্করণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে চলেছে! শেষের দিকে ছবিখানি কতক পরিমাণে এ-দোষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

(২) Song of Songs (প্যারামাউণ্ট্‌)

প্রধান ভূমিকায়—**মার্লিন্‌ ডিয়েট্রিক্‌**

পরিচালক—Rouben Mamoulian!

ছবিখানি আজ থেকে এলফিন্‌ষ্টোনে সুরু হয়েছে।

*

মার্লিন্‌ ডিয়েট্রিক্‌ ছাড়াও এ-ছবিতে আরও অনেকগুলি খ্যাতনামা নট-নটীর দেখা পাওয়া যাবে, যথা—লাওনেল্‌ য়্যাট্‌উইল; য়্যালিসন্‌ স্কিপ্‌ওয়ার্থ; ও ব্রায়ান আর্ণ্‌। পৃথিবীখ্যাত জার্ম্মাণ লেখক হার্মান সুডার-ম্যানের উপন্যাস Song of Songs একখানি শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর কথা-শিল্পের পরিচায়ক রূপে সুনাম অর্জ্জন করেছে।

Song of Songs—নরনারীর সহজ সাধারণ জীবনের নিত্যকারের কথা—একটি প্রেমের কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে এক সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণীর জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। লিলি ছিল দরিদ্রের মেয়ে—চাষার মেয়ে। শহরে গিয়ে সে এক ভাস্করের সংস্পর্শ লাভ করলে—ওয়াল্‌ডো তার নাম। এই তরুণ শিল্পীর সঙ্গ-লাভ করবার পর থেকে তার জীবনে পরিবর্ত্তন সূচিত হ'ল! শিল্পীর মডেল রূপে লিলি বিবসন দেহে তার সুমুখে pose দিলে—ওয়াল্‌ডো তার সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে লিলির এক পরম সুন্দর মূর্ত্তি তৈরি করলে। প্রেমের দেবতার তীর দু'জনের অন্তরে এসে লাগ্‌লো···

*

কিন্তু এ-প্রেম পরিণতি লাভ করতে পারলে না। রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল—ব্যারণ মারজ্‌ ব্যাক্‌, এক প্রকাণ্ড ধনী এবং ওয়াল্‌ডোর মুরব্বি। ব্যারণের কৌশলে ওয়াল্‌ডো লিলিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল এবং লিলি ব্যারণকে বিবাহ করল—ট্র্যাজেডির প্রথম স্তর গাঁথা হ'ল।

*

নব-বধূর জীবন যে কিছুদিনের মধ্যেই বিষময় হ'য়ে উঠ্‌লো সে কথা বলাই বাহুল্য। দেহ-ভোগী ব্যারণ লিলির দেহকে মাত্র কামনা করেছিল,

তার মন চায় নি। এই সময় ভন্ প্রেল্ নামে একজন শিক্ষক। সে লিলিকে অশ্বারোহণ বিদ্যা শেখাবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল। লিলির সঙ্গে প্রণয়ের যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য চেষ্টিত হ'ল। সেই সময় এক নৈশ-ভোজনে ওয়াল্ডো এসে হাজির হ'ল—নিজের দাবী জানাবার জন্যে নয়, ব্যারণের নিমন্ত্রণে। কিছুদিন থেকেই লিলির মন ছিল অপ্রকৃতিস্থ। সে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে সবার চোখের ওপর দিয়ে ভন্ প্রেলের কুটিরে চ'লে গেল…

*

কুটিরে লাগলো আগুন! ব্যারণ ভৃত্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। অসম্বৃত অবস্থায় লিলিকে দেখা গেল—প্রেল্ তাকে বহন ক'রে বাইরে নিয়ে আসছে। ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে ব্যারণ লিলিকে ডাইভোর্স করলে। লিলি নিরুদ্দেশ হ'ল।

তারপর চলল তাকে খোঁজার পালা—ওয়াল্ডো তাকে দেশে-বিদেশে অন্বেষণ ক'রে বেড়াতে লাগল। শেষে বার্লিনের এক নাইট্ ক্লাবে ওয়াল্ডো লিলিকে দেখতে পেলে—উদাস উচ্ছৃঙ্খল লিলি, তরল-কণ্ঠে গান গাইছে। ওয়াল্ডো তাকে নিজের ষ্টুডিওয় নিয়ে এলো। সেখানে লিলি পুনরায় তার সেই সুন্দর Statueটি দেখলে—যে মূর্ত্তির মধ্যে ফুটে রয়েছে, তার মনের নিষ্পাপ সারল্য, যা সে এতদিনে নিঃশেষে ফেলেছে হারিয়ে। রাগে, দুঃখে লিলি সেই মূর্ত্তিকে আঘাত ক'রে তাকে চূর্ণ ক'রে ফেল্লে। তারপর মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান হবার পর ওয়াল্ডোর মুখের পানে তাকিয়ে সে বল্লে—মূর্ত্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অতীত জীবনের দুঃখের দিনও শেষ হ'ল প্রথম প্রেমের সুমধুর দিনগুলি আবার তাদের মধ্যে ফিরে আসুক।

Song of Songs চিত্রে মার্লিন ডিয়েট্রিকের অভিনয়-প্রতিভা নবতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। সরলা পল্লীবালার যে মধুর অথচ নিখুঁত ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে তাঁর শক্তির নতুনতরো বিকাশ দেখা গেছে। এ-ধরণের ভূমিকা তিনি এই প্রথম অভিনয় করলেন।

Rouben Mamoulian-এর পরিচালনাও এ-ছবির আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু। মার্লিন এ-পর্য্যন্ত যত ছবিতে অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেকখানি পরিচালনা করেছেন—জোসেফ ভন্ ষ্টার্ণবার্গ। এই প্রথম তিনি অন্য পরিচালকের অধীনে ছবি তুল্লেন। পরিচালনার কাজও যে বিশেষ ভাল হয়েছে তাতে সন্দেহ করবার নেই। পরিচালনার প্রসঙ্গে একটি বিলাতী কাগজ লিখছে—Director Mamoulian has given the picture illuminating flashes of a brilliant genius. Many of his sequences are sheerest artistry!

গ্রেটা গার্কো এই ছবিখানির প্রথম প্রদর্শন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং শেষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। মার্লিনের নিজের মতানুসারে এই ছবিতেই তিনি সব-চেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন।

*

নটনটী ও তাঁদের আধুনিকতম ছবির নাম—

র‍্যামন নোভারো মেট্রোর শিল্পগৃহে The cat and the Fiddle নামক চিত্রে অভিনয় করছেন। গ্যারি কুপার সম্প্রতি প্যারামাউন্টের ছবি One Sunday Afternoon-এর কাজ শেষ করেছেন। রিচার্ড ডিক্স্ কয়েকদিন হ'ল রেডিও পিক্চার্সের ষ্টুডিওয় Bird of Prey নামক ছবির কাজ শেষ করেছেন।

নর্ম্মা শিয়ারারকে মেট্রোর কর্ত্তারা তাদের নতুন ছবি La Tendresse-তে নায়িকার ভূমিকা দিয়েছে। সিল্ভিয়া সিড্নি এতদিন পর্য্যন্ত মরিস শিভালিয়েরের সঙ্গে প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওয় The way to love নামক ছবিতে অভিনয় করছিলেন, সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল অসুস্থতার জন্যতে তিনি উক্ত ছবির ভূমিকা বর্জ্জন করেছেন। তার স্থান পূর্ণ করেছেন, অ্যান্ ডি ভোরাক। বারবারা ষ্ট্যানউইক ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ষ্টুডিওয় Ever in my Heart ছবিতে অভিনয় করছেন।

জনি ওয়েসমূলার মেট্রোর তরফে আর একখানি টারজন চিত্র তুলছেন—Tarzan and Mate. ফ্রেডরিক মার্চ প্যারামাউন্ট চিত্রাগারে Design for নামক ছবিতে অভিনয় সুরু করেছেন। এড্মাণ্ড লো উক্ত ষ্টুডিওয় I Bodyguard ছবিতে অভিনয় করছেন। চার্লস লাফ্টন উক্ত ষ্টুডিওয় White Woman ছবিতে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এলিসা ল্যান্ডি ফক্স ষ্টুডিওয় I loved you Wednesday নামক ছবির কাজ শেষ ক'রে এখন অবসর ভোগ করছেন। মে ওয়েষ্ট প্যারামাউন্টের তরফে ছবি তুলছেন—I am no Angel! মিরিয়ম হপকিন্স প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওয় Desing for Living চিত্রে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। ক্যাথরিণ হেপবার্ন রেডিও পিক্চার্সের তরফে তাঁর দ্বিতীয় ছবি তুলছেন—Little Woman!

*

হলমুক ফিল্ম কর্পোরেশন নামে যে দেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি

গঠিত হয়েছে তার খবর সম্ভবত আমাদের পাঠকদের অগোচর নেই। এঁরা বহু অর্থব্যয়ে বিলাতী ভাল ভাল ছবি এদেশে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের City of Songs আমরা দেখেছি এবং দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। কাল থেকে এঁদের আর একখানি উৎকৃষ্ট ছবি স্থানীয় কর্ণওয়ালিশ্‌ থিয়েটারে দেখানো হবে। ছবিখানির নাম—Oliver Twist!—চার্লস্‌ ডিকেন্সের অমর উপন্যাসের চিত্ররূপ! ছবিখানি কিছুদিন পূর্ব্বে সাহেবপাড়ার "ম্যাডান থিয়েটারে" দেখানো হ'য়েছিলো। এবার উত্তর কলিকাতার অধিবাসীদের এই ছবিখানি দেখবার সুযোগ দিয়ে

"নিউ থিয়েটার্সে"র 'রাজরাণী মীরা'-চিত্রে

মিসেস্‌ খোটে ও শ্রীমতী অলিনা

এঁরা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হ'লেন। চিত্র-জগতের সুপরিচিত বালক-অভিনেতা ডিকি বুর এই ছবিতে চমৎকার অভিনয় করেছে। ছবিখানি আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে আনন্দ দিতে সক্ষম হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

•

আমেরিকার Photoplay নামে যে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত মাসিকপত্রখানি আছে ওদের তরফ থেকে বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবিখানিকে একখানি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। ছবির উৎকর্ষের বিচার করেন—পাঠকবৃন্দ! এ বৎসরে এদের সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদকটি লাভ করেছে—মেট্রো গোল্ডউইনের ছবি 'Smiling Throu'। নর্মা শিয়ারার এই ছবিতে অভিনয় করেছেন; তাঁর সঙ্গে আছেন লাওনেল্‌ ব্যারিমুর।

১৯২০ সাল থেকে এই পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। কোন্‌ কোন্‌ ছবি কোন্‌ কোন্‌ সালে এই পদক লাভ করেছে তার তালিকা দেওয়া গেল—(১৯২০)—Humoresque; (১৯২১) Tol'able David; (১৯২২) রবিন্‌ হুড্‌; (১৯২৩) Covered Wagon; (১৯২৪) Abraham Lincoln; (১৯২৫) Big Parade; (১৯২৬) Beau Geste; (১৯২৭) 7th Heaven; (১৯২৮) Four Sons; (১৯২৯) Disraeli; (১৯৩০) All Quiet on the Western Front; (১৯৩১) Cimarron!

১৯৩৩ সালের ছবির নির্ব্বাচন হবে, আগামী বছরে।

•

রূপবাণীতে সিড্‌নী-মুরে জোড়া অভিনেতার Cohens and Kellys in Trouble নামক হাসির ছবিখানি এই সপ্তাহে দেখানো হবে।

•

চিত্রায় মীরাবাই সুরু হ'ল।

•

নিউ সিনেমায়—'রাজরাণী মীরা' মীরাবাই-এর যথাযথ হিন্দী সংস্করণ না হলেও, ছবির আখ্যানবস্তুর সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী দুর্গাবতী খোটে 'রাজরাণী মীরা'-র নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন।

•

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর 'বিল্বমঙ্গল' খুব সম্ভব ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই তাঁর নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করবার জন্যে রূপবাণীর পর্দ্দায় দেখা দেবেন।

•

নিউ থিয়েটার্স মন্মথ রায়ের 'মহুয়া'র চিত্ররূপ প্রস্তুত করেছেন হীরেন বসু নামে একজন ম্যাডান-থিয়েটার-ফেরৎ চিত্রনট এই ছবিখানি পরিচালনা করবার ভার নিয়েছেন।

•

প্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলাই যে আজকের যুগধর্ম্ম এবং নিজের উন্নতি সাধন করতে হ'লে সেই যুগধর্ম্মকে অবলম্বন করাই যে যুক্তিসঙ্গত, কলিকাতার একটি জনপ্রিয় চিত্রভবন—'ছবিঘর'—সেই দামী কথাটি প্রমাণ করেছেন। উক্ত সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের ছবিঘরে শুধু নতুন যন্ত্রপাতি লাগিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভাল ভাল ছবি আনিয়ে দর্শকদের পয়সার উপযুক্ত আনন্দ জোগাবার চেষ্টা করেছেন। গত সপ্তাহে ছবিঘরে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত ছবি Cavalcade দেখানো হয়ে গেল। এ-সপ্তাহে সেখানে মেট্রোর নামকরা ছবি Rasputin and the Empress সুরু হয়েছে। এই ছবিতে স্বনামধন্য ব্যারিমুরদের দুই ভাই ও এক বোন অভিনয় করেছেন।

গোটাকয়েক কথা

(প্রাপ্ত)

(শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র)

গত সপ্তাহে নরেশবাবুর "সাবিত্রী" দেখতে গিয়েছিলুম। বিজ্ঞাপন ও ছবি দেখে গোটাকতক কথা যা মনে জেগেছে তাই বলতে চাই, একে যেন কেউ ছবির সমালোচনা বলে ভুল না করেন।

ছবির যেখানে যত বিজ্ঞাপন দেখ্ছি সর্ব্বত্র শান্তি গুপ্তা ও জীবন গাঙ্গুলী প্রভৃতির নামের নীচে তারাসুন্দরী বলে জনৈকা অভিনেত্রীর নাম দেখ্ছি। প্রাচীর-পত্রে ত নামই নেই। এ দেখে স্বতঃই মনে হয়েছিল যে এ তারাসুন্দরী ঐ চীপ থিয়েটার বা চণ্ডী থিয়েটারে যে-সব ছোট ছোট তারাসুন্দরী দেখা দিয়েছেন তাঁদেরই কেউ হবেন। কিন্তু ছবি দেখতে গিয়ে দেখলুম যে যিনি শৈব্যার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠতমা অভিনেত্রী নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী! বিলেতে প্রথা আছে বটে, তরুণী সুন্দরী নায়িকার নাম পুরোভাগে দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা। কিন্তু সেখানে যদি এলেন টেরি বা সারা বার্নাড-এর মত কোনও বৃদ্ধা অভিনেত্রী চিত্রাভিনয়ে নামতেন তাহলেও তারা তরুণী নায়িকার নাম বিজ্ঞাপনে আগে দিত কিনা সন্দেহ। এমিল জেনিংস প্রৌঢ় ও কুৎসিত বটে, কিন্তু তিনি যে-ছবিতে নামেন সে ছবির পুরোভাগে কেউ কোনও তরুণ-তরুণীর নাম বসাতে সাহস করেছে ব'লে আমার জানা নেই।

তারাসুন্দরী বৃদ্ধা কি অসমর্থা সে বিচার আজ করবার দরকার নেই। কিন্তু আজও তিনি জীবিত সমস্ত নটনটীর উপরে বিরাজ কর্চ্ছেন এবং আজও তাঁর নাম প্রাচীরপত্রে পড়লে খানিকটা বেশী বিক্রী হয়ই! আমাদের মনে হয় যে নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীর এই প্রথম সবাক চিত্র; সুতরাং তাকে সেই ভাবে বিজ্ঞাপিত করলে অন্ততঃ প্রথম সপ্তাহে নিশ্চয়ই আরো ভাল ফল হোত। এত বড় একজন অভিনেত্রীকে প্রচুর টাকা দিয়ে নামিয়েও যদি সেই ব্যাপারটাকে যথেষ্ট 'বুম' করা না হয় তাহ'লে অত কাণ্ড করার সার্থকতা কি?

শুনেছি এলেন টেরির অতি বৃদ্ধ বয়সে (বোধ হয় নব্বই) লণ্ডনের জনসাধারণ এক সম্মান-রজনীর ব্যবস্থা করেন। তাতে এলেন টেরি একটী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ দিন ঐ অভিনয় দেখবার জন্য এত জনসমাগম হয় যে হোটেলে অনেকেরই স্থান সংকুলান হয়নি, তাঁরা দুতিন রাত্রি ধ'রে রাস্তায় প'ড়েই কাটিয়েছিলেন। তাঁরা কি শুধু অভিনয় দেখবার জন্যই অত কষ্ট করেছিলেন? একথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে অত বৃদ্ধ বয়সে কোনও দেশে কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে যৌবনোচিত অভিনয় করা সম্ভব। যে অভিনেত্রী নিজের নাট-নিপুণতায় সকলের শীর্ষ-স্থানে উঠেছিলেন তাঁকে সম্মান করতে ওদেশের লোক জানে, আমরা জানিনা।

তা ছাড়া তারাসুন্দরীর মত অতবড় অভিনেত্রীকে "সাবিত্রী" ছবিতে নামানোর সার্থকতাই বা কি? শৈব্যার ভূমিকায় কোথাও বোধ হয় এক লাইনের বেশী কথা নেই এবং অভিনয়ের মধ্যেও চলা ফেরা বসা ছাড়া আর কিছুই নেই। খামকা এই মশা মারার জন্য কামান দাগারই বা প্রয়োজন কি ছিল। তারাসুন্দরীকে যখন শৈব্যার ভূমিকায় নামানো হ'বে স্থির হোল তখন ঐ ভূমিকাটিকে কি বিশেষভাবে লেখা উচিত ছিল না? চিত্রনাট্যের মধ্যে কোনও important ভূমিকাই হওয়া উচিত ছিল শৈব্যার—যাতে ওঁর অভিনয়ে সে ভূমিকা মর্য্যাদাসম্পন্ন হোত এবং বইখানাতেও কিছু প্রাণ সঞ্চার হোত।

তারাসুন্দরীকে যদি নামাতেই হয় কোনও সবাকচিত্রে, তাহ'লে বিশেষ করে সে পালা লিখতে হবে। যাতে এমন ভূমিকা থাকবে যে ওঁর বয়স এবং দৈহিক অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী হবে অথচ ওঁর এখনও যে শক্তি অবশিষ্ট আছে তারও পরিপূর্ণ বিকাশের পাবে। একটা জিনিষ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের দেশের প্রযোজকদল কোনও নতুন ধরণের ছবিতে কিছুতেই হাত দিতে চান না; সেই পৌরাণিক বা অর্দ্ধ-পৌরাণিক বই, যাতে শুধু সেটিং দেখিয়ে বা গান শুনিয়ে আর্দ্ধেক কাজ হয় সেই সব নিয়েই যেন তাঁদের একচেটে কারবার। চণ্ডীদাস, সীতা, সাবিত্রী (২), শ্রীগৌরাঙ্গ (২?), মীরাবাই, বিল্বমঙ্গল আর চাঁদসদাগর—এই সব দেখে-শুনে চোখ প'চে গেল যে! একটা জমাট Social Play বা Mystery and Horror জাতীয় কিছু করুন না কেউ? বিলিতী Thriller দেখিয়ে আমাদের দেশ থেকে রাশি রাশি পয়সা নিয়ে যাচ্ছে সবাই, অথচ আমাদের দেশের ডিরেক্টারদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা, চারুশীলা, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন প্রভৃতি শিল্পীদের দ্বারা কোনও রহস্য বা বিভীষিকামূলক ছবি তুললে তা কি জমবে না? অবশ্য যদি গল্পটা যথেষ্ট জমাট হয়। কিম্বা Adventure ও Romance'এ মিশানো কিছু?

আর একটা কথা। নির্ব্বাক ছবির সময় ঘটনার অগ্রগতি ঘটত কিছু দ্রুত লয়ে। কিন্তু সবাক ছবিতে সেটা অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়েই ঘটে—এবং তাতে ক'রে ব্যাপারটা বেশ জমাট হয়। কিন্তু ঘটনা কিছু থাক চাই ত? এই জ্ঞানের কত অপব্যবহার ডিরেক্টাররা করতে পারেন তার যথেষ্টরও বেশী প্রমাণ পেলুম সাবিত্রীতে। সবাই চল্ছে, পা গুণে গুণে, বসছে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে; কিছুমাত্র ঘটনা অগ্রসর হচ্ছে না অথচ রীলের পর রীল ছবি দেখানো হচ্ছে। কারুর কিছুমাত্র তাড়া নেই। দর্শকদের সময় কি এতই সস্তা? না ধৈর্য্যের সীমা নেই? অকারণে কতকগুলো লোক চলছে ফিরছে, কথা কইছে, এবং থামলে গান গাইছে। এই কি ছবি? নরেশবাবুর মতো কাণ্ড-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যে এমন প্রাণহীন ঘটনাহীন মন্থর ছবি তুলতে পারেন তা আমরা কখনও আশা করিনি। ভালো ভালো শিল্পী, মূল্যবান এবং সুন্দর সেটিং, এবং অজস্র অর্থের কি অপব্যয়ই লোক ক'রতে পারে, আশ্চর্য্য!

একখানা ছবি যখন ভালো হয় তখন আর ডিরেক্টাররা সেই বিশেষ ডিরেক্টারের শক্তি কিছুতেই স্বীকার করতে চান না, তাঁরা মনে করেন যে, কোনও একটা বিশেষ কৌশলে বা কারণে দৈবাৎ ও ছবিখানা ভাল হয়ে উৎরে গেছে। এবং সেই বিশেষ কৌশলটা যে-কোনও ছবিতে লাগালেই তা জমতে বাধ্য। কিন্তু সব জিনিষেরই মাত্রা-বোধ থাকা দরকার, এই মস্ত সহজ সত্যটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

প্রয়োগ-কৌশল

তিন

প্রযোজকের কার্য্যসূচী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(মণিকা ইউয়ার)

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

কোন নট বা নটীকে মহলার সময় চরিত্রের ভাব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে প্রযোজকের তাঁকে বুঝতে দেওয়া উচিত নয় যে তিনি সর্ব্বদাই নট বা নটীটির অভিনয়ে খুঁত ধ'রছেন। বিশেষতঃ যদি নট বা নটীটি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হন। মহলার সময় অভিনয়ের সমালোচনা না ক'রে পরে নিভৃতে সেই বিষয়ে আলোচনা ক'রলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। মহলার সময় নট-নটীকে যদি একটু প্রশংসা করা যায় তাহ'লে খুব কাজ আদায় হ'তে পারে; যেমন—"বেশ, বেশ! আপনার অভিনয় খুব সুন্দর হ'চ্ছে—তবে এই রকম যদি না করেন তবে অভিনয় একটু ঢিলে হ'য়ে পড়বে না; আপনি কি বলেন?" ইত্যাদি। এতে নট বা নটীটি অন্যান্য শিল্পীদের সামনে লজ্জিত হয়েও উঠবেন না অথচ প্রযোজকেরও কাজ ঠিক গুছিয়ে নেওয়া হবে।

মহলার সময় একসঙ্গে অনেক কিছু করবার আশা প্রযোজককে ত্যাগ ক'রতে হবে। অভিনয়ের একটা মোটামুটি পদ্ধতি জানবার পর প্রযোজক খুঁটিনাটির দিকে মন দিতে পারেন। এবং এর জন্যে প্রযোজক যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খুসী হন ততক্ষণ কোন দৃশ্যের কয়েকবার মহলা দেওয়াতে পারেন। কোন শক্ত 'emotional' দৃশ্যের মহলার সময় তিনি দেখেন যে নট বা নটীটি একটু একটু ক'রে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ছেন তখন তাঁর মহলা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। কিছু পরেও যদি নট বা নটীটি সে-ভাব কাটিয়ে উঠতে না পারেন তাহ'লে সেদিনকার মত মহলা স্থগিত রাখতে হবে। নট-নটীরা এই রকম দৃশ্যের সময় যাতে অভিনয়ের পর্দ্দা খুব আস্তে আস্তে চ'ড়িয়ে যান সেদিকে প্রযোজকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রতে হবে। দৃশ্যের চরম উন্নতির স্থান বা 'climax' কোন্খানটায় তা' প্রযোজককে আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখতে হবে। 'climax'-এর পর 'anti-climax'-এ যাতে না অভিনয় পৌঁছয় সেইজন্যে বিভিন্ন ধারায় নট-নটীদের অভিনয় চালাতে হবে। 'At the climax try a complete break'; 'emotional' দৃশ্যের পরে নট-নটীরা যে কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন তার ভাবপ্রকাশ ক'রতে হবে। এই রকম দৃশ্য ভালভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে প্রযোজককে মৌলিক পন্থার খোঁজে মাথা ঘামাতে হবে। মরা, পচা, একঘেঁয়ে ও প্রচলিত প্রথায় 'climax' আনার চেয়ে না আনাই ভাল কারণ তার প্রভাব মনের উপর রাজত্ব ক'রতে পারে খুব অল্প সময়ের জন্যে। (ক্রমশঃ)

পরিচালক প্রসঙ্গ *

(শ্রীসত্যেন বসু)

ছবি দেখতে গিয়ে প্রায়ই এমন ঘটে থাকে যে আমরা পর্দ্দার উপর দৃশ্যমান লোকজন ছাড়াও অপর একজন সূক্ষ্মকলাবিদের শিল্প-নৈপুণ্যকে মনে মনে শত প্রশংসা করি। ছবিকে ভাল বা মন্দ করা না-করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই লোকটীর উপর। এমন কত ছবিই ত' আপনারা দেখেছেন যা কেবল পরিচালকের কৃতিত্বের গুণে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই সব ছবিতে কত অশ্রুতপূর্ব্ব নট-নটী অভিনয় করে তারকা ব'নে গেছেন। যেমন ধরুন—Cimmaron-এ অভিনয় ক'রে Irene Dunn, Richard Dix; Congress Dances-এ Henry Garat, Lilian Harvey; All Quiet-এ Lewis Ayres. Street Scene ছবিটীর কথা বোধ করি আজও ভুলে যান নি: পরিচালক King Vidor-এর গুণেই ত' ছবিখানা অমন চমৎকার হয়েছে। Street Scene-এর আগে Sylvia Sydney বা William Collier Jr-এর নাম ক'জন ভদ্রলোক জানতেন? All Star Cast হলেই ছবি ভাল হয় না—Squawman বা Huddle ও হতে পারে। কেবল পরিচালনার জোরেই ভাল ছবি হয়—বছরের সেরা ছবি হয়—All Quiet হয়। D. W. Griffith-এর প্রত্যেকটী ছবিই 'director's picture'. Sanghai Express—Josef Von Sternberg-এর ছবি। অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না যে অভিনেতার জোরে ছবি উৎরে যায় নি। এই ত' Spencer Tracy, John Barrymore রয়েছেন—ছেড়ে দিন না এদের বনে বাদাড়ে যেখানে সেখানে যে কোন ভূমিকায় সমানে ছবি জমিয়ে দেবেন। Lionel Barrymore কত বাজে গল্পওয়ালা ছবি বাঁচিয়েছেন—যেমন ধরুন The Man I killed, Washington Masquerade. Fedric March—Eagle and the Hawk এ কি করলেন? Wallace Beery, Warner Boxter, Norma Shearer, Janet Gaynor প্রভৃতি কত এই রকম artiste আছেন।

*

অতবড় Hollywood, অগুন্তি player, অসংখ্য director! ক'জনকে নিয়ে আলোচনা করবো! এ ত' আর আমাদের দেশ নয় যে নির্গুণও রাতারাতি megaphone-ধারী হয়ে বসে। 'Directorial touch' ওদের সব ছবিতেই অল্প বিস্তর পাবেন। নামজাদা যে ক'জন আছেন তাঁদেরই গল্প করবো। আমাদের দেশের একমাত্র পরিচালক হচ্ছেন দেবকী বোস (তাঁর 'পূরণ ভকতের' কাজ দেখে তাঁকে 'director' আখ্যা দিতে আশা করি আপনাদের কারুর আপত্তি হবে না। 'পূরণ-ভকতে'র মত ছবি করতে পারলেই আমরা পরিচালক বলবো নইলে ত' জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়, জাল আরিয়া, জাহাঙ্গীর ম্যাডান প্রভৃতি অনেক ধুরন্ধরই DIRECTOR)। অথচ দেবকী বোসের সঙ্গে শ্রেণীবিচার ক'রতে গেলে Son of Indiaর পরিচালক Jacques Ferdyer ও বাদ পড়েন না। দেবকী বোস, দেবকী বোস ক'রে যখন পাঁচশো বার মরছি তখন বোধ করি আপনাদের কাছে ধরা পড়ে গেছি। সত্যি দেবকীবাবুর সম্বন্ধে একটা কথা বলবার জন্যে বারবার কুণ্ঠিত হচ্ছি। এখন আর গোপন ক'রে কোন লাভ নেই। আমি বলছিলুম কি যে ভারতের সেরা পরিচালক দেবকী বোসের inborn talents আর experienceএর সঙ্গে যদি বিদেশী কিছু দেখাশোনা থাকতো তাহ'লে 'পূরণ ভকত'কে আরও কত সুন্দর দেখতে পেতাম। বিদেশ বলতে আমি বিলেত বুঝি না। আপনার "Britain's yet best" Rome Express 'পূরণ ভকতে'র থেকে কোন অংশে ভাল নয়। Rome Expressএর William Forde বা ও-দেশের সেরা পরিচালক Herbert Wilcox যে দেবকীবাবুর চেয়ে গুণী বেশী তা ত' মনে হয় না—অন্ততঃ আমার মনে (সত্যি স্বদেশ-প্রীতির আধিক্যবশতঃ এ কথা বলছি না, যেমন বিলিতি কাগজওয়ালারা বলে থাকে আমেরিকান্ 'প্লেয়ারকে' খোঁচা দিয়ে কোন বিলিতি 'প্লেয়ার'কে publicity দিয়ে বড় করবার বেলায়)। (ক্রমশঃ)

* মতামত লেখকের নিজস্ব। সাংবাদিকতার সৌজন্য রক্ষার জন্যে আমরা লেখাটি ছাপালুম। নাঃ সঃ।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

[প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. . 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৯ম বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৮ই অগ্রহায়ণ,
১৩৪০

নাট্যজগৎ

নটী থিয়োডোরা ছিল কনস্তান্তিনোপ্‌লের খেলার পুতুলী। কিন্তু আজ থিয়োডোরাকে বাদ দিলে পৃথিবীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আপনারা কি তার আশ্চর্য্য কাহিনী শোনেন নি? আচ্ছা, এবারের পালা তবে গল্প বলবার পালাই হোক্। কিন্তু সত্য গল্প—একেবারে ঐতিহাসিক।

"Front Page" চিত্রের একটি দৃশ্যে বিখ্যাত চিত্রনট এ্যাডল্‌ফ্‌ মেঞ্জু

তিন বোন। কোমিতো, থিয়োডোরা আর আনাস্তাসিয়া। তাদের তনুর গড়ন ও রূপ-যৌবন দেখলে মদনও বোধ হয় হৃদয় হারিয়ে ফেলত। জন্ম তাদের সাইপ্রাস দ্বীপে, ভদ্রপরিবারে। কিন্তু তাদের দেহ নিয়ে লীলাখেলা করত কনস্তান্তিনোপ্‌লের রূপের উপাসকরা।

•

থিয়োডোরা ছিল নর্ত্তকী এবং অভিনেত্রী, নির্ব্বাক অভিনয়ে তার দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব। এবং সে-দক্ষতা হাস্যরসের অভিনয়েই ফুটে উঠত বেশী-মাত্রায়। কিন্তু চিত্র ও কাব্য তার যে-তনুর কমনীয়তা প্রকাশ করতে পারত না, তার সেই তনুই ছিল দর্শকদের চোখে সব-চেয়ে লোভের বস্তু।

•

দেহ-দানের দিক দিয়ে থিয়োডোরাকে কৃপণ বলতে পারত না কেউ। এ-বিষয়ে পৃথিবীর খুব কম নারীই থিয়োডোরার মতন উদারতা দেখাতে পেরেছে। তার দেহের সৃষ্টি হয়েছিল যেন অকুণ্ঠ দানের জন্যেই। ধনী হোক্ গরিব হোক্, চেনা হোক্ অচেনা হোক্, ভদ্রলোক হোক্ ছোটলোক হোক্, থিয়োডোরা হতাশ করত না কারুকেই। অবশ্য, বিনামূল্যে সে নিজেকে বিলিয়ে দিত না, কারণ তার মূলমন্ত্র ছিল—'কালো কড়ি, মাখো তেল।" পয়সার জন্যে লজ্জাকে সে লজ্জা দিতে পারত। রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতেও সে ইতস্তত করত না কিছুমাত্র।

•

সভ্য জগতে তখন রোমের প্রাধান্য—যদিও রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন রোমে নয়, কনস্তান্তিনোপ্‌লে। সাম্রাজ্যের অধীনস্থ আফ্রিকার স্থানবিশেষের এক শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তার নাম একেবোলাস। থিয়োডোরাকে তাঁর মনে ধরল। থিয়োডোরার জন্যে উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা ক'রে তাকে তিনি একেবারে নিজের ক'রে নিতে চাইলেন। থিয়োডোরাও পরম উৎসাহে সম্মতি জানালে। একেবোলাসের সঙ্গে সে আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হ'ল।

•

বুনো পাখী খাঁচা ভালোবাসে না। থিয়োডোরার শিকল-পরা চরণযুগল যতটুকু স্বাধীনতা পেত, লুকিয়ে ততটুকুরই সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ত না। আফ্রিকাতেও তার রূপ-যৌবনের গুপ্ত ভক্ত জুটল একাধিক। একেবোলাস এতটা আশা করে নি। হঠাৎ একদিন সে বুঝলে, থিয়োডোরা তার পকেটের চাঁদাকে দিনে দিনে যতই বাড়িয়ে তুলছে, বাইরের জনতার কাছে গিয়ে নিজের দেহের সম্পদকেও তত-বেশী খরচ করছে। অসম্ভব রমণী,—একে আলিঙ্গনের ভিতরে পেয়েও পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, থিয়োডোরার অন্ন গেল।

•

কিন্তু গ্রীক রতি ভেনাসের দ্বীপে (সাইপ্রাস) যার জন্ম এবং যার তরুণ তনুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুন্দরের ছন্দ, আকাশ অন্ধকার হ'লেও বিজলীর হাসি দেখে সে পথ চলতে পারে। আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া

থেকে য়ুরোপের কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌। অনেক দূর! কিন্তু তুচ্ছ এই দূরত্ব! সুদীর্ঘ পথের ধারে ধারে যত সহর যত গ্রাম ছিল, থিয়োডোরা সব জায়গাতেই নিজের দেহকে বিক্রী করতে করতে এল। এইটুকুই নারীর সুবিধা। পুরুষের দেহ এত সহজে বিক্রী হয় না।

*

আবার কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌! তার অন্তর্ধানে সহরের যাঁরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন, তার পুনরাবির্ভাবে আবার তাঁরা সচকিত হয়ে উঠলেন এবং নিজের ছেলেপুলেদের ভালো ক'রে সামলাতে লাগলেন—কারণ থিয়োডোরার বিছানায় এক রাত্রি শয়ন ক'রে পরদিন প্রভাতেই বিতাড়িত হবার জন্যে তারা সকলেই পরম উৎসুক! সে পথে বেরুলে তাই অনেকেই প্রাণপণে পলায়ন করত—কারণ তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই হবে গোল এবং কেলেঙ্কারি!

•

কিন্তু থিয়োডোরার পুনরাবির্ভাবের জন্যে কারুর আর ভয় পাবার ছিল না কিছু। আফ্রিকায় গিয়ে সে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সন্ধান পেয়েছিল। জনতার কোলের মেয়ে থিয়োডোরা, কনস্তান্তিনোপ্‌লে ফিরে এসে হ'ল নির্জন ঘরের গৃহিণী। রাতের পর রাত দেহের পূজারীরা তার দরজায় বারংবার কড়া নেড়েও উত্তর না পেয়ে, নিরাশ হয়ে শেষটা রাত্রে কড়া-নাড়ার উৎসাহকে দমন করতে বাধ্য হ'ল।

•

ছোট্ট একটি বাড়ী। সেইখানে পশম বুনে রূপসী থিয়োডোরার দিন কাটে। একাকিনী। বাইরের আহ্বান আর তার প্রাণকে ডাকতে পারে না। কিন্তু অবিশ্বাসী ইতিহাস বলে, এটাও হচ্ছে তার নটী-জীবনের অভিনব অভিনয়-চাতুর্য্য।

জাষ্টিনিয়ান! রোম-সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট! এবং ইতিমধ্যেই তিনি খুল্লতাতের নামে রাজ্য-চালনা করবার সুযোগও পেয়েছেন। জাষ্টিনিয়ান! কনস্তান্তিনোপলের পৃথিবীবিখ্যাত সেণ্ট্‌ সোফিয়া গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠা ক'রে শিল্পজগতেও যিনি অমর হয়ে আছেন এবং প্রাচ্য রোম-সাম্রাজ্যে যাঁর চেয়ে ক্ষমতাবান সম্রাট আর দ্বিতীয় হন নি। এই জাষ্টিনিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কনস্তান্তিনোপ্‌লের জীবন্ত খেলনা।

•

অবাক হবার কিছুই নেই। পৃথিবীর অনেক নটীই অনেক সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, রূপসী থিয়োডোরাই বা করবে না কেন? তবে এরি মধ্যে একটুখানি অন্য-কিছু আছে। কারণ আগুন যেমন ভাবে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, থিয়োডোরা আকর্ষণ করলে জাষ্টিনিয়ানের দৃষ্টিকে ঠিক তেমনি ভাবেই। কিন্তু থিয়োডোরা তো কাঁচা মেয়ে নয়, রোমের ভাবী সম্রাটের আদরে বিগলিত হবার পাত্রী সে ছিল না। সে সতী-সাধ্বীর মুখোস পরেছে বটে, কিন্তু শিকারের জীবের লোভ যে কেমন ক'রে বাড়িয়ে তুলতে হয়, এ আর্ট সে ভোলে নি। আর পাঁচজন দেহের ব্যাপারীর কাছে যত সহজে আত্মদান করেছে, জাষ্টিনিয়ানের কাছে তেমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে বিলিয়ে দিতে রাজি হ'ল না। এ যে মস্ত-বড় অভাবিত শিকার! কাজেই জাষ্টিনিয়ানের রক্ত-মাংসের ক্ষুধা যত বাড়ে, থিয়োডোরার কল্পিত সতীত্বও দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে তত-বেশী। বহুদিন যাকে পথের যে-সে হস্তগত করেছে, জাষ্টিনিয়ানের প্রবল বাহুও তাকে ধরি-ধরি ক'রেও ধরতে পারে না—সে যেন আলেয়া, মরুমায়া, অপচ্ছায়া!

যথাসময়ে ধরা দিতে হ'ল। এবং ধরা যে দেবে থিয়োডোরা তো সেটা জানতই! কিন্তু ধরা দিয়েও থিয়োডোরা এবারে নিজের ব্যক্তিত্বকে সুলভ ক'রে ফেললে না,—অসীম চাতুর্য্যের সঙ্গে জাষ্টিনিয়ানের ক্ষুধাকে সমান জাগ্রৎ ক'রে রাখলে। ভাবী সম্রাটের হৃদয় রইল তার হাতের মুঠোয় বন্দী। জাষ্টিনিয়ানের মত আর কেউ বোধ হয় তাকে ভালোও বাসে নি। সমস্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য থিয়োডোরার পায়ের কাছে ঢেলে দিয়েও জাষ্টিনিয়ানের মনের আশ মিটল না, তিনি চাইলেন তাকে সহধর্ম্মিণীর আসনে বসাতে!

*

বিপুল সাম্রাজ্যের চারিদিকে ঢিঢিকার প'ড়ে গেল! এ কী অসম্ভব কথা! সারা কনস্তান্তিনোপ্‌লের পথের পাঁক মেখেছে গায়ে যে দুষ্ট নারী, সে হবে ভাবী-সম্রাটের সহধর্ম্মিণী! এক ইতর গণিকা বসবে পবিত্র রোম-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে! দুঃস্বপ্নেও এমন কথা কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছে? রাজ-পরিবারের সবাই বেঁকে দাঁড়ালেন, গণিকার ছোঁয়াচে তাঁরা বংশগৌরব কলঙ্কিত করতে দেবেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আইনের পুঁথি খুলে দেখালেন তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, যে-নারী থিয়েটারের পেশা করেছে, কোন 'সিনেটর'ই তাকে বিবাহ করতে পারবেন না। জাষ্টিনিয়ানের দুঃখের ও থিয়োডোরার নিরাশার সীমা রইল না, আইন না মেনে উপায় নেই।

*

কিন্তু পঞ্চশরের পাঁচটি বাণই কেবল জাষ্টিনিয়ানের হৃদয়কে বিদ্ধ করে নি, ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁর ও থিয়োডোরার বিপক্ষে যেতে নারাজ হলেন। তখনকার সম্রাট জাষ্টিন, তাঁকে বিচলিত করলে জাষ্টিনিয়ানের কাতর অশ্রু। পুরাণো আইন রদ ক'রে তিনি নূতন বিধান দিলেন, যে কোন গণিকা বা থিয়েটারের নটী, রোম-সাম্রাজ্যের যে-কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারবে। পঞ্চশরের পুষ্পধ্বজা রোম-সাম্রাজ্যের আকাশে আরো-উঁচু হয়ে উঠল - বারবনিতা থিয়োডোরা হ'ল সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সহধর্ম্মিণী! বিশ শতাব্দী তার আধুনিক উদারতার জাঁক দেখায়, কিন্তু সেকেলে ছয় শতাব্দীর এই অপরিসীম উদারতার কাছে তার আধুনিকতার সব গর্ব্বই চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য।

•

জাষ্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তাঁর পাশে বসল সম্রাজ্ঞীর মুকুট প'রে থিয়োডোরা। সত্য ঘটনা এবং ইতিহাস এর সাক্ষ্য দিচ্ছে তাই, নইলে এ ঘটনার বাস্তবিকতায় আমাদের মন কিছুতেই সায় দিত না। ... ... এবং সেই অদ্ভুত সভ্যতার যুগে এমন একটিমাত্র ঘটনাই ঘটে নি। থিয়োডোরার বড়-দিদি কোমিতোর কথা গোড়াতেই বলেছি। সেও নটী, সেও গণিকা। তারও রূপের ফাঁদে প'ড়ে আর এক রাজা তাকে বিবাহ না ক'রে পারেন নি, তাঁর নাম সিট্টাস, ডিউক অফ আর্ম্মেনিয়া রূপে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত। এবং কোমিতোর কন্যাকে ইতিহাস জানে সম্রাজ্ঞী সোফিয়া নামে! থিয়োডোরার ছোট বোন আনাস্তাসিয়ার সঠিক খবর অনেক চেষ্টাতেও ইতিহাস হাঁটকে বার করতে পারি নি। আনাস্তাসিয়াও কোন রাজার মালা পেলে থিয়োডোরার বাবা একটি অতুলনীয় "hat-trick" দেখাতে পেরেছেন ব'লে গর্ব্ব করতে পারতেন!

•

এইবার গণিকা ও নটী থিয়োডোরার সম্রাজ্ঞী-জীবনের আলো-ছায়া

দুইই দেখাতে চাই ; কারণ যাঁরা মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার করেন, থিয়োডোরার জীবন থেকে তাঁরা অনেক ক্ষুধার খোরাকই সংগ্রহ করতে পারবেন। মাসিকপত্রের গল্প যে-ভাবে পড়া হয়, তেমন হাল্কা ও নিশ্চিন্ত ভাবে থিয়োডোরার কাহিনী প'ড়ে কোনই লাভ নেই। আমরা গল্প বলবার জন্যেই থিয়োডোরার গল্প বলছি না—কারণ এর মধ্যে দুর্জ্ঞেয় নারী-চরিত্রের বহু রহস্যেরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

থিয়োডোরা যখন পণের মেয়ে ছিল, তখন সর্বদাই চেষ্টা করত, যাতে সে মা হয়ে বিপদে না পড়ে,—অর্থাৎ মাতৃত্বের গৌরব যাতে তার যৌবনের বাঁধনকে আল্‌গা ক'রে দিতে না পারে! কিন্তু তবু, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে মা হ'তে হ'ল। একটি পুত্রসন্তান। অনামা বাপ তার ছেলেকে নিয়ে আরব দেশে চলে যায় এবং তাকে মানুষ করবার জন্যে রীতিমত লেখাপড়া শেখায়। মৃত্যুকালে পিতা তাঁর পুত্রের কাছে প্রকাশ ক'রে গেলেন, তার মাতা হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। পুত্রের পক্ষে যা স্বাভাবিক, পিতার মৃত্যুর পর পুত্র তাই করলে। সে কনস্তান্তিনোপলে সম্রাটের প্রাসাদে গিয়ে হাজির! থিয়োডোরার সুমুখে এসে বললে, "মা, আমি তোমার হারা ছেলে।" কিন্তু সে জানত না, তার মা থিয়োডোরা এখন নিজের গণিকা-জীবন থেকে নিজের সম্রাজ্ঞী-জীবনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে। ছেলের সঙ্গে মায়ের কি যে কথা হ'ল ইতিহাস তা জানে না। কিন্তু ইতিহাস এ কথা স্পষ্ট ভাষাতেই বলে যে, গণিকা-পুত্রের অস্তিত্ব সেই প্রথম সাংঘাতিক মাতৃ-সন্দর্শনের দিনেই পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের মধ্যে সব-চেয়ে নিরাপদ ঠাঁই হচ্ছে মায়ের কোল—সিংহী-বাঘিনীর শাবকরাও এ-কথা জানে। কিন্তু মানুষ থিয়োডোরার ছেলে সেই কথা জেনেই ইহলোক থেকে অদৃশ্য হয়েছিল।

*

কিন্তু সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা মাথা কুট্‌ত, একটি পুত্রসন্তানের জন্যে। সম্রাট জাষ্টিনিয়ান তাকে সর্বস্ব দান ক'রেও একটি পুত্রসন্তান দান করতে পারলেন না—সিংহাসনে ব'সে যে একদা-গণিকা মায়ের নাম রাখবে। অনেক আশার পর থিয়োডোরা একটি মেয়ের মুখ দেখলে বটে, কিন্তু সে কন্যাও দীর্ঘজীবিনী হ'ল না। কেবল এই একদিক দিয়ে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস থিয়োডোরার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছিল।

*

থিয়োডোরা যখন সিংহাসনের অধিকারিণী হ'ল তখন, রাজ্যের যারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই খোসামোদে তার মন ভেজাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু লজ্জা বা ঘৃণা যে-কারণেই হোক, থিয়োডোরা তাদের কাছ থেকে নিজেকে তফাৎ ক'রে রাখলে। প্রায়ই সে রাজধানী ছেড়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাস করত। নানা উপায়ে নিজের যৌবন-সুষমাকে দীর্ঘস্থায়ী করবার চেষ্টায়, বিচিত্র বিলাসে ও আহারে-বিহারে-নিদ্রায় পরম আলস্যে নিশ্চিন্ত দিনগুলিকে সে কাটিয়ে দিত। কোন উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করতে এলে আগে তাঁকে অন্ধকার স্যাঁৎ-সেতে কোন ঘরে বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তবেই থিয়োডোরার চরণ-চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করতে হ'ত। তাদের মনের ভিতরে যে রাণীর জন্যে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এবং তাকে বাগে পেলেই তারা যে দংশন করতে উদ্যত হবে, এ সত্য থিয়োডোরার অজানা ছিল না। এবং এইজন্যেই তাদের শ্রেষ্ঠতার দম্ভের উপরে সে এমন কঠিন আঘাত করত।

থিয়োডোরা যে সুধুই খোসামুদেদের প্রশ্রয় দিত না, তা নয়; যারা তার নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াত, তাদেরও সে ক্ষমা করত না। সাম্রাজ্যের কোথায়, কারা তার নিন্দা করছে, সেই খবর পাবার জন্যে সে অনেক গুপ্তচর রেখেছিল। চর এসে খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিন্দুকদের ধ'রে এনে থিয়োডোরার গুপ্ত কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ত। তারপর চলত তাদের উপরে ভীষণ যন্ত্রণাকর অত্যাচার! সে অত্যাচার অনেককেই চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিত। যারা অবশেষে মুক্তি পেত, বাইরে এসে দেখা যেত, হয় তারা পাগল হয়ে গেছে নয় জিহ্বা, হাত বা পা থেকে বঞ্চিত হয়েছে! থিয়োডোরার ভয়াবহ প্রতিহিংসার জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান স্মৃতির মত পৃথিবীর বুকে তারা বিচরণ করত। তাদের ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত থিয়োডোরার নিষ্ঠুরতা থেকে অব্যাহতি পেত না। অমুক রাজকর্মচারী বা অমুক ধর্মযাজককে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে! থিয়োডোরা গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তাকে ব'লে দিত, "আমার হুকুম তামিল করতে না পারলে তোর গা থেকে চামড়া তুলে ফেলা হবে।" নিজের গায়ের চামড়াকে এমন ভীতিকর পরিণাম থেকে বাঁচাবার জন্যে ঘাতক যে কর্তব্যপালনে একটুও ত্রুটি করত না, সেটা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

*

তার গুণের কথাও ইতিহাস বলে। যে-সব অভাগী নিজেদের দেহ বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতি থিয়োডোরার সহানুভূতি ছিল অসাধারণ। তাদের জন্যে সে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদকে মঠে পরিণত করেছিল। সেই মঠে পাঁচশত গণিকার ঠাঁই সংকুলান হ'ত। উপযুক্ত বৃত্তি পেয়ে তারা সেখানে শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করত।

*

জাষ্টিনিয়ানের কাছেই সে শেষ আত্মদান করেছিল। তারপর একদিনের জন্যেও কোন শত্রুও তাকে অবিশ্বাসিনী ব'লে নিন্দা করতে পারে নি। গণিকা যে সতী হ'তে পারে, থিয়োডোরাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

*

একবার তারই সাহস ও মনের-জোর জাষ্টিনিয়ানের মাথা থেকে মুকুট খ'সে পড়তে দেয় নি। সাম্রাজ্যে একবার প্রচণ্ড রাজবিদ্রোহের ঝড় বয়ে যায়। বিদ্রোহীরা প্রায়-বিজয়ী হয়ে নূতন এক সম্রাট নির্বাচন করলে। উপায়হীন জাষ্টিনিয়ান নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। মন্ত্রীরা বললেন রাজাকে রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করতে। ভীত সম্রাট সেই মতেই সায় দিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী থিয়োডোরা বীরনারীর মত দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "পলায়ন? পলায়নই যদি নিরাপদ হবার একমাত্র উপায় হয়, তাহ'লেও সে উপায় অবলম্বন করতে আমি রাজি নই। মৃত্যু হচ্ছে জন্মের পরিণাম। যে একবার রাজ্যচালনা করেছে, রাজ্যচ্যুত ও মানসম্ভ্রমে বঞ্চিত হয়ে সে বাঁচতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে আমার এই মিনতি, কেউ কোনদিন যেন আমার মুকুটহীন মাথা দেখবার সুযোগ না পায়। আমাকে রাণী ব'লে কেউ পায়ে লুটিয়ে পড়বে না, এমন দিন আসবার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়। সম্রাট! আপনি যদি পালিয়ে বাঁচতে চান, তাহ'লে সমুদ্রও আছে, জাহাজও আছে, অর্থসম্পদও আছে। কিন্তু পলায়ন করবার পর কি আপনার মনে হবে না যে, নির্বাসনের এই অপমানের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ছিল? আমার মতে, সাম্রাজ্যই হোক আমাদের মহিমময় সমাধি!"—থিয়োডোরার এই বীরত্বপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেরই সাহস আবার জাগ্রৎ হ'ল। অস্ত্র নিয়ে সকলে বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীরা হেরে গেল—রাজ্য রক্ষা পেলে।

থিয়োডোরার জীবন-দীপ জাষ্টিনিয়ানের পরে নির্ব্বাপিত হ'লে তার যে কি অবস্থা হ'ত, তা বলা যায় না। সারা সাম্রাজ্যে যে ঘৃণা ও আক্রোশ মুক হয়ে ছিল, গণিকা অভিনেত্রী যে তখন তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না, এটা একরকম নিশ্চিত। কিন্তু তা হ'ল না। প্রথম যৌবনের অনাচারে থিয়োডোরার স্বাস্থ্য কোনদিনই সবল হ'তে পারে নি। বাইশ বছর রাজ্যভোগ করবার পর সম্রাটের আগেই সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার অসম্ভব জীবন-নাট্যের উপরে যবনিকা পতন হ'ল। তার মৃত্যুর কারণ, ক্যান্সার। পৃথিবীর একাধিক গণিকা মুকুট পরবার সুযোগ না পেয়েও রাজ্যের সমস্ত শক্তির অধিকারিণী হয়েছে বটে, কিন্তু গণিকা ও অভিনেত্রী সম্রাজ্ঞী বলতে থিয়োডোরা ছাড়া আর কারুকেই বোঝায় না।

*

ভ্রমক্রমে গত-বারের প্রকাশিত গানের একটি শ্লোক বাদ প'ড়ে গেছে।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

স্মৃতির সেতারে তারে তারে তারে
বাজিল ইমন-ভূপালী।
প্রাণের বিজনে ছিলাম দুজনে
চোখে জ্বেলে প্রেম-দীপালি।

*

তরুণী সেদিন অরুণী ধরণী,
হৃদয়ে হাসিত হৃদয় হরণী,
ফাগুনে নাচিত নূপুর-চরণী
দুলাল-চাঁপার দুলালী!

*

আজো আছে প্রাণ, আজো আছে গান,
মান-অভিমান স্বপনে,
আজো ফোটে ফুল শিমুল-বকুল,
অশোকের রং তপনে।

*

কেন তবে ভরা জোছনা-বাদরে
পাপিয়ার সুরে আঁখিদুটি ঝরে,
কেন তবে মোর মনো-সরোবরে
আসেনাকো মধু মরালী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র,টাকাকড়ি,বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩০।১ নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

চিত্রপুরীঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়ঃ (১) **The Conquerors** (রেডিও পিকচার্স)
প্রধান ভূমিকায়—রিচার্ড ডিক্স্ ও য়্যান হার্ডিং
কাল থেকে ম্যাডান থিয়েটারে আরম্ভ হবে।

•

The Conquerors মানবজীবনের বিরাট ও বিস্তৃত কাহিনী। একটি বংশের তিন পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পুত্র এবং দৌহিত্রের জীবনকে এই ছবির মধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে। ছবির গল্পটি সংক্ষেপে এই—

১৮৭৩ সালে ক্যারোলিন-এর (এই ছবির নায়িকা) পিতার ব্যাঙ্ক্ ফেল হ'ল। শোকে মনস্তাপে তিনি গেলেন মারা। ক্যারোলিন স্বামী রজার ষ্টানডিশ্-এর সঙ্গে নেব্রাস্কা নামক দূর-দেশে গমন করলে, অর্থোপার্জ্জনের আশায়! সেখানে তারা পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'ল এবং রজার গুরুতররূপে আহত হ'ল।

•

ভগবানের কৃপায় রজার তার আঘাত সাম্‌লে নিলে। তখন ক্যারোলিনের সঙ্গে একযোগে কাজ ক'রে রজার সেই দুর্গম দেশে এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করলে। একদা যে পল্লী ছিল একান্ত অবজ্ঞাত, এখন সেই পল্লীই শহরে রূপান্তরিত হ'য়ে সমৃদ্ধশালী হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্যারোলিন এই সময় জমজ-সন্তান প্রসব করলে—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

•

দৈবদুর্ব্বিপাকে ছেলেটি গেল মারা। ক্যারোলিন মনে মনে অভিভূত হ'য়ে পড়লেও স্বামীর মুখ চেয়ে তার শোক সম্বরণ করলে। ক্রমশঃ মেয়েটি বড় হ'ল। তার নাম, ফ্রান্‌সিস্। আঠারো বছর বয়সে ফ্রান্‌সিস্ পিতার ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ওয়ারেণ কে বিবাহ করলে।

অপদার্থ অকেজো ওয়ারেণ। তার ভুলেই রজার-এর ব্যাঙ্ক্ ফেল হবার জোগাড় হ'ল। ওয়ারেণ অকৃত-কার্য্যের লজ্জায় আত্মহত্যা করলে। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী ফ্রান্‌সিস্ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে।

•

ক্রমশঃ ছেলেটি বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। ১৯১৫ সালে ছোট রজার য়্যাম্-বুলেন্স-চালকরূপে বিদেশে গেল। সেখানে সে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জ্জন করলে। ১৯১৮ সালে বীরের গৌরব নিয়ে সে প্রতীক্ষমানা দিদিমা এবং মায়ের কোলে ফিরে এল। ক্যারোলিন্ তাকে বুকে নিয়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

•

তারপর সে তার পিতামহের ব্যাঙ্কে প্রবেশ ক'রে তার নষ্ট গৌরব এবং নষ্ট ব্যবসায় পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রাণপন সংগ্রাম করতে লাগল। বৃদ্ধ রজার তাঁর আদরের দৌহিত্রের মধ্যে প্রিয়তমা পত্নীর অন্তরের দুর্জ্জয় সাহস এবং অফুরন্ত বিশ্বাস প্রতিফলিত দেখে মনে মনে অনির্ব্বচনীয় বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ বোধ করলেন।

মানুষের নিজের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যে সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারে এবং একমাত্র সেই বিশ্বাসের দ্বারাই যে মানুষ জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়—উল্লিখিত ছবির মধ্যে এই সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে।

(২) **The Big Cage** (ইউনিভার্স্যাল)
শ্রেষ্ঠাংশে—ক্লাইড বেটি ও য়্যানিটা পেজ
কাল থেকে রূপবাণীতে সুরু হবে।

•

ক্লাইড্ বেটি অসমসাহসী যুবক। এক সার্কাসওলা তাকে তার সার্কাসের দলে নিয়ে আসে—এক লোমহর্ষক খেলা দেখিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করবার জন্যে,—এক খাঁচার মধ্যে একসঙ্গে বিশটা বাঘ এবং বিশটা সিংহের খেলা দেখান এবং নিরস্ত্র সেই খাঁচার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেই খেলা দেখাবেন—ক্লাইড্ বেটি!

"Front Page" চিত্রের
একটি দৃশ্য

অনেকে এ-ব্যাপার অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু ক্লাইডের উপর সার্কাসওয়ালার প্রচুর বিশ্বাস ছিল। ক্লাইড্ মহলা দিতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে, সেই সার্কাসে এল লিলিয়ান নাম্নী একটি মেয়ে ও তার প্রেমিক পেনি। আর এল, এক পুরাতন পশু শিক্ষকের ছেলে—জিমি। জিমির বাবা একবার অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বে-সামাল হ'য়ে সিংহের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ ক'রে মারা পড়ল।

•

নির্দ্ধারিত দিনে ক্লাইড্ বেটি তাঁর বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত ক'রে দিলে। খেলা চলছে এমন সময় সহসা বজ্রাঘাতে সার্কাসের

তাঁবু গেল পুড়ে এবং পশুরা খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। চতুর্দ্দিকে ভীষণ ব্যাপার সুরু হ'ল।—প্রাণরক্ষার প্রাণান্তকর ছড়োহুড়ি! সেই বিপুল Stampede-এর মধ্যে ক্লাইড্ বেটি অসামান্য দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত হিংস্র পশুদের খাঁচায় বন্ধ ক'রে শান্ত করলে।

Big Cage-এর শেষের দৃশ্যগুলি সত্যিই রোমাঞ্চকর!

*

(৩) **The Most Dangerous Game** (রেডিও পিক্‌চার্স)

প্রধান ভূমিকায়—জোয়েল ম্যাক্রিয়া ও ফে রে।

আগামী কাল থেকে এম্পায়ারে সুরু হবে।

*

The Most Dangerous Game ছবিখানিকে Horror Picture আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বব্ রেন্সফোর্ড জাহাজ ডুবি হ'য়ে এক অজ্ঞাত দ্বীপে উঠে রুশিয় জমিদার কাউন্ট্ জারফ-এর আশ্রয় লাভ করল!

জারফ-এর বাড়ীতে তখন আরো চুজন অতিথি ছিল;—একজন ইভ্ অন্যজন তারই ভাই মার্টিন্। এই তিনজনের কাছে কাউন্ট জারফ তাঁর বিপদসঙ্কুল শিকারের কাহিনী গল্প ক'রে বলতে লাগলেন—কাউন্ট একজন বড়দরের শিকারী। তিনি সকল রকম প্রাণীই শিকার করেছেন। তাঁর প্রাসাদের চারপাশে যে বিস্তীর্ণ জমি আছে, তারই ওপর রাত্রে জারফ শিকার অন্বেষণ করেন।

*

রাত্রে বব্ ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ জেগে উঠে দেখলে ইভ্ তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—ভীত কম্পিত মুখে! সে বব্‌কে বল্লে যে তার ভাই এবং কাউন্ট্ এতরাত্রে কোথায় গেল, তাই ভেবে সে ভীত হ'য়ে পড়েছে। চুজনে নীচে নেমে দেখলে, কাউন্টের শিকারগুলি যে-ঘরে থাকে তার দরজা খোলা রয়েছে। চুজনে সেই ঘরে ঢুকে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো—ঘরের মধ্যে সারি সারি মানুষের মাথা সাজানো রয়েছে; কাউন্ট মানুষ শিকার করে!!

ঘরের ভিতর থেকে তারা দেখ্‌লে, কাউন্ট ও তার চুজন চাকর মার্টিনের দেহ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে।

*

তারপর, নৃশংস কাউন্ট্ বব্‌কেও হত্যা করবার চেষ্টা করলে। অনেক প্রকারের বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে বব্ কাউন্টের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করলে।

ছবিখানির শেষের চুটী দৃশ্য দর্শকদের মনে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। লেস্‌লি ব্যাঙ্কস্ নামক অভিনেতা কাউন্ট জারফ-এর ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।
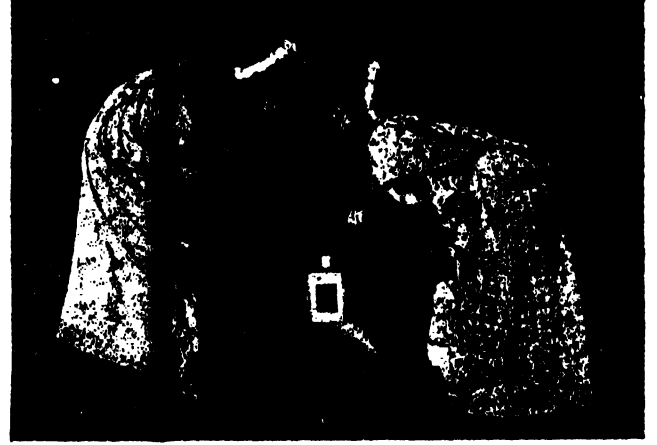
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজের
'বিল্বমঙ্গল'-এর একটি দৃশ্য

আগামী ২রা ডিসেম্বর থেকে একসপ্তাহের জন্যে রূপবাণী-চিত্রগৃহে Song of Songs দেখানো হবে। তারপর আরম্ভ হবে **"বিল্বমঙ্গল"**। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইন্‌ডাস্‌ট্রিজের দ্বিতীয় অবদান এই ছবিখানি উন্নত-সংস্করণের আর-সি-এ ফোটোফোন যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হয়েছে। স্বনামধন্য প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি এর প্রযোজক। আশা করা যায়, "বিল্বমঙ্গল" বহুদিন পর্য্যন্ত দর্শকদের আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে। "বিল্বমঙ্গল" চিত্রে ছায়াছবির জগতে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে, রঙ্‌মহলের অভিনেতা রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ দৌহিত্র দুর্গাপ্রসন্ন বসু ও মায়া মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই ছবির শব্দগ্রহণকার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন শ্রীযুক্ত মধুশীল, এম্-এস্-সি। এক্ষেত্রে এইটুকুন বলা প্রয়োজন বোধ করি যে R-C-A শব্দ-যন্ত্র এই প্রথম বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত হ'ল।

*

চিত্রপ্রিয়দের অনেকদিনের অপেক্ষা করা ছবি, **Blue Angel** এতদিনে কলকাতায় এল। আগামী ২রা ডিসেম্বর থেকে ছবিখানি ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হবে। Blue Angel জার্ম্মান প্রডাকশান—U. F. A র ছবি। এতে অভিনয় করেছেন—এমিল জেনিংস্ এবং মার্লিন ডিট্রিক্। এমিল জেনিংসের আগাগোড়া ইংরেজী টকি, কলকাতায় এই প্রথম। Blue Angel মার্লিনের সর্ব্বপ্রথম ছবি। জোসেফ্ ভন ষ্টার্নবার্গ ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। ছবিখানি বহুদিন আগে তোলা হয়েছে। এই ছবিতে মার্লিন ডিয়েট্রিক্-কে দেখে অনেকেই বিস্মিত হ'য়ে যাবেন। আমরা যাকে জানি, সেই দীর্ঘাঙ্গী, কৃশতনু এবং exotic মার্লিন নয়,

Blue Angelএ তিনি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, প্রচুর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। অভিনয়ের ভঙ্গীও সম্পূর্ণ পৃথক।

Blue Angel-এর গল্পটি ভারী হৃদয়গ্রাহী। আসচে বারে, পাঠকদের শোনাবার ইচ্ছে রৈল।

*

ছবিঘরে সেদিন Rasputin and the Empress দেখে এলাম। লাওনেল ব্যারিমুরের অভিনয় পুরণো লাগেনা। এই প্রতিভাধর ছায়ানটের অভিনয়ের মধ্যে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতি আছে যা দর্শকদের মনকে আচ্ছন্ন না করে পারে না।

এই সপ্তাহে ছবিঘরে এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, ছবিঘরের অধুনা যে উন্নত-সংস্করণের শব্দযন্ত্র লাগানো হয়েছে তা সবিশেষ সফল হয়েছে। বহুদূরে ব'সেও ছবির প্রত্যেকটি কথা আমরা বুঝতে পেরেছি।

*

দেবকীবাবু সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স পরিত্যাগ ক'রে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মে যোগদান ক'রেছেন—এ খবরটি বোধ করি এতদিনে পুরণো হয়ে গেছে। তিনি সেখানে হিন্দী-সীতার পরিচালনা করছেন। নাম ভূমিকায় আছেন—দুর্গাবাই খোটে। হয়ত ভবিষ্যতে দেবকী বাবু অনবরত হিন্দী ছবিই ডাইরেক্ট করতে থাকবেন—কে জানে। ভারী দুঃখ লাগছে এই মনে ক'রে যে হিন্দি ছবিতে তিনি যতই কৃতিত্ব দেখান, he is lost to us !!

*

গত সপ্তাহে এলফিনষ্টোনে মার্লিনের "The Song of Songs" চিত্রখানি দেখলাম। ছবিখানির পরিচালক মার্লিনের অন্যান্য ছবির পরিচালক জোসেফ ভন ষ্টার্নবার্গ নন—যিনি এই ছবিখানির পরিচালনা ক'রেছেন তিনিও কম উঁচুদরের শিল্পী নন—তাঁর নাম র‍্যুবেন ম্যামুলিয়ান ; ফ্রেডরিক মার্চ্চ অভিনীত R. L. Stevention এর বিখ্যাত উপন্যাস Dr Jekyle & Mr. Hyde-এর চিত্ররূপের পরিচালক ব'লে আজ তাঁর নাম কোন চলচ্চিত্র-রসিকের কাছেই অবিদিত নেই, তাঁর এই ছবিখানির পরিচালনাও আমাদের স্মরণ-পটে গভীর দাগ এঁকে দিয়েছে যা সহজে মোছবার নয়। তাঁর পরিচালনার কথা বলতে গিয়ে এই কথাই বারবার মনে প'ড়েছে যে তিনি নিজের শক্তি নট-নটীর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান্ নি, যা মার্লিনের অধিকাংশ ছবিতেই ভন ষ্টার্নবার্গ দেখিয়েছেন। র‍্যুবেন ম্যামুলিয়ান একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন-পথে সমস্ত নট-নটীকে, বিশেষ ক'রে মার্লিনকে, তাঁদের যথাসাধ্য অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছেন। এবং এইজন্যেই আমরা এই ছবিতে মার্লিনের মধ্যে এক বিভিন্নমুখী অভিনয়-প্রতিভার আস্বাদ পেয়েছি। গল্পটি বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক জুডারম্যানের লেখা। এবং এই গল্পটির পরিচালনায় ম্যামুলিয়ান যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন একথা আমরা মানতে বাধ্য। তবে ছবিখানির এক জায়গায় একটু যেন অশ্লীল ইঙ্গিতের আঁচ পাওয়া গেছে মনে হ'ল। সেটা ঘটে ছবির দ্বিতীয় রাত্রের ঘটনার একস্থলে। তবু এ-ছাড়াও অনেক নীতিবাগীশ ছবিখানির বহুস্থানে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন—সেইজন্যে তাঁদেরকে এই ছবি দেখতে বারণ করি যদি

তাঁরা গত সংখ্যায় "নাচঘরে"র নাট্য-জগতে প্রকাশিত ইজাডোরা ডানকানের ভাষায় 'নগ্নতা হ'চ্ছে সত্য, সুন্দর এবং আর্ট' না মানেন। পরিচালকের কৃতিত্বের আর একটুখানি নমুনা পাওয়া যায় প্রথম দিককার সংলাপের সুস্থ, সরল গতির মধ্যে দিয়ে।

মার্লিন এই ছবিতে একটি নিষ্পাপ সরল গ্রাম্যবালার ভূমিকায় মনোমুগ্ধকর অভিনয় ক'রেছেন, এই চরিত্রটি তাঁর একটি বিশিষ্ট এবং অপূর্ব্ব সৃষ্টি বললেও বলতে পারি। তিনি আগেকার ছবিগুলোর mysteriousness ভুলে গিয়ে আত্মস্বত্বাকে একেবারে গোপন ক'রে এমন প্রাণ-কাড়া অভিনয় যে ক'রতে পারেন তা আমরা ছবি দেখবার আগে ক্ষণেকের জন্যেও ভাবতে পারি নি। সত্যি কথা ব'লতে কি তাঁর এই ছবির অভিনয় আমাদের চোখে ভাল লাগবে কি না সে বিষয়ে একটু সন্দেহ ছিল। তাঁর অভিনয়-প্রতিভাকে বারংবার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মার্লিনের পরেই ব্যারণের ভূমিকায় লাওনেল এ্যাটউইল আমাদের চোখের সামনে বেশী ক'রে ফুটে ওঠেন। তাঁর যথার্থই অভিনয় ক্ষমতা আছে; তিনি প্রকৃতই উঁচুদরের শিল্পী। আমরা তাঁর বিচিত্র অভিনয়ের রীতি-নীতি সম্বন্ধে যেকথা লিখেছিলাম তা দেখি তিনি অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণিত ক'রেছেন। তাঁর চোখের মধ্যে দিয়ে আমরা ব্যারণের হৃদয় দেখতে পেয়েছি।

ভাস্কর-শিল্পীর ভূমিকায় ব্রিটিশ অভিনেতা ব্রায়ান্ আর্নও কম শক্তিশালী নন। তাঁর অভিনয় ছবির কোন স্থানেই মার্লিনের অভিনয়ের কাছে পরাজিত হয়নি। তবে তিনি প্রকৃত শিল্পী হ'তে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।

আর একটি অভিনেত্রীর কথা না ব'ললে আমরা অপবাদগ্রস্ত হব। তাঁর ভূমিকা ছিল ছোট, কিন্তু সেই ছোট ভূমিকাতেই তিনি এমন বিস্ময়কর অভিনয় ক'রেছেন যে আমরা তাঁকে মেরী ড্রেসলারেও সঙ্গে তুলনা ক'রতে একটুও পেছপাও নই। এই অতুলনীয়া অভিনেত্রীটির নাম এ্যালিসন্ স্কিপওয়ার্থ।

অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয়ও সঙ্গত হ'য়েছে। ছবিখানির মধ্যে দৃশ্যপটের বাহুল্য না থাকলেও মনের খোরাক জোগাবার অনেক কিছুই আছে। ছবিখানির মধ্যে আলোক ও চিত্র-শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। আর একজন ছবিখানির গৌরব বৃদ্ধি ক'রে দেওয়ার জন্যে প্রশংসা দাবী ক'রতে পারেন, তিনি হচ্ছেন শব্দযন্ত্রী। শব্দ গ্রহণ করবার জন্যে তিনি যে কত বিভিন্ন পথ অবলম্বন ক'রেছেন তা রসিকমাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন। তবে এ-স্থলে সংলাপ-রচয়িতার দক্ষতা আছে বহুল পরিমাণে। ... ... আমাদের শেষ কথা এই যে রুবেন ম্যামুলিয়ানের পরিচালনায় তোলা মার্লিনের "The Song of Songs" আমাদের একটুও ক্ষুণ্ণ হবার সুযোগ দেয় নি। এই রকম তাঁর আরও বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় পেলে আমরা অত্যন্ত খুশী হব।

*

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্সে"র চিত্রাগারে 'অনাথে'র স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। ভূমিকালিপি আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তা' হচ্ছে এইরূপ :—

অনাথ—কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া
অশোক—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মহেশ্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী
সুলেখা—উমাশশী।

*

"ডিনার এ্যাট্ এইট" মেট্রোর নতুন ছবির নাম। আসছে সপ্তাহে গ্লোবে সুরু হবে। মেট্রোর কর্ত্তারা আজকাল আর একজন বা দু'জন 'তারকা' দিয়ে ছবি তুলিয়ে সন্তুষ্ট হ'চ্ছেন না। "ডিনার এ্যাট এইট্" ছবিতে একসঙ্গে কতগুলি 'তারকা'কে দেখতে পাওয়া যাবে জানেন?—লাওনেল্ ব্যারীমুর, মারী ড্রেসলার, ম্যাজ ইভান্স, বিলি বার্ক, লী ট্রেসি, জীন্ হারলো, ক্যারেন মরলি, এড্‌মণ্ড লো, মে রবসন এবং ফিলিপ হোম্‌স !!

*

"মাপ করবেন মশাই"-এর স্যুটিং আরম্ভ হ'য়ে গেছে, ভূমিকালিপি দেখে মনে হয় ছবিখানাকে উপভোগ্য করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যমের অভাব নেই। কৌতুকচিত্রখানির ভূমিকালিপি এইভাবে বিতরিত হয়েছে—

মিষ্টার সবিতা রায়—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়
মিসেস্ সবিতা রায়—শ্রীমতী ইন্দুবালা
মিস্ রেবা রায়—শ্রীমতী মলিনা
দন্ত-চিকিৎসক—শ্রীননী ভট্টাচার্য্য
সহ-দন্ত-চিকিৎসক—শ্রীসরোজ বাগচী
যম—শ্রীললিত মিত্র
মিসেস্ যম—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

প্রয়োগ-কৌশল

তিন

প্রযোজকের কার্য্যসূচী

(মণিকা ইউয়ার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

মহলার সময় কোন কাজ ভবিষ্যতে হবে ব'লে ফেলে রাখলে চলবে না। ভবিষ্যতে হয়তো প্রযোজককে আরও আকস্মিক এবং অপরিহার্য্য বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে। প্রযোজককে সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বিপদের সূচনাকে পর্য্যন্ত এড়িয়ে যেতে হবে। তবুও অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে প্রথম রজনীর অভিনয় কতকগুলো অপ্রাচ্ছন্ন্য ব্যাপারের জন্যে সাবলীল গতিতে চলতে পারে না।

ধরুন নাটকের মধ্যে দু'জন লোকের মারামারি দেখাতে হবে। তার জন্যে সেই দু'জন লোকের মারামারি-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই জানা চাই। প্রত্যেকবার মহলার সময়ই তাঁদের যে ঐ-ব্যাপারটি অভ্যাস ক'রতে হবে তা নয়, তবে অভিনয়কালীন যাতে দৃশ্যটি ভালভাবে ফুটে উঠতে পারে এজন্যে তাঁদের মারামারির সমস্ত ব্যাপারটি সহজ ক'রে নেওয়া চাই। অভিনয়ের সময়ে তাঁরা এমন কাজ না করেন যা দু'জনের কাছেই নতুন ঠেকবে বা অযথা আসবাব-পত্র ভেঙে যাবে, বা নায়কের অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটবে।

প্রকাশ্য অভিনয়ের সময় যে-সব আসবাব-পত্রের দরকার হয় যত-দূর-সম্ভব সেই সব আসবাব-পত্রের দ্বারাই দৃশ্য সাজিয়ে মহলা সুরু করা উচিত। অপক্ক নট-নটীরা যদি প্রকাশ্য অভিনয়ে আজানা আসবাব-পত্রের মধ্যে অভিনয় আরম্ভ ক'রতে যান তাহ'লে অনেক সময়েই অপ্রীতিকর ঘটনার উৎপত্তি করেন। প্রকাশ্য অভিনয়ে তাঁদের এমন সব দৃশ্যপটের মধ্যে দিয়ে অভিনয় করাতে হবে মহলার সময় যাদের সঙ্গে তাঁরা ভালভাবে পরিচিত হয়েছেন। অভিনয়ের অন্তর্গত কথার সাথে সমস্ত কাজের মিল থাকা দরকার। অভিনয়ের মধ্যে যদি চায়ের উল্লেখ থাকে, তবে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে হবে, চিঠির উল্লেখ থাকলে চিঠি রাখতে হবে। এ না ক'রলে নট-নটীরা অনেক সময়েই নিজের কথা ভুল ক'রে বসেন। কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব জিনিষ দেখে নট-নটীরা যাতে না চ'মকে যান সেই দিকে প্রযোজকের দৃষ্টি রাখতে হবে। গোলমেলে দৃশ্যগুলোর উপর প্রযোজককে এই রকমে সব দিক দিয়ে সুব্যবস্থা ক'রতে হবে।

প্রয়োগকার্য্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় দরকার হ'চ্ছে নট-নটীর স্বরের দিকে লক্ষ্য রাখা। স্বরই দর্শকবৃন্দকে সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে নাচিয়ে তুলতে পারে। স্বরই হ'চ্ছে মুখ্য, অন্য সব গৌণ। ... ... ভূমিকাকে এমন-ভাবে আবৃত্তি ক'রতে হবে যাতে দর্শকরা কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে। ভূমিকার আবৃত্তি একটি শক্ত ব্যাপার। যদি নট-নটীরা চীৎকার ক'রতে সুরু ক'রে দেন তাহ'লে কিছুক্ষণ পরে কোন দর্শকই মন দিয়ে অভিনয় দেখবে না; গোলাবর্ষণের মতই কান তাদের ভোঁ-ভোঁ ক'রবে। আবার যদি নট-নটীর স্বর দর্শকের আসন থেকে ভালভাবে শুনতে না পাওয়া যায়, তাহ'লে দর্শকদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি হবে। স্বরকে যে-পরিমাণে উঁচু ক'রলে প্রত্যেক দর্শকেরই শ্রবণযোগ্য হ'য়ে ওঠে সেটাই প্রযোজককে দেখতে হবে। এর জন্যে প্রেক্ষাগারের প্রত্যেক আসন থেকে ব'সে নট-নটীর স্বরকে পরীক্ষা ক'রতে হবে। যদি কোন আগন্তুককে ডেকে এনে এই ব্যাপারে লাগানো যায় তাহ'লে ফল ভাল হ'তে পারে; কারণ অভিনয়ের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে প্রযোজকের চোখের সামনে সব-কিছুই সুপরিস্ফুটভাবে ভাসতে থাকে, সুতরাং তিনি কথা বাহ্যভাবে না শুনলেও মনে-মনে শুনতে পান।

নট-নটীর স্বরের উচ্চতা-নিম্নতা এবং বৈচিত্র্য নাটকের উপাদান গঠন ক'রতে অনেকখানি সাহায্যই করে। গানের সুরের মধ্যে যে মিষ্টতা, মাত্রা ও লয় মন প্রাণকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে অভিনয়ের মধ্যে নট বা নটীর স্বর-বৈচিত্র্যের দ্বারা তাকেরই ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। বাক্যের শেষাংশ যাতে নট-নটীরা অযথা বিকৃত আবৃত্তির কৌশলে ভারাক্রান্ত ক'রে না তোলেন সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা দরকার। বিভিন্ন নট-নটীর স্বরের বিভিন্নতা যাতে বজায় থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একজনের স্বরকে অপরে যাতে অনুকরণ না করে তা দেখতে হবে। কারণ অনুকরণের মধ্যে দিয়ে অনবস্থার সৃষ্টি হবে। রাম যদি প্রথমে জোরে তারপর আস্তে তারপর আরও আস্তে কথা বলে শ্যাম যাতে না সেই রকমেই কথা বলে তার চেষ্টা ক'রতে হবে। শেষ বক্তার কথার রেশ অপরে অনেক সময় অজ্ঞাতভাবেই গ্রহণ ক'রে, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্বরের মধ্যে দিয়ে যেমন বৈচিত্র্যকে আনা যায়, তেমনি গতির মধ্যে দিয়েও তাকে পাওয়া যায়। গতির রাশকে ঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে

গেলে নাটকের ভাবকে মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌তে স্বরের চেয়ে সেও কম সাহায্য করে না। ... ... মঞ্চের উপর নিস্তব্ধতারও দাম ঢের। অতিরিক্ত চীৎকারের পর নিস্তব্ধতা সমস্ত দর্শকের আকর্ষণকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তোলে। দর্শকরা আসন থেকে উঁচু হ'য়ে কি ব্যাপার ঘ'টছে তা জানবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। হৃদয়াবেগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিস্তব্ধতা অসম্ভব রকমে সাহায্য করে। সময়ে-সময়ে নিস্তব্ধতা বিভীষণতাকে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে নট-নটীরা সব-প্রথম যে কথা উচ্চারণ করেন তা লোককে অত্যন্ত আকৃষ্ট ক'রে তুল্‌তে পারে।

জটীল নাটকের তুলনায় কমেডির অভিনয় দ্রুতগতিতে চলবে এবং 'ফার্সে'র অভিনয় আবার ঐ দু'টোর চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে চল্‌বে।

পূর্ব্ব অভিনেতার শেষকথার দিকে পরবর্ত্তী অভিনেতার লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। দুই অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে যেন কোন সময়ের বিলম্ব না হয়, তা না হ'লে অভিনয়ের মধ্যে পারম্পর্য্যের ব্যাঘাত ঘটবে। তবে সময়ের বিলম্ব এমন স্থানেই রাখা দরকার যেখানে নাটক কিছু জটীল সমস্যার সমাধান ক'রতে উদ্যত। দর্শকরা যাতে সুপরিস্ফুটভাবে এই সমস্যার সমস্ত ভাব বুঝতে পারে তার জন্যেই এই ধরণের সময়ের বিরাম থাকা দরকার।

স্বরের উচিৎ মূল্য দেওয়ার সম্পর্কেও আর একটা প্রশ্ন তুল্‌তে পারা যায়। তা হ'চ্ছে এই যে, অধিকাংশ অবৈতনিক নট-নটীরা নাটকের সমস্ত কথা এক-রকম ধাঁচেই পড়ে যান। সেটা কি উচিত? নানা-সংলাপের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হ'য়ে প্রযোজককে কি দরকারী এবং কি অদরকারী তা ঠিক ক'রে নট-নটীদের সেই সেই দিকে ঝোঁক্‌ দিয়ে শিক্ষাদান ক'রতে হবে। যেমন নাটকের মধ্যে এই কথাগুলি আছে: "সুপ্রভাত! আজকের দিনটি মন্‌কে বেশ আনন্দ দিচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি জানেন কি রাম এদেশ ছেড়ে চ'লে গেছে—।" অপরিপক্ক নট-নটীরা এই কথাগুলোর প্রত্যেকটার উপর সমান মূল্য দেবার জন্যে উৎসুক হবেন। কিন্তু প্রথম দুই লাইন কথা ব্যবহার হ'য়েছে শুধু চরিত্রটিকে মঞ্চের গায়ে আবির্ভূত করবার জন্যে—শেষ লাইনে নাটকের প্লট ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়।

নাটকের মূল্য সম্বন্ধে প্রযোজকের দেখা উচিত যে প্রধান নট বা নটী নিজের প্রাধান্যকে অপর ক্ষুদ্র নট বা নটীর ভূমিকার তুলনায় বেশী ক'রে ফুটিয়ে না তোলেন। নাটকের মধ্যে কোনও চরিত্র যাতে দর্শকদের চক্ষু ও মনকে আকৃষ্ট না ক'রে পারে না, সেইদিকে প্রযোজককে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। নাটকখানি যাতে সমস্ত দিক দিয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

তারপর প্রযোজককে মঞ্চের উপর নট-নটীদের সুন্দরভাবে সাজানোর দিকে মন দিতে হবে। প্রথমে দেখ্‌তে হবে যে মঞ্চের উপর দৃশ্যপট থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক জিনিষটা সুসজ্জিত; তারপর সেই সামঞ্জস্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নট-নটীদের অভিনয়ের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ক'রে নট-নটীরা এক মুহূর্ত্তের তরেও বেখাপ্পা হ'য়ে দর্শকদের চোখে না ফুটে ওঠেন। নট-নটীরা অভিনয়কালীন যাতে না কোণে গিয়ে হাজির হন সে-সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশ দিয়ে রাখ্‌তে হবে, কারণ এমন মঞ্চগৃহ খুব কমই আছে যেখানে আসনে ব'সে যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন দর্শক সমস্ত মঞ্চ-গৃহটা পরিপূর্ণরূপে দেখতে পায়। কোন প্রয়োজনীয় দৃশ্যের অভিনয় যাতে মঞ্চের এক কোণে অভিনীত না হয়, তা হ'লে অধিকাংশ দর্শকই দৃশ্যটি সম্পূর্ণরূপে দেখ্‌তে সক্ষম হবে না। নট-নটীরা যাতে একে অপরকে অভিনয়ের সময় ঢাকা না দেন অর্থাৎ আড়াল ক'রে না দাড়ান সেটা লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। এ-সব লক্ষ্য রাখবার জন্যে প্রযোজককে গ্যালারি থেকে আরম্ভ ক'রে নীচেকার আসন থেকেও মহলার সময় সমস্ত অভিনয় দেখ্‌তে হবে। এবং কি-ক'রে নট-নটীদের সুন্দরভাবে সাজানো যায় এথেকে তিনি ভাল বুঝ্‌তে পারবেন।

মঞ্চের উপর অবান্তর ঘোরাফেরা বন্ধ ক'রতে হবে। উদ্দেশ্যহীনভাবে নট-নটীরা যাতে চলাফেরা না করেন প্রযোজককে সেটা নট-নটীদের বারণ ক'রে দিতে হবে। তবে দীর্ঘ উক্তিকে এক ঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে নট-নটীদের গতির আশ্রয় নিতে হবে। তবে এই যে গতি নট-নটীরা যাকে আশ্রয় ক'রবেন সেটা যেন দর্শকদের চোখে পূর্ণ মানে নিয়ে ফুটে ওঠে। একটা সাধারণ নিয়ম আছে, কোন নট-নটী এমন কোন নট বা নটীকে সাম্‌নের দিক দিয়ে পেরিয়ে যাবেন না যিনি অভিনয় ক'রছেন।

কোন নট বা নটী অভিনয়কালীন যেন না অপর চরিত্রের পিছনে প'ড়ে যায়। তাঁকে সাম্‌নে এগিয়ে এসে এমনভাবে অভিনয় সুরু ক'রতে হবে, যাতে অপর চরিত্র এবং দর্শকদের কাছে তিনি সমানভাবেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে পারেন।

বহির্গমনের দরজার দিকে প্রযোজককে নজর রাখ্‌তে হবে। যদিও বাস্তব-জীবনে অধিকাংশ ঘরের বেরুবার দরজা একটিমাত্রই থাকে তবুও মঞ্চের উপর যদি দু'টো দরজা খাড়া করা হয়, তাহ'লে বিসদৃশ এমন-কিছু ঠেক্‌বে না। 'ফার্স'-এর বেলায় ত ডজন-খানেক দরজা মঞ্চের উপর গড়া হ'য়ে থাকে। তবে এটা দেখতে হবে, যে-পথ দিয়ে কোন নারীর প্রেমিক-পুরুষ পালালেন সেই পথ দিয়ে যেন না নারীটির স্বামীর আগমন ঘটে—কারণ তাতে দর্শকদের চোখে নাটকীয় রস অনেকখানিই পান্‌সে হ'য়ে আসবে। এমন যেন না হয়, যে দরজা দিয়ে কর্ত্রী ঝিকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠালেন সেই দরজা দিয়েই গৃহস্বামী বাইরের কাজে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লেন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ৮৪/৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নাচঘর কার্যালয় হইতে শ্রী... ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
কলিকাতা, ২৯ ... প্রেসে ... কর্তৃক মুদ্রিত।